[মথুরা/দ্বারাবতী/রৈবতক/ইন্দ্রপ্রস্থ]

প্রণেতা

গৌরচন্দ্র সাহা, সাহিত্যবিশারদ

সম্পাদনা

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

বুলবুল প্রকাশন

১৮/এল, ট্যামার লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৯

SHREEKRISHNA
by
Gourchandra Saha

প্রথম প্রকাশ :
জন্মাষ্টমী, ১৯৫৯

প্রচ্ছদ : দেবিকা মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : বুলবুল সাহা □ বুলবুল প্রকাশন ● ১৮/এল, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রক : অশোককুমার আদক □ ত্রিনয়নী প্রিন্টার্স ● ৬৯এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

অর্ঘ্য

কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী পরমারাধ্যা পিতামহী স্বর্গীয়া কুবজাসুন্দরী এবং সত্যের পূজারী পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র সাহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ গ্রন্থখানি নিবেদন করলাম।

স্নেহধন্য
গৌর

সম্পাদকের কথা

হঠাৎ আমি সম্পাদনার কাজে হাত দিলাম কেন? এ প্রশ্ন আমার বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতজনের। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তরে আমার কিছু বলা উচিত বলে আমি মনে করি।

লেখক শ্রী গৌরচন্দ্র সাহা তাঁর জীবদ্দশায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী নিয়ে চার খণ্ডে একটি বিশাল পুস্তকের পরিকল্পনা করেন। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁর গ্রন্থের দুটি খণ্ডের প্রকাশনাই মাত্র দেখে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর সুযোগ্যপুত্র শ্রী বুলবুল সাহা পিতৃঋণ শোধ করার ইচ্ছায় পিতার অপরিণত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত কবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর পিতার সেই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আমার কাছে নিয়ে এসে সম্পাদনা করার জন্যে অনুরোধ করেন।

কৃষ্ণ সম্পর্কে সকলেরই এক একটি নিজস্ব ধারণা রয়েছে। আমারও রয়েছে। তাই সম্পাদনার প্রস্তাবে প্রথমে একটু বিব্রত হই। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি পড়ার সময়েই আবিষ্কার করলাম যে, কৃষ্ণ সম্পর্কে আমাদের দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। আমাদের দু'জনেরই বিশ্বাস— নানান আষাঢ়ে কথা-উপকথার জাল কৃষ্ণ চরিত্রটিকে আমাদের সামনে এক বিতর্কমূলক চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করে রেখেছে, কৃষ্ণ চরিত্রের মহানতা এবং বিশালত্ব খর্ব করেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কৃষ্ণকে অতি হীন বলেও প্রতিপন্ন করা হয়েছে। লেখক শ্রী গৌরচন্দ্র সাহা সেইসব আষাঢ়ে কাহিনীর জাল কেটে কৃষ্ণ চরিত্রটিকে উদ্ধার করতে পেরেছেন, কৃষ্ণকে সেই মহান কৃষ্ণ রূপেই উপস্থাপিত করেছেন, যা আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ এক। তাই কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার এই সুযোগ হারানো আমার পক্ষে উচিত হবে না মনে করে আমি বইটির সম্পাদনার কাজে রাজী হয়ে যাই।

কৃষ্ণ চরিত্রটি যথাযথ ভাবে কৃষ্ণপ্রেমিদের কাছে উপস্থাপিত হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক, আমার কৃষ্ণপ্রেম সার্থক।

যে কোনও কঠিন কাজই সহজ হয়ে আসে প্রকৃত উৎসাহদাতাদের উৎসাহে। সম্পাদনার এই বিশাল কাজে যাঁদের উৎসাহ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—তাঁরা হলেন শ্রী অনীশ দেব, শ্রীমতি সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতি রমা হালদার, শ্রী ভাস্কর রাহা এবং শ্রী উৎপল ভট্টাচার্য। আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

এ আমার দায়বদ্ধতা

বাবাকে তাঁর জীবনের শেষ পনেরোটা বছর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। আর তারই ফসলস্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থটি। প্রথম দু'টি খণ্ড তিনি নিজেই মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেছিলেন। পাঠককুলের কাছে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। অল্প ক'দিনেই দু'টি খণ্ডের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

এরপর বাবা শেষ দু'টি খণ্ডের কাজে হাত দিয়েছিলেন। এই সময় তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি তাঁকে লিখতে একেবারেই সাহায্য করছিল না। ফলে এই পর্বে আমাকে অনুলেখকের ভূমিকায় সঙ্গে নিয়ে তিনি এই কাজ শেষ করতে সচেষ্ট হলেন। অবশিষ্ট দু'টি খণ্ড শেষ করার পর বাবা 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থটির চারটি খণ্ডই আমাকে প্রকাশ করার অনুমতি দান করলেন। কিন্তু সে কাজের অসমাপ্ত অবস্থাতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পেলেন ১৯২৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি।

স্বভাবতই আমার কাছে গচ্ছিত বাবার 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থটির ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। সঙ্গে ১ম ও ২য় খণ্ড দু'টিরও পুনর্মুদ্রণ করতে উদ্যোগী হলাম। এ ব্যাপারে আমাকে ক্রমাগত উৎসাহ জুগিয়েছেন সেই পাঠককুল, যাঁরা প্রথম দু'টি খণ্ড পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তাঁদের তাগিদও আমাকে দিনের পর দিন ব্যস্ত করে তুলেছিল। বাবার লেখা শেষ গ্রন্থ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়ার দায়বদ্ধতা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

এই সময় শ্রদ্ধেয় শ্রী অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়কে বাবার সম্পূর্ণ কাজটি দেখাই এবং সম্পাদনা করতে অনুরোধ জানাই। এ কাজে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের অকৃপণ সহযোগিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। চারটি খণ্ডের 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থটি এর পরে মুদ্রণ করতে উদ্যোগী হলাম।

জানি, এভাবে বাবার ঋণ শোধ করা যায় না। কিন্তু একটা দায়িত্ব পালন করার সুযোগ তো করে নেওয়া গেল। বইটির সম্পূর্ণ প্রকাশ পাঠককুলের আগ্রহ মেটাতে সক্ষম হলেই আমি ধন্য।

বুলবুল সাহা

সূচি

উপক্রমণিকা খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূল খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ শ্রীকৃষ্ণের রাশিচক্র ॥

জন্ম : ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী, বুধবার মধ্যরাত্রি, রোহিণী নক্ষত্রে॥

বৃষ রাশি, বৃষ লগ্ন, বৈশ্য বর্ম।

জ্যোতির্ম্মহানিবন্ধ অনুসারে

এই রাশিচক্রে সপ্তমাধিপতি মঙ্গল তুঙ্গী হওয়ায় এবং তা কোণস্থ হওয়ায় জাতকের বহু-বিবাহ যোগ দেখা যায়।

মিত্র-স্থানাধিপতি রবি স্বগৃহগত থাকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিত্রতা হয়েছিল। ভাগ্যাধিপতি শনি ষষ্ঠে অবস্থিত এবং তুঙ্গী হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরূপী মাতুল বিনাশ করতঃ রাজ্যলাভ করার যোগ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের রাশিচক্রে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনি বিশেষ বলবান্।

শ্রী শিশির চক্রবর্ত্তী

ভূমিকা

শ্রীকৃষ্ণ (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হওয়ার পর একটি বিষয় আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি,—সাধারণ মহলে খুব একটা উল্লেখযোগ্য সাড়া না জাগলেও পাঠক মহলের কাছ থেকে যে সব মন্তব্য শুনেছি, তা বিশেষ আশা-ব্যাঞ্জক। তাঁরা দ্বিতীয় খণ্ড সংগ্রহের জন্য খুবই আগ্রহান্বিত। যে সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল, সে সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। পাণ্ডুলিপি তৈরী হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণ-কার্য তখন আরম্ভ করা যায় নি। কারণ, বিভিন্ন পুরাণ ও গ্রন্থাদি থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করেছি সত্য, কিন্তু আমি পূর্বেই অর্থাৎ প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি—গতানুগতিক ধারার এবং বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বাস্তব ভিত্তিক শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী লেখা সম্ভব নয়। এই দুরূহ কার্যে গবেষণার খুবই প্রয়োজন। কারণ যে দেশের লোক শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ জ্ঞানে পূজো করে, তারাই আবার সেই শ্রীকৃষ্ণকে পরদারিক রূপে চিত্রিত করতেও কুণ্ঠিত হয় না ; —কতকগুলি অসামাজিক কার্যের নায়করূপে তাঁকে চিত্রিত করেছে। বাংলার ঘরে ঘরে রাধা-কৃষ্ণের পূজো হচ্ছে—(ভারতের অন্যত্রও হচ্ছে) সেই ভক্তদের জিজ্ঞেস করুন—রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক কি ? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাবেন,—'রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী' ; অল্প সংখ্যক ভক্ত অবশ্য বলবেন—রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকা। শ্রীকৃষ্ণ যখন ভগবান্, তখন তাঁর সঙ্গে প্রেম তো মানুষ মাত্রেরই হতে পারে ; সেখানে দোষের কি আছে ? ব্রজগোপী মাত্রেই কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্টা এবং তাঁকে প্রাণের ঠাকুর হিসেবে, একান্ত আপনজন হিসেবে ভালবেসেছিল। কিন্তু রাধা, যিনি আয়ান ঘোষের স্ত্রী-রূপেই সর্বত্র পরিচিতা, সেই পরস্ত্রী রাধার সঙ্গে

বিশেষ একটা প্রেমের সম্পর্ক দেখানোর তাৎপর্য কি? বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণের যখন ৭—১০ বৎসর বয়স, তখন রাধার বয়স ১৯—২২ বৎসর। কাজেই বৈষ্ণব কবিগণের লেখায় রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্যে যে ভাব ফোটান হয়েছে, তা মোটেই প্রকৃত কৃষ্ণ-প্রেম নয়। কৃষ্ণ-প্রেমে কাম-গন্ধ নেই। কিন্তু জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ সেই পবিত্র প্রেমকে দেহলালসারূপে চিত্রিত করেছেন। (প্রথম খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি) তার ফলে রাধার পবিত্র প্রেম কলুষিত হয়েছে। তারই ফলশ্রুতি রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী বা শ্রীকৃষ্ণ রাধার উপপতি—কিছু লোকের মনে বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণের যে মহাজীবন দীর্ঘকাল (১০৬ বৎসর) কত কর্ম-কাণ্ডের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, সাধারণ মানুষ তা জানে না। তারা সেই মহাজীবনের এক ক্ষুদ্রাংশ (মাত্র ১০ বৎসর) বৃন্দাবনের গোপালকে (গোরুর রাখালকে) জানে—ঠাকুরমার ঝুলির অবাস্তব গল্পের নায়কের মত। তার সঙ্গে জানে বৈষ্ণব কবিদের তৈরী উপন্যাসে রাধা, চন্দ্রাবলী, কুব্জা প্রভৃতির কথা, যা নিতান্তই মনগড়া। আমি উপন্যাস লিখতে বসি নি, আমি সেই মহাজীবনের একটা সামগ্রিক বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করছি। এরূপ প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পরে আর কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। যে শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির মূলাধার, তাঁকে যদি ভারতবাসী না জানতে পারে, তবে সেটা আমাদের অগৌরবের কথা নিঃসন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণের যখন দশ বৎসর বয়স, তখন গর্গ-মুনি একদিন কৃষ্ণ-বলরামকে তাঁদের সত্য-পরিচয় জানিয়ে বলেছিলেন,—তোমরা গোপবালক নও, গোরুর রাখালি তোমাদের কাজ নয়, তোমাদের কাজ মানুষের রাখালি করা। এই বলে তিনি তাঁদের বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাঁদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তারপর বারো বৎসর বয়স থেকে

তাঁদের নূতন জীবন শুরু হয়। প্রথম খণ্ডে সে কথা উল্লেখ করেছি।

শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিত জীবনের কথা এই দ্বিতীয়খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীও নন বা শ্রীকৃষ্ণও রাধার উপপতি নন, রাধা অন্যান্য ব্রজগোপীর মতই কৃষ্ণানুরাগিণী। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম স্ত্রী ছিলেন রুক্মিণী, বাইশ বৎসর বয়সে তিনি রুক্মিণীকে বিবাহ করেন। সেও রাজনৈতিক কারণে এবং এক বিশেষ পরিস্থিতিতে (মানবতার প্রেরণায় বলা যেতে পারে)।

শ্রীকৃষ্ণের সকল কার্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে,—একজন আদর্শ মানুষের যে কাজ, তিনি সব সময়ই তাই করতেন। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে এই পৃথিবীতে; তাঁরা কেউ কেউ অনেকের আদর্শ পুরুষ হিসেবে, এমন কি ভগবান্‌রূপে, পূজিত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা আদর্শ মানবের সবগুলি গুণলাভ করতে পারেন নি, বা ভগবান্ হওয়ার সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেন নি; কিন্তু তা লাভ করেছিলেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। পরাশর মুনি বলেছেন,—যে মানুষ ষড়ৈশ্বর্য গুণের অধিকারী, তিনিই ভগবান্ (ঈশ্বর-স্বরূপ)। এ বিষয়েও আমি প্রথমখণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। শ্রীকৃষ্ণ কেন 'ভগবান' বা কেন 'আদর্শ মানুষ' বা 'পুরুষোত্তম'—সেই বিশ্লেষণই হচ্ছে 'শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অধিকাংশ লেখকের লেখায়ই দেখা গিয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের মূল্যায়ন ঠিকমত হয় নি; কেউ কেউ তাঁকে জন্ম থেকেই ভগবান্‌-রূপে চিত্রিত করে নানা অলৌকিক কার্যের কর্তারূপে দেখিয়েছেন, কেউ বা কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি রিপুর বশবর্তী মানুষের মত চিত্রিত করেছেন; কেউ বা নারী-আসক্ত নায়ক রূপে চিত্রিত করেছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আসল রূপটি চিত্রিত করতে পারেন

নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনসেন ব্যতিক্রম। যে বল-বীর্য ও শক্তি-সাহসের গুণে শ্রীকৃষ্ণ জগতে অজেয় বীর বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তা অর্জন করতে কী কঠোর সাধনার দরকার, সে কথা কয়জনে জানতে চেষ্টা করেছেন? অত্যাচারীর হাত থেকে পিতা-মাতাকে উদ্ধার করতে এবং দেশবাসীকে শোষণ-মুক্ত করতে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তি ও যৌগিক শক্তি অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন এবং সারাজীবনই যৌগিক শক্তি অর্জনের অনুশীলন করেছেন। এখানে একটি কথা বলা দরকার,—যে ব্যক্তি পুরুষকারের ওপর নির্ভরশীল, সেই শ্রীকৃষ্ণ দৈব-শক্তিকেও কখনও অগ্রাহ্য করেন নি। এ কথা আমি অনেক স্থলেই প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছি। প্রথম তিনি গোমন্তক-যুদ্ধে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) প্রত্যক্ষ করেছেন—দৈব কি ভাবে মানুষকে সাহায্য করেন। সেই যুদ্ধে জরাসন্ধ-গোষ্ঠীর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

যে কথা বলছিলাম—অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণ হিসেবে অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে—স্বচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকা পরিদর্শন করা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি,—৩৫০০ বছর পরে যদিও সবই বিলুপ্ত প্রায় এবং মূল দ্বারাবতী পশ্চিম সাগর অর্থাৎ আরব সাগরের গর্ভে নিমজ্জিত*, তবুও সেই আমলের স্মৃতিচিহ্নের যে সামান্য সামান্য নিদর্শন এখনও বর্তমান রয়েছে, তা প্রত্যক্ষ করে আমার দ্বারকা-পরিভ্রমণ সার্থক হয়েছে, মনে করি।

---

* ভারত সরকারের "জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া"-র আর্কিওলজি ডিপার্টমেণ্ট—ঐ সমুদ্র গর্ভ থেকে ভগ্ন গৃহাংশের কিছুটা উত্তোলন করে গবেষণার জন্য বোম্বাই লেবরেটরীতে নিয়ে গিয়েছেন ঐ ভগ্নাংশের বয়স নির্ণয় করতে।

দ্বারকার দু'একজন প্রবীণ বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। দ্বারকার শ্রীযুক্ত জয়ন্তীলাল থাকর, এবং পোর-বন্দরের শ্রীযুক্ত মণিভাই ভোড়ার সঙ্গে আলাপে জেনেছি, —প্রভাস তীর্থ বর্তমানে যেখানে আছে, সেটা শ্রীকৃষ্ণের আমলের নয়, সেখানে যে শ্রীকৃষ্ণের শ্মশান-স্মৃতি-মন্দির, সেটা পরবর্তী কালে তৈরী। শ্রীকৃষ্ণের আমলের সেই সব স্থান সমুদ্রগর্ভে। প্রভাসক্ষেত্র বলতে তখন বর্তমান প্রভাস-তীর্থ থেকে পোরবন্দর (সুদামা পুরী) পর্যন্ত গোটা উপকূলটাই বোঝাত। যেখানে অশ্বত্থ-চ্ছায়ায় বিশ্রামরত শ্রীকৃষ্ণ জরা ব্যাধের হাতে তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন, সে স্থানটিও উপকূলভাগেই বর্তমান প্রভাস থেকে ছ' মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের আমলে এই উপকূল অঞ্চলে দ্বারকা থেকে প্রভাস পর্যন্ত প্রায় ২৫০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা ছিল। রাস্তা এতটা প্রশস্ত হওয়ার 'কারণ' শুনলাম—শ্রীকৃষ্ণের রথ বাহিত হোত চারটি অশ্বের দ্বারা*। চার-অশ্ব-বাহিত রথ চলতে প্রশস্ত রাস্তার প্রয়োজন; কারণ দু'-অশ্ববাহিত রথের অশ্ব সংযত করা, যত সহজ, চার-অশ্ব-বাহিত রথের অশ্ব সংযত করা, তত সহজ নয়, খুবই কঠিন এবং তার গতিপথও সোজা নয়, আঁকাবাঁকা; গতিবেগও খুব দ্রুত।

সুদামাপুরীতে ঘর-বাড়ী পূর্বের কিছুই নেই, (থাকা সম্ভবও নয়) সবই পরবর্তী কালের তৈরী। তবে ভক্ত সুদামার (শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী) বাসস্থানের স্মৃতি রক্ষা করা হচ্ছে।

পোরবন্দর থেকে ছ' মাইল পূর্বে রয়েছে বড়ড়া পাহাড়; তার নিকটে রয়েছে জাম্ববতী গুহা (Jambubanti cave)। এই গুহাটি ৩৫০০ বছরের স্মৃতি বহন করছে। সেটা অনার্য সর্দার

---

*অশ্বগুলির নাম—(১) শৈব্য, (২) মেঘপুষ্প, (৩) সুগ্রীব ও (৪) বলাহক। এই রথ তিনি কোথায় পেলেন, এই খণ্ডে তা আছে।

জাম্ববানের অঞ্চল ছিল, ৩৫০০ বছর আগের অনার্য-সভ্যতার নিদর্শন হয়ে রয়েছে। সেই গুহায় রয়েছে বহু প্রাচীন, মনে হয় সেই আমলেরই, দু'টি শিবলিঙ্গ, জাম্ববানের উপাস্য বলেই বোধ হয়। এতে এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, আর্যদের আগমনের পূর্বেই ভারতে শিব-পূজার প্রচলন ছিল। মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার* নিদর্শনে শিব ও জগদম্বার উল্লেখ আছে। এই রকম শিবলিঙ্গ (খাঁচ-কাটা নয়, কাল পাথরও নয়, সাদাটে রঙের বেলে পাথরের ছোট একটি কীলক স্তম্ভ, নীচে একটি চক্রাকার আসন, তাতেই এই পাথর অর্থাৎ শিবের প্রতীক চিহ্নটি, বসানো। পিণ্ডারকেও (গুজরাটি ভাষায় পিণ্ডারা) সমুদ্রের বেলা ভূমিতে এইরূপ একটি শিবলিঙ্গ দেখেছি। মোটামুটি মসৃণ, তবে বহু পুরাতন, বয়সের ছাপ রয়েছে তাতে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই শিবলিঙ্গের বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করলে ঐ যুগের বয়স নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে। পিণ্ডারকের শিবলিঙ্গটি একটি ভাবনা এনে দিচ্ছে মনে; উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে কি 'শিব' পূজিত হয়েছিলেন ? রাজসূয় যজ্ঞের জন্য স্থান দ্বারাবতীতে ছিল না বলেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে ১৬ মাইল পূর্বে এই পিণ্ডারকে রাজসূয় যজ্ঞের স্থান নির্বাচন করেছিলেন, মনে হয়। বর্তমানে অবশ্য সেই বিরাট প্রান্তরের অধিকাংশ স্থানই আরব-সাগরের বেলাভূমি (কচ্ছের রান অঞ্চলের কথা মনে করিয়ে দেয়)—মুক্তো আহরণের অঞ্চল।

সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল আমার রৈবতক পাহাড় দেখার। জুনাগড়ের গির্ণার পাহাড়কে সেকালের রৈবতক পাহাড় বলা হচ্ছে। সেখানে এখন উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জৈনতীর্থ। গিরিনাথ শব্দের গুজরাটি উচ্চারণ গির্ণার। বহু প্রাচীন কীর্তি এখানে বর্তমান আছে। সর্বোচ্চ শৃঙ্গে দত্তাত্রেয় আশ্রম। বর্তমান গির্ণার থেকে

*আবিষ্কারক—শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বারকার যে দূরত্ব, তাতে গির্ণারকে রৈবতক বলে মেনে নেওয়া মুস্কিল (২০০/২৫০ কিঃ মিঃ দূরত্ব)। তবে এ বিষয়ে পোর-বন্দরের প্রবীণ ও প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী মণিভাই ভোড়ার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। দ্বারকার সমুদ্র-কূলে যে বিরাট বিরাট পাহাড়ের খণ্ডাংশ পড়ে আছে, সেগুলো কোথা থেকে এলো ? আলোচনা-কালে আমি বলেছিলাম—রৈবতকের পশ্চিমাংশ, যা পশ্চিম সাগরের (আরব সাগরের) নিকটবর্তী ছিল, সেই অংশ এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোন সময় ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছে, যার ধ্বংসাবশেষ সমুদ্র তীরের নিকটে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করছে। বর্তমান 'দ্বারকাধীশ মন্দির' থেকে শুরু করে 'লাইট-হাউস' পর্যন্ত এরূপ বিরাট বিরাট শিলাখণ্ড আমার চোখে পড়েছে। 'ভেট দ্বারকা' যেতে আরবসাগরের চড়ায়ও এরূপ বিরাট বিধ্বস্ত শিলাখণ্ড দেখা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীভোড়া আমার কথা সমর্থন করে রৈবতকের গঠন সম্বন্ধে বললেন,—রৈবতক পূর্বে-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং মাঝখানে খুবই নীচু, প্রায় সমতল, ঘোড়ার জীনের (Horse-saddle) মত। রৈবতক পাহাড়ের উপরিস্থিত মন্দিরাদি, বিশ্রামাগার, সভাগৃহ ইত্যাদি দ্বারাবতী থেকে খুব দূর হলে যোগাযোগ সহজ হ'ত না। কাজেই রৈবতক পাহাড়ের পশ্চিমাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত—এইটাই মেনে নিতে হয়।

আর একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল 'ওখা'* রেল ষ্টেশন এবং বাণরাজার রাজধানী শোনিতপুর নিয়ে। 'ঊষা' শব্দের গুজরাটি উচ্চারণ 'ওখা'। বাণকন্যা ঊষা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী। জানা যায়,—ঊষা-অনিরুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতীর অদূরে ভারতের মূল ভূখণ্ডেই একটি পুরী নির্মাণ করিয়েছিলেন, সেই পুরী পরবর্তীকালে 'ওখা' নামে পরিচিত হয়।

প্রাচীন শোণিতপুর সম্বন্ধে জানা যায়—হিমালয়ের উত্তরে

*দ্বারকার পরের ষ্টেশন এবং এইটাই এখানকার শেষ ষ্টেশন।

মানস সরোবরের পূর্বদিকে কৈলাশ পর্বতের কোন স্থানে এই শোণিতপুর ছিল। বাণরাজা ছিলেন বলীরাজার বংশধর। বলীরাজার রাজ্য ছিল পাতাল পুরীতে। পশ্চিম ভারতের সিন্ধু উপকূলের নিম্নভূমি অঞ্চলকে পাতাল বলেছেন মনীষী নবীন সেন।

আসিরীয় সভ্যতা সম্বন্ধে শ্রীভোরার সঙ্গে কথা হোল। এখন থেকে প্রায় চার হাজার বৎসরের প্রাচীন এই সভ্যতা এবং সেই যুগে ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের নৌ-বাণিজ্যের কথাও জানা যায়। সেই যুগের ভারতীয় মুদ্রা সেখানে পাওয়া গিয়েছে। মোট কথা আলোচনার মাধ্যমে আমরা উভয়ে একমত যে, লোহিত-সাগর এবং পারস্য-উপসাগরের উপকূল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। দ্বারাবতীর আর্থিক উন্নতিকল্পে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতীর সমুদ্র-উপকূলে কয়েকটি বাণিজ্য-বন্দর স্থাপন করেছিলেন।

এই আলোচনার মধ্যে শোণিতপুরের অবস্থান নিয়ে আমরা উভয়েই হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত শোণিতপুর সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করি ; অন্য কোন শোণিতপুরও হতে পারে। কারণ হিসেবে বলা যায়—কথিত আছে বাণকন্যা ঊষার সহচরী চিত্রশিল্পী এবং মোহিনীবিদ্যায় পারদর্শিনী নৃত্য-পটীয়সী চিত্রলেখা হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত শোণিতপুর থেকে এসে দ্বারাবতী থেকে ঊষার স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রেমাস্পদ অনিরুদ্ধকে অপহরণ করে শোণিতপুরে নিয়ে গিয়ে গোপনে ঊষার সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত শোণিতপুর থেকে চিত্রলেখার দ্বারাবতী আসা এবং সেখান থেকে অনিরুদ্ধকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার ? প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। আমরা উভয়েই একমত যে, নৌপথেই চিত্রলেখার দ্বারাবতীতে আসা সম্ভব। তাহলে সিন্ধু প্রদেশের উপকূল বা লোহিত সাগর বা পারস্য উপসাগরের উপকূল অঞ্চলের কোন স্থান থেকে তিনি এসেছিলেন। ঊষা-অনিরুদ্ধ-কাহিনী শুধু উপন্যাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না,

কারণ অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে শ্রীকৃষ্ণকে বাণ-রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এটা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীতে একটা ঘটনা। উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ সময়ান্তরে আলোচনা করা যাবে।

*　　*　　*　　*

সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে অনেক ঘটনা 'শ্রুতি' হয়ে বেঁচে থাকে; কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে দেখা গিয়েছে—ঘটনার বিষয়বস্তুই প্রধান হয়ে বেঁচে আছে, কিন্তু ঘটনার স্থানের নাম মানুষের স্মৃতিপথ থেকে সড়ে গিয়েছে। কারণ তখনকার সবই তো শ্রুতি-নির্ভরশীল। আরও একটি কারণ—একই নামের স্থানগুলির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি।—পাণ্ডুপত্নী মাদ্রী 'মদ্র' দেশের কন্যা। সে 'মদ্র' মাদ্রাজ নয়, সিন্ধুর উপনদী ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল; অর্জুনপত্নী চিত্রাঙ্গদা মণিপুর-রাজকন্যা; আসামের পূর্বাংশে যে মণিপুর রাজ্য রয়েছে, এটা সে মণিপুর নয়, পুরাণে বর্ণিত মণিপুর—মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার সীমানায় যে মলয় পর্বত রয়েছে, সেখানে এ মণিপুর (পরবর্তী নাম মণিকাপত্তম)। নরকাসুরের রাজধানী আসামের কামরূপ জেলায় অবস্থিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নয়, বলা হচ্ছে—এ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবরের নিকটবর্তী কোন স্থানে; 'প্রভাস' তীর্থ একটি আরবসাগরের উপকূলে, আর একটি কুরুক্ষেত্রের নিকট সরস্বতী নদীর ধারে। পাতাল সম্বন্ধে পুরাণে কোন স্থান নির্দিষ্ট করা নেই, নবীন সেন মহাশয়ের বর্ণনানুসারে সিন্ধু প্রদেশের নিম্ন অরণ্য অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে। বাণ-রাজা ছিলেন বলী রাজার বংশধর; বলীর রাজ্য ছিল পাতাল পুরীতে; এখন এই পাতাল পুরী কোথায়?*

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে,—কিছু কিছু লোক, যারা নিজেকে শিক্ষিত বলে মাৎসর্য প্রকাশ করেন, তারা শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কথা কাল্পনিক বলে মন্তব্য করেন। আমার মনে হয়,—তাঁরা ইতিহাস-গবেষকদের শ্রম ও জ্ঞান চর্চাকে আমল দিতে চান না এবং শ্রদ্ধাও করেন না। তাঁদের এই মনোভাবকে খামখেয়ালীপনা বা অগভীর জ্ঞানের প্রকাশ ছাড়া কি বলতে পারি?

---

*অকাট্য প্রমাণসহ কারও যদি এ সম্বন্ধে কিছু জানা থাকে, তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এইরূপ গবেষণা কার্যে নির্ভুল সমাধান করা খুবই কঠিন কাজ। যুক্তিসম্মত লব্ধজ্ঞানসঞ্জাত বিষয় চিরদিনই গ্রহণীয়। কোন কোন বিষয়ের পরবর্তীকালের গবেষকের যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তকে সকল ক্ষেত্রেই স্বাগত জানানো হয়েছে।

চার হাজার বছরের প্রাচীন ভারত বা ঐতিহাসিক ভারতকে জানতে হলে মগধের ইতিহাস জানা দরকার। প্রথম খণ্ডে আমি মগধের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছি। কারণ মগধের ইতিহাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীর অনেকটাই জড়িত। সেই মগধের ইতিহাস যদি ইতিহাস হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণও ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি—প্রথম খণ্ডে তা উল্লেখ করেছি। আবার বিভিন্ন পুরাণেরও সাহায্য নিয়েছি, তারও উল্লেখ করেছি। —ভারতবাসীর খুবই দুর্ভাগ্য যে,—এই মহাজীবন সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ, তারা কল্পনা-রাজ্যের নায়ক হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকে জানে; তাঁর আদর্শজীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি—আমি উপন্যাস লিখতে বসি নি, আমি শ্রীকৃষ্ণের জীবনীকার। তাঁর মহাজীবনের কতটুকুই বা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তুলে ধরতে সক্ষম হবো? এ তো বামনের চাঁদ ধরার মতো। তবু আমি কৈফিয়ৎ হিসেবে বলবো, আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে যতটুকু পারি, তুলে ধরব সেই আদর্শ জীবনকে। এর পরবর্তী গবেষকগণ আবার চেষ্টা করবেন; তাঁরা এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। একের চেষ্টায় যদি সম্ভব না হয়, অনেকের চেষ্টায় তা সম্ভব হবেই। চাই শুধু একনিষ্ঠা।

* * * *

রৈবতক পর্বত সম্বন্ধে বলছি,—জুনাগড়ে এখন যাকে গির্ণার পাহাড় বলা হচ্ছে, সেইটিই শ্রীকৃষ্ণের সময় রৈবতক পাহাড় নামে অভিহিত ছিল। তা মেনে নিলেও রৈবতকের পশ্চিমাংশ যে ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছে, এটা মানতেই হয়। সেই পর্বতের খণ্ডাংশগুলি এখনও আরব সাগরের উপকূলে এবং সাগর-জলে অবস্থিত থেকে তার সাক্ষ্য বহন করছে। রৈবতক পাহাড় শ্রীকৃষ্ণজীবনীর এক অপরিহার্য অংশ। দ্বারাবতী আর রৈবতক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দ্বারাবতীকে সুরক্ষার জন্যই রৈবতকে সেনা-নিবাস ছিল। এখান থেকেই শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা শিক্ষালাভ করেছিল; এখানকার বাসভবনে ভারত-দর্শন শেষে অর্জুনের অবস্থান এবং অর্জুনকর্তৃক নিহত অনার্য চন্দ্রচূড়ের কন্যা শৈলজার সাক্ষাৎ, সুভদ্রা-হরণ প্রভৃতি

বহু ঘটনা ঘটেছে এখানে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীতে এ সবই অপরিহার্য। কাজেই রৈবতকের পশ্চিমাংশ যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে গির্ণার পাহাড়কে এখন পূর্বের রৈবতক বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রৈবতকের পূর্বাংশ। এইখানে যোগশৃঙ্গ অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের সময় কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এইখানেই বেদ বিভাগ এবং বেদান্ত রচনা করেছিলেন। সান্দিপনী-আশ্রম থেকে ফেরার পথে কৃষ্ণ-বলরাম এই যোগ-শৃঙ্গেই এসে ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর আরও বেশ কয়েক বৎসর পর প্রভাসতীর্থ থেকে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারাবতী যাওয়ার পথে শ্রীকৃষ্ণ এখানে এসে ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এইখানেই ছিল অষ্টকোণ বিশিষ্ট বেদী, যেখানে বসে ব্যাসদেব বহু শাস্ত্র রচনা করেছেন। সেখানে গিয়ে যতটা জানতে পেরেছি এবং রৈবতক কাব্যে ও নানা লোকের সঙ্গে আলোচনায় যে ধারণা জন্মেছে, তার ওপর ভিত্তি করে রৈবতক পর্বতের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। রৈবতকের যে অংশ গির্ণার নামে অভিহিত, সেটা রৈবতকের পূর্বাংশ নিঃসন্দেহ। 'রৈবতকের' পশ্চিমাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই ধ্বংসাবশেষই আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন ভগ্ন-পর্বতাংশ।

আমার যতটুকু জানা আছে, তাতে বলতে পারি—মহামনীষী বঙ্কিমচন্দ্রই এই মহাজীবনের ওপর প্রথম আলোকপাত করেছেন। তখন থেকেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-গোসাঁইদের উপন্যাসের শ্রীকৃষ্ণকে সঠিক কৃষ্ণচরিত্র বলে মানতে রাজি নন। যে শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য গুণের অধিকারী—(শ্রী, বীর্য, জ্ঞান, যশঃ, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য), সেই শ্রীকৃষ্ণকে পরদারিক রূপে চিত্রিত করা—সত্যের অপলাপ তো বটেই, অপরাধও বটে। প্রথম খণ্ডে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। এই দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রামী জীবনের এক বিরাট অংশ বর্ণিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার—বঙ্কিমচন্দ্র 'নরকাসুর-বধ ও 'বাণাসুর-বধ' ঘটনাকে অবাস্তব বলে এ বিষয় দু'টি পরিত্যাগ করেছেন। নরকাসুরের ব্যাপারটায় পুরাণকারের কল্পনার বাহাদুরী আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণুরূপী বরাহের স্পর্শে বসুমতী গর্ভবতী হলেন, সেই গর্ভে নরকাসুরের জন্ম ; এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। আরও অবাস্তব ঘটনা এতে বর্ণিত আছে—তা হোল—নরকাসুরের অন্তঃপুরের তার ষোল হাজার উপপত্নীকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ করা। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে এই পুরাণকার কোন পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন ? যাঁকে বলা হচ্ছে—ভগবান্ (ঈশ্বর), তাঁকেই আবার কিরূপ কামাচারী-রূপে চিত্রিত করেছেন। (এর অনুকূলে অবশ্য একটা কৈফিয়ৎ দাঁড় করানো হয়েছে, তাতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র নিষ্কলুষ, তা প্রমাণিত হয় না।)

নরকাসুর প্রসঙ্গে এখানে আরও উল্লেখ করতে হয়, শ্রীকৃষ্ণের এক নাম 'মুরারি' (মুর + অরি)। 'মুর' ছিল নরকাসুরের সেনাপতি। সে স-পুত্র লৌহিত্যের (ব্রহ্মপুত্র-নদ) নৌযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হন। ব্রহ্মপুত্র নদকে লৌহিত্য বলা হয়েছে কেন, তার কোন উল্লেখ কোথাও নেই। যেখানে নৌ-যুদ্ধ হয়েছে বলা হয়েছে, সেখানে নৌ-যুদ্ধেরও কোন সম্ভাবনা নেই। ব্রহ্মপুত্রের ঐ অংশে খরস্রোত থাকায় নাব্য নয়, কাজেই নৌ-চালনা সম্ভব নয়। আর শ্রীকৃষ্ণই বা নৌ-সেনা নিয়ে কি করে সেখানে যাবেন ? সবই আজগুবি গল্প। (লোহিত সাগর বা পারস্য উপসাগর বা কচ্ছ উপসাগর অর্থাৎ পশ্চিম সাগরে সম্ভব) কারণ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাবতী থেকে হিমালয়ের উত্তরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে যুদ্ধ করা একেবারেই অবাস্তব। এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন। এ ছাড়া সত্য উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভব নয় ; নইলে এতে শুধু অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া হবে।

বাণাসুরের ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করলেও আমি ত্যাগ করতে পারছি না। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন

কিনা জানি না। তা ছাড়া 'ওখা' রেলষ্টেশন তখন (অর্থাৎ বঙ্কিম চন্দ্রের আমলে) স্থাপিত হয় নি। বর্তমানে আমি দ্বারকা গিয়ে স্ব-চক্ষে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছি এবং সেখানকার পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি—তাতে বাণাসুর কাহিনী পরিত্যাগ করতে পারছি না। ৩৫00—8000 বছরের ঘটনা। এই সব পুরাণকার (সবগুলি পুরাণ বেদব্যাসকৃত বলে প্রচারিত হলেও সেটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়) অনেকেই আধুনিক; তাঁরা জম্বুদ্বীপ (প্রাচীন এশিয়া) সম্বন্ধে সম্যক্‌জ্ঞান রাখেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

'ওখা' রেল ষ্টেশনের অস্তিত্ব উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করায়। যদু-বংশধর 'বজ্র' তাঁদের পুত্র, তাঁর কথাও জানা যায়।

সময়ান্তরে এ নিয়ে আলোচনা করব। ভূমিকা দীর্ঘায়াত করে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। শুধু বলে রাখি—শ্রীকৃষ্ণ জীবনীতে বাস্তব দিকটাই তুলে ধরতে চাই, তাই এই কথাগুলি বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

ভূমিকা শেষ করার আগে আর একটি বিষয় পাঠককে জানানো প্রয়োজন মনে করি। পাঠক এ বিষয়টিতে হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন, আশা করি। ভারতবর্ষের মাটির স্বাভাবিক প্রকৃতি উদার এবং তার জন্যই এখানকার যারা সত্যিকারের জাতক অর্থাৎ আর্যদের এখানে আসার পূর্বে যারা এখানে বাস করত (নাগা, কুকী, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, লেপ্চা, গারো, হাজং, হদি, খাসি, নাগ, নিষাদ প্রভৃতি আদিবাসী), তাদের প্রকৃতির মধ্যেও সেই উদারতা, সরলতা ছিল, যার জন্য আর্যদের কূটনীতির কাছে তারা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, তাদের সঙ্গে কোন মতে এঁটে উঠতে না পেরে তৎকালীন ভারতীয়গণ (আদি) নিজেদের

অসহায় ভেবে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কত অনার্য-নারী যে বিজেতা আর্য-জাতির কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার শিকার হতে বাধ্য হয়েছিল, তার সংখ্যা কে বলতে পারে? আনার্য-নারী আর্য-নারীদের মত শুভ্র বর্ণের না হলেও স্বাস্থ্য ও দেহ-গঠনের দিক থেকে তারা অনেকেই আর্য-নারী অপেক্ষা সুশ্রী ও সুঠাম দেহ-বিশিষ্টা। অনার্যগণ আর্যদের অস্পৃশ্য হলেও অনার্য-নারী তাদের অস্পৃশ্যা ছিল না, বিশেষতঃ যৌন-সঙ্গিনী করার বেলায় তো নয়ই। যদিও আর্যদের এই সব কার্য-কলাপের কথা তাঁরা গোপন করার চেষ্টা করেছেন, তবু কিছু কিছু ঘটনা নানা পরিস্থিতির চাপে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ধরুন না—লংকার রাজা রাবণের মা কৈকসী অনার্য-কন্যা হলেও বিশ্রবা মুনির ঔরসে রাবণের জন্ম। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জন্ম, শুকদেব গোস্বামীর জন্ম, আস্তীক মুনির জন্ম ইত্যাদিও এইরূপ।

আর্য ঋষিগণ শিক্ষায় অগ্রসর ছিলেন। বেদ থেকে শুরু করে যাবতীয় শাস্ত্র-পুরাণ তাঁরা রচনা করেছেন এবং সেগুলি শ্রুতি হিসেবে বহুকাল আর্য-সমাজে চলে আসছিল বা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে সেগুলো পুরাণ হিসেবে প্রকাশিত হোল, আর প্রাচীন ইতিহাসের মাল-মশলা তা থেকেই সংগৃহীত হতে লাগল। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ঐসব গ্রন্থে অনার্য (অসভ্য নয়)-দের গৌরবের কথা বা তাদের সভ্যতার ইতিহাস আর্য-ঋষিগণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই কোথাও, বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি। সেই জন্য অনার্যদের গৌরবের কথা পরবর্তী কালের লোকেরা ভাল-ভাবে জানে না। সেদিন* মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত না হলে পৃথিবীর মানুষ জানতেই পারতো না যে, আর্যদের ভারতে আসার আগেও ভারতবাসী এক উচ্চমানের সভ্যতার আলোকে আলোকিত ছিল। নবীন সেন মহাশয় তাঁর

*১৯২২ খ্রীঃ

কাব্যে অনার্য-সভ্যতার কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। আমার এই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীতে তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বর্তমানের পাঠক সমাজ অনেক আত্মসচেতন। তাঁরা যুক্তি-গ্রাহ্য বাস্তবধর্মী কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন; অলৌকিক বা আজগুবি বিষয়ের প্রতি তাঁদের অনাস্থা। এই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি,—আজগুবি বিষয়গুলিকে বর্জন করতে। সেই সঙ্গে চেষ্টা করেছি ভারতের আদিবাসীদের মানসিকতার দিকটা তুলে ধরতে। তারা যে অনেক বিষয়েই আর্যদের চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে, সেটা পাঠক লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন।

শ্রীকৃষ্ণের আমলে আর্য-ঋষিগণ অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে আর্যবংশ-সম্ভূত বলে স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না, পরবর্তীকালে অবশ্য সে ধারণা দূর হয়েছিল, তবুও বলবো শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর প্রধান কারণ—তাঁর প্রতি আর্য-ঋষিদের ঘৃণা। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীতে (বিশেষ ভাবে চতুর্থ খণ্ডে) সে কথার উল্লেখ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী লিখতে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের পথ অবলম্বন করেছি, অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের কার্য-কলাপের উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি। আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আপনি তো কৃষ্ণানুরাগী, নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের পুজো করেন?"—"হ্যাঁ করি।" "আপনি কি 'শ্রীকৃষ্ণ-পূজা'—নারায়ণ (বা ঈশ্বর) পূজা মনে করেন?" সঙ্কেতে জানালাম—'হ্যাঁ।'—'কেন?' তখন আমাকে বলতেই হোল,—"সকলেই জানেন,—ঈশ্বরের কোন রূপ নেই, হিন্দুর ঈশ্বর 'নারায়ণ'—তাঁরও কোন রূপ নেই। যার 'রূপ' বা আকার নেই, তাঁর ধারণা আপনি কি করে করবেন? সে তো শুধু অন্ধকার। মহাভারতের মহান্ পুরুষ ভীষ্মদেব; তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণকে 'নর-নারায়ণ' (অর্থাৎ নররূপী নারায়ণ) বলে অভিহিত করলেন, তখন থেকেই শ্রীকৃষ্ণ 'নারায়ণ' রূপে পূজিত হচ্ছেন।"

যাঁরা নারায়ণকে চতুর্ভুজ-মূর্তি 'বিগ্রহ' ক'রে পূজো করেন, আসলে তারা শ্রীকৃষ্ণকেই পূজো করেন। নারায়ণের ঐ মূর্তিটি শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্তি, শুধু দু'টি কাল্পনিক হাত সেই মূর্তিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।* এ সম্বন্ধেও প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এসব কথা ভূমিকায় লেখার কারণ—পাঠককে আমি সহমর্মী হতে প্রেরণা না দিলে তিনি তো আমার—"শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী" লেখার সারবত্তা বুঝতে পারবেন না। শুধু পড়ার জন্য বইটি সংগ্রহ করে পড়া শেষ করলেই আমার চেষ্টা সার্থক হবে না। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীর মর্মকথা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। সুখের কথা—ইতিমধ্যেই কিছু পাঠকের মন্তব্যে বুঝতে পেরেছি—তাঁরা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তিদ্বারা আমার শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী লেখার উদ্দেশ্য উল্লেখ করে ভূমিকা শেষ করছি—

"হিন্দু ধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্ব কর্মকৃৎ; এখনকার হিন্দু সর্ব কর্মে অকর্মা।........জয়দেব গোসাঁয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে।"

বিনীত
গ্রন্থকার

---

*প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য বুঝতেই পারছেন। কৃষ্ণানুরাগী ব্যক্তির লেখায় একদেশ-দর্শিতা-দোষ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সে দোষ যাতে না ঘটে, তার জন্য আমি সর্বদা সচেতন।

শ্রীকৃষ্ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

মথুরা/দ্বারাবতী/রৈবতক

(১৮ বৎসর বয়স থেকে ৫৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত)

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী লেখার মত দুরূহ কার্য্যে উদ্যোগী হয়েছি কেন, সে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। পুরাণ ও ইতিহাস থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হই নি, শ্রীকৃষ্ণস্থলীগুলি স্বচক্ষে দেখবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তার কারণ—লোকের মনগড়া কথায় বা লেখায় কৃষ্ণ-বিষয়ক অনেক কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই আমার এই প্রচেষ্টা। যদিও যুক্তিসঙ্গত বক্তব্যদ্বারাই আমি শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীর ঘটনাগুলি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি, তবুও দেখছি,—কিছু লোকের মনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা এমনই মোহাচ্ছন্ন সংস্কারে পরিণত হয়েছে যে, তাঁকে ভগবান্ বলে বিশ্বাস করেও তাঁকেই আবার নারী-আসক্ত খল-নায়ক রূপে গ্রহণ করছে। সত্যি—এর মত দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে? কিন্তু তাতেও আমি সত্য আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হতে বিরত হবো না।

আমি যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে বলতে পারি,—তাঁর এই ১০৬ বৎসর দীর্ঘ আয়ুষ্কালের মধ্যে মাত্র ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি আনন্দময় জীবনের সুখ ভোগ করেছেন। তবু নিয়তি তার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের নিজের হাতের বাঁশীতে বেদনা-ভরা সুর তুলে জানিয়ে দিয়েছিল,—"তোমার আবার সুখ কোথায়?"

ছেলেবেলায় 'কানু' আনমনে বাঁশী বাজাতেন, তাতে যে বেদনার সুর বেজে উঠত, তা ব্রজগোপীরা বুঝতে পারত।* বেদনাভরা বাঁশীর সুর সত্যই মানুষকে মোহিত করে। কৃষ্ণের সেই বাঁশীর সুরকে বৈষ্ণব-গোসাঁইরা প্রচার করলেন—কানু তাঁর প্রণয়িণী রাই-

---

* শ্রীকৃষ্ণ (১ম খণ্ড) পৃষ্ঠা ১৬২

কিশোরীকে তাঁর বাঁশীতে "রাধা—রাধা" বলে ডাকছেন। (কানুর বয়স তখন আট, রাই-এর বয়স কুড়ি।) আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অবশ্য একটা করা যায় ;—'রাধা' মানে ভক্ত, যিনি ভগবানের আরাধনা করেন। তা হলে ব্যাখ্যাটা হবে—ভগবান্ ভক্তকে 'রাধা—রাধা' বলে তাঁর নিকটে আসার জন্যে ডাকছেন।

যে জীবন-সত্তার পৃথিবীতে আগমনের পূর্ব থেকেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছিল এবং এক ভয়ংকর পরিবেশ অতিক্রম করে অপর একটি জীবনের বিনিময়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল, সে জীবন সংগ্রামের জীবন, সে জীবন ত্যাগ ও দুঃখের বিলাস-কানন। মা যশোদার বাৎসল্য, পিতা নন্দের ত্যাগ ও স্নেহ, আর ব্রজগোপীর প্রেমামৃত রসে জারিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের জীবন হয়ে উঠেছিল অতুল্য, অনন্য সাধারণ, মানব-গোষ্ঠীতে অদ্বিতীয়। সারা জীবন দুঃখ তাঁকে অনুসরণ করলেও দুঃখের শিকার তিনি কখনও হন নি, হাসিমুখে তাকে জয় করার অসীম ক্ষমতা তাঁর ছিল। গীতায় তিনি যে কথা বলেছেন—

দুঃখেষ্মনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধ ঃ স্হিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ২।৫৬—গীতা*

এই নীতি নিজ জীবনে তিনি সর্বদা পালন করেছেন।

জরাসন্ধের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে জ্ঞাতিদের জন্য তিনি নূতন উপনিবেশ গড়ে তুললেন দ্বারাবতীতে ; শুধু তাই নয়, মথুরার সমস্ত সম্পদ্ এবং পরবর্তী কালে—যত অর্থ তিনি সংগ্রহ করেছেন, তার সমস্ত যাদবদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তবুও তাদের মন পান নি তিনি। তাঁকে যেটুকু সম্মান তারা

* দুঃখে যে ব্যক্তি কাতর হয় না, সুখে যে ব্যক্তি নিরাসক্ত থাকেন, ভয় এবং ক্রোধকে যিনি জয় করেছেন, তিনিই প্রকৃত মানুষ (ব্রহ্মজ্ঞ)।

করত, তা করত শ্রীকৃষ্ণের অসীম ক্ষমতার কাছে নিজেদের দুর্বল ভেবে। যে দুর্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণ আট অক্ষৌহিণী নারায়ণী-সেনা দিয়ে সাহায্য করেছেন, সেই দুর্যোধনই (শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়ও বটে) তাঁকে বন্দী করার জন্য ফাঁদ পেতেছিলেন। পিতৃ-স্বসার ভর্তা চেদী-পতি দমঘোষ ও তৎপুত্র শিশুপাল নিকট আত্মীয় হয়েও তাঁরা চিরদিন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রবল শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করেছেন। স্যমন্তক মণি নিয়ে যে বিপত্তি দেখা দিয়েছিল, তাতে নিজ ভ্রাতা বলরাম এবং সত্রাজিৎ প্রভৃতি জ্ঞাতিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরূপ আচরণ করেছিল। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে—সারা জীবনই তাঁকে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। আত্মীয়দের মধ্যে একমাত্র পাণ্ডবগণ ব্যতিক্রম। তাঁরা বাসুদেবের প্রতি প্রকৃত বান্ধবের ন্যায় ব্যবহার করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানতে চেষ্টা করেছি। তা থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছি, তা-ই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি তাঁর জীবনীতে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মথুরার নব পরিবেশ

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাকে শক্তিশালী করার জন্য নূতনভাবে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি বিধানের জন্য নানা পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন / কুন্তী ও পাণ্ডবগণ

যদু-বংশের যে দু'টি প্রধান শাখা, তারা হোল—মহারাজ যদুর এক পুত্র ক্রোষ্টুর বংশধর, আর এক পুত্র সাত্বতের বংশধর। ক্রোষ্টুর বংশধর বৃষণ থেকে বৃষ্ণি-বংশের উৎপত্তি। সেই বংশে শূরের জন্ম; বসুদেব সহ তাঁর দশটি পুত্র, এবং পাঁচটি কন্যা। কন্যাদের নাম—পৃথুকীর্তি, পৃথা, শ্রুতশ্রবা, শ্রুতদেবা ও রাজাধিবেদী। অন্যদিকে সাত্বতের বংশধর ভজমান থেকে ভোজ বংশের উৎপত্তি। সেই বংশে কুন্তী-ভোজের জন্ম। তাঁর সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি শূরের কন্যা পৃথাকে দত্তক গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য কুন্তী-ভোজের একটি পুত্র জন্মে, তাঁর নাম হৃদিক, যাঁর বংশধর কৃতবর্মা ও শতধন্বা।*

পৃথা কুন্তী-ভোজের পালিতা কন্যা বলে পরবর্তী কালে কুন্তী নামেই সমধিক পরিচিতা হন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীতে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীরও একটি বিশেষ স্থান আছে; তাই কৃষ্ণের সঙ্গে

---

* শ্রীকৃষ্ণের বংশ-পঞ্জী (প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা ৯০ দ্রষ্টব্য)।

প্রথম সাক্ষাতের পূর্বে কুন্তীর যে-জীবন অতিবাহিত হয়েছে, তার কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার। কৃষ্ণের সঙ্গে যখন কুন্তীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তার বৈধব্য-দশা এবং তখন তিনি পঞ্চ-পাণ্ডবের জননী বলেই পরিচিতা, যদিও নকুল-সহদেব নিজ-গর্ভের সন্তান নয়, সপত্নী মাদ্রীর গর্ভজাত। কুন্তী কৃষ্ণের পিতৃস্বসা (বসুদেবের ভগিনী) হলেও অন্যত্র অন্য পরিবারে প্রতিপালিত হওয়ায় তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু কৃষ্ণের জানা সম্ভব ছিল না।

কুন্তী রূপে-গুণে সর্ব বিষয়েই অনন্যা। রূপের দিক থেকে এক কথায় বলা যেতে পারে অপরূপা। পালিতা হলেও রাজ-কন্যার মর্যাদায়ই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তবে বালিকা-বয়স থেকেই তাঁর চরিত্রে দেখা গিয়েছে একটা শান্ত অচঞ্চল ভাব, যা পরবর্তী কালে অতলস্পর্শী বারিধির প্রশান্তি-রূপে তাঁর চোখে-মুখে সব সময় পরিস্ফুট ছিল। এর কারণ খুঁজতে গেলে একটা কথাই মনে আসে, সেটা হচ্ছে—ছোট বেলা থেকে আপন পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যথাই তাঁর বয়সোচিত চাঞ্চল্য ও তরলতাকে তাঁর মন থেকে দূরে—বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। তাঁর রূপ-গুণ ও চরিত্র-মাধুর্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই ভোজগৃহে আতিথ্য-লাভের আশায় মুনি-ঋষিদেরও আগমন হোত।

কুন্তী তখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন। একদিন ঋষি দুর্বাসা ভোজরাজ-গৃহে অতিথি হয়ে কিছুদিন থাকবেন বলে রাজাকে জানান।

* * * * *

এই ঋষি দুর্বাসার সম্বন্ধে জানতে হলে সে-কালের মুনি-ঋষিদের কথাও কিছু জানা দরকার। তা না হলে ঋষি দুর্বাসাকে ঠিকমত বোঝা যাবে না।—

সে যুগে সমাজ-ব্যবস্থায়, এমন কি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়ও, মুনি-ঋষিদের খুবই প্রাধান্য ছিল। রাজার বৃত্তিভোগীই হোন

বা ভিক্ষাজীবীই হোন, তপোবনে বাস করেও তাঁরা তৎকালীন সমাজে সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতেন। সাধারণ মানুষ তো মুনি-ঋষিদের নামে ভয়ে কাঁপত। সেই সুযোগে মুনি-ঋষিগণ অনেকে ব্রহ্মচারী বা সিদ্ধ-পুরুষ-রূপে নিজেদের প্রচার করে বেড়াতেন। অথচ ব্রহ্মচারীর যে প্রধান গুণ—ষড়রিপু জয় করার ক্ষমতা, তা তাঁদের অধিকাংশেরই ছিল না। বিশেষ করে প্রধান ও প্রথম দু'টিকে অর্থাৎ কাম ও ক্রোধ—এই দু'টিকে তাঁরা অনেকেই জয় করতে পারেন নি। মহর্ষি পরাশর মুনি, তৎপুত্র মহাকবি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, মহর্ষি দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র মুনি, মহর্ষি ভরদ্বাজ, ঋষি শরদ্বান্ প্রভৃতি বহু মুনি-ঋষির নাম করা যায়, যাঁরা ঐ দু'টি প্রধান রিপুকে (বিশেষতঃ কাম রিপুকে) জয় করতে পারেন নি, যার ফলে এঁদের দ্বারা অনেক অবৈধ বা ক্ষেত্রজ বা কানীন পুত্রের জন্ম হয়েছে। কত নারী যে (আর্য ও অনার্য উভয়েই) এঁদের কাম-লিপ্সা চরিতার্থ করতে বাধ্য হয়েছে, তা যদি আর্য ঋষিদের জীবনীতে লিপিবদ্ধ থাকত, তবে হয়তো ঋষিদের প্রকৃত স্বরূপটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যথাযথ প্রকাশিত হোত। সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে এই আর্য-ঋষিদের বিবেক-বিচার। অনার্যরা আর্য-ঋষির অস্পৃশ্য, কিন্তু অনার্য-নারী তাঁর যৌনাচার-সঙ্গিনী হতে সে তাঁর অস্পৃশ্যা থাকত না। এখানে অবশ্য এ বিষয়টি আমাদের উপজীব্য বিষয় নয়, তবু এঁদের কামাচারের বিষয় কিছুটা আলোচনা করা দরকার, কারণ বিষয়গুলি জানা থাকলে পরবর্তী অনেক বিষয়-বস্তু বুঝতে পাঠকের সুবিধে হবে।

অনেকেই হয়তো জানেন না—অগস্ত্য মুনি ও বশিষ্ট মুনির জন্ম কুম্ভা-যোনিতে।* মহামুনি পরাশর স্ব-পাক অনার্য-কন্যার গর্ভজাত। শুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের (ব্যাসদেবের) ঔরসে ম্লেচ্ছ-কন্যা শুকীর গর্ভজাত। দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের জন্মও কুম্ভা-যোনিতে।

* বেশ্যার গর্ভে। কুম্ভা = বেশ্যা।

বিশ্বামিত্র মুনি স্বর্গবেশ্যা মেনকার রূপে কামার্ত হয়ে তপোভঙ্গ করে তার সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত হন। ফলে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। বিশ্বামিত্রের নিষ্ঠুরতার কাহিনীও পুরাণে বর্ণিত আছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত দানবীর নৃপতির কী দুর্দশাই না ঘটেছিল তাঁর হাতে! তাঁর হাতে বশিষ্টের কী দুর্দশা ঘটেছিল! বশিষ্টের বারো জন পুত্রকেই হত্যা করেছিলেন এই বিশ্বামিত্র।

আর্য-ঋষিদের চরিত্র সম্বন্ধে পাঠকদের একটা সঠিক ধারণা জন্মাতে চাই এইজন্য যে, তাঁরা হাজার হাজার বৎসর ধরে ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য সমাজের ওপর কুসংস্কারের যে জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রেখেছেন, তাতে অনেক সম্ভাবনাময় জীবন পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ মহাভারত মহাকাব্যের এক অসামান্য চরিত্র মহাবীর কর্ণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কর্ণের মত এমন একটি সর্বগুণ-সম্পন্ন চরিত্র শুধু সূত-বংশোদ্ভব বলে (যদিও তা সত্যি নয়) দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের ঘৃণার পাত্র এবং সেই জন্যই কর্ণকে জীবনের বহু ক্ষেত্রে অপমানের গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে এবং তার বিষময় ফলও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। অথচ এই দুই আচার্যের কর্ণ অপেক্ষা হীন যোনিতে জন্ম। এঁরা দু'জনেই কুম্ভা-যোনিতে অর্থাৎ বেশ্যার গর্ভে জন্মেছেন। পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য অবাস্তবটুকু বাদ দিয়ে সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি।—

একদিন ভরদ্বাজ মুনি গঙ্গার উৎস-মুখে স-শিষ্য স্নান করতে যান। তিনি অবগাহনান্তে গঙ্গা-তীরে উঠে আসার সময় দেখতে পান—স্বর্গ-বেশ্যা ঘৃতাচি স্নানান্তে তীরে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় বাতাসে ঘৃতাচির গাত্রাবরণ উড়ে যায়। ফলে অপূর্ব মোহময়ী নবযৌবনা মদমত্তা কামিনীর নগ্ন রূপ দেখে মুনি

কামার্ত হয়ে পড়েন। কামাবেগ সহ্য করতে না পেরে ঘৃতাচির সঙ্গে মুনি কামাচারে প্রবৃত্ত হন। তাতেই দ্রোণের জন্ম হয়।*

গোতম ঋষির পুত্র গৌতম, যাঁর আর এক নাম শরদ্বান্, ধনুর্বিদ্যা অধ্যয়নে অভিলাষী হয়ে কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় ইন্দ্র ভয় পেয়ে তাঁর তপঃভঙ্গ করার জন্য 'জানপদী' নাম্নী এক অপ্সরাকে (স্বর্গ-বেশ্যাকে) প্রেরণ করেন। তাকে দেখে কামে জর্জরিত শরদ্বান্ ঋষি সেই বেশ্যার সহিত কামাচারে প্রবৃত্ত হন এবং তাতেই সেই বেশ্যার গর্ভে জমজ সন্তানের জন্ম হয়। একজন পুত্র (কৃপ), আর একজন কন্যা (কৃপী)**। জানপদী সন্তান দুটিকে ত্যাগ করে। স্বর্গ-বেশ্যাদের অনেকেই এরূপ করে থাকে। মহারাজ শান্তনুর মৃগয়া-কালে সৈন্যেরা এই শিশুদ্বয়কে কুড়িয়ে পায়; রাজা শান্তনু তাদের নিয়ে গিয়ে আপন সন্তানের ন্যায় পালন করতে থাকেন। পরবর্তী কালে শরদ্বান্ ঋষি তাদের কথা জানতে পেরে নিজেই গিয়ে পুত্র কৃপের সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে গোত্রাদি জানালেন এবং ধনুর্বেদ (চতুর্বিধ) এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তুললেন। কৃপাচার্য একজন বিখ্যাত ধনুর্বেদ অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁর বহু ছাত্রও ছিল।

তা'হলে দেখুন, কর্ণ অপেক্ষা হীন যোনিতে জন্মগ্রহণ করেও শুধু ব্রাহ্মণ এই সুবাদে কর্ণকে কী অপমানই না করেছেন এই দুই আচার্য।

মহামুনি পরাশরও কামরিপুকে জয় করতে পারেন নি। অনার্য ধীবর-কন্যা মৎস্যগন্ধা (সত্যবতী) একমাত্র যাত্রী পরাশর মুনিকে খেয়াপার করে দিচ্ছিল; তখন নৌকা চালানোর ঝুঁকির

---

* এ সম্বন্ধে যে গল্প প্রচারিত আছে, তা অবাস্তব। নর-নারীর দৈহিক মিলন ছাড়া সন্তানের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়।

** অবাস্তব কাহিনীটুকু বাদ দিয়েছি।

তালে সুডৌল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী পরিপূর্ণ যৌবনা মৎস্যগন্ধার অর্ধাবৃত সুপুষ্ট কুচ-যুগলের নর্তন মহামুনির মনে সুতীব্র কামাবেগ সঞ্চার করেছিল এবং যার ফলে তিনি মৎস্যগন্ধাকে রতি-দানের প্রস্তাব করে বসলেন। আর্যঋষির সে প্রস্তাব নানা কারণে সে অগ্রাহ্য করতে পারে নি। কুয়াশাচ্ছন্ন নির্জন দ্বীপে মুনি অনার্যকন্যা মৎস্যগন্ধার সহিত কামাচারে লিপ্ত হলেন। তার ফল-স্বরূপ কুমারীকালেই মৎস্যগন্ধা পুত্রবতী হোল। মুনি কিন্তু সেই কানীন পুত্রকে ত্যাগ করেন নি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সেই সন্তানকে আশ্রমে রেখে যোগ্য শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই পুত্রই মহাকবি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বা বেদব্যাস। মহামুনি পরাশর নিজের এই দুর্বলতার কথা অন্যান্য মুনি-ঋষির ন্যায় গোপন করতে চেষ্টা করেন নি।

সেকালে বাড়ীতে অতিথি বা গুরুদেব এলে বাড়ীর কুমারী কন্যারাই তাঁদের সেবার ভার নিত। এই নিয়ম আর্য-সমাজে বহুদিন যাবৎ চলে আসছিল। গুরুদেব বা অতিথির মনোরঞ্জন করতে তারা সব রকম কার্য করতে প্রস্তুত থাকত। এমন কি তাদের সঙ্গে যৌনাচারও কোনরূপ দোষের ছিল না এবং তাতে সতীত্ব হানিও হোত না। এই সময়টাকে, মনে হয়, সংহিতার যুগ বলা হোত। সামাজিক নানা কারণে আর্যদের মধ্যে ঐ প্রথা চালু ছিল। কুমারীর সন্তান তখন সমাজে অপাংক্তেয় ছিল না*। আর্য ঋষির অস্পৃশ্যা মৎস্যগন্ধার কানীন পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সমাজে অগ্রাহ্য হয় নি। তবে মনে হয়, তারপর থেকেই এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়; তাই কুমারীর সন্তান হলে তখন সে নিন্দনীয়া হোত। যাক্ এ প্রসঙ্গ এখন বন্ধ রেখে আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক্।

---

* অনার্যদের সঙ্গে সংগ্রামে আর্যদের লোক-বল কমে যাওয়ায় জন-সংখ্যা বৃদ্ধির তাগিদে, মনে হয়, এইরূপ সন্তান সমাজে তখন গ্রাহ্য হোত।

দুর্বাসা-ঋষির* কথা এইবার আমরা আলোচনা কোরব। কারণ কুন্তীর (পৃথার) জীবন-বৃত্তান্তে তা অপরিহার্য।

*　　*　　*　　*　　*

অতিথি-বৎসল ভোজরাজ ঋষি দুর্বাসার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন দুর্বাসা এই আতিথ্যের জন্য একটি শর্ত আরোপ করলেন। সে শর্তটি হচ্ছে এই—তিনি যতদিন ইচ্ছা তাঁর গৃহে বাস করবেন ; ইচ্ছামত যখন তখন ভিক্ষার্থে বহির্গমন করবেন ও ফিরে এসে যথা-সময়ে সন্ধ্যাহ্নিক এবং বিশ্রাম করবেন। তাতে যেন কোনরূপ ত্রুটী না ঘটে। ত্রুটী ঘটলে তিনি আর এক মুহূর্তও থাকবেন না।

তখন ভোজরাজ বললেন,—'আমার কন্যা কুমারী পৃথা (কুন্তী) খুবই সেবা-পরায়ণা। আশাকরি, আপনার পরিচর্যার কোন ত্রুটী হবে না।'

দুর্বাসা ভোজরাজার আতিথ্য স্বীকার করলেন। কারণ পৃথার সেবাপরায়ণতার কথা তিনি পূর্বেই শুনেছিলেন এবং সেই জন্যই ভোজগৃহে আতিথ্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ভোজরাজা অন্তঃপুরে এসে কন্যা পৃথাকে দুর্বাসার আতিথ্যের কথা জানিয়ে তাঁকে এই অতিথি-সেবার ভার নিতে বললেন এবং ঋষির আতিথ্যের যাতে কোন ত্রুটি না ঘটে, সে বিষয়ে তাঁকে যথোচিত কর্তব্য পালনে যত্নবান হতে বললেন! সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হবে না, পৃথাও পিতাকে এরূপ আশ্বাস দিলেন।

দুর্বাসার বাসের জন্য রাজা ধবল শুভ্র এক মনোরম গৃহ নির্দিষ্ট করে দিলেন। মুনি সেখানে স্বাধীন ভাবে বসবাস করতে লাগলেন। পৃথাও নিষ্ঠার সহিত মুনির সেবা করতে লাগলেন। মুনির সন্ধ্যাহ্নিকের যথাযথ ব্যবস্থা, শয্যা রচনা, পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান,

---

* দুর্বাসা অত্রিমুনির পুত্র। ঔর্ব মুনির কন্যা কন্দলীকে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহ-কালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ইনি স্ত্রীর শত অপরাধ ক্ষমা করবেন। তদনুসারে ইনি শত অপরাধের পর পত্নীকে শাপদ্বারা ভস্ম করেন।

আহার-প্রস্তুত প্রভৃতি কোন বিষয়ে ত্রুটি ছিল না। মুনির বহির্গমনের বা গৃহে প্রত্যাবর্তনের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। কখনও সন্ধ্যায়, কখনও গভীর রাত্রিতে, কখনও বা ভোর বেলায় মুনি গৃহে ফিরতেন। সেজন্য পৃথা কোন সময়ই ঐ গৃহ ছেড়ে অন্তঃপুরে যাবারও সুযোগ পেতেন না, পাছে মুনি এসে তাঁকে গৃহে না দেখে ক্রোধ প্রকাশ করেন! এইভাবে কিছুকাল কেটে গেল।

এ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচারিত আছে, তা হোল—দুর্বাসা কুন্তীর সেবার সন্তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে বর দিতে চাইলেন। কিন্তু কুন্তী বললেন, তাঁর বরের প্রয়োজন নেই ; তিনি যে তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাতেই তিনি (কুন্তী) খুশী। তবুও দুর্বাসা তাঁকে বরস্বরূপ অভিচার মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। এই মন্ত্রের বলে যে কোন দেবতাকে আহ্বান করলে সেই দেবতা কুন্তীর ইচ্ছামত কাজ করতে বাধ্য থাকবেন।

দুর্বাসা চলে গেলে একদিন বালিকা-সুলভ কৌতূহল বশতঃ কুন্তী অভিচার মন্ত্রে সূর্যকে আহ্বান করলেন। সূর্য কুন্তীর নিকট উপস্থিত হলে তিনি (কুন্তী) ভীত হয়ে পড়েন। তখন সূর্য তাঁর নাভিদেশ স্পর্শ করেন। তাতে কুন্তী অচৈতন্য হয়ে শয্যা গ্রহণ করেন এবং তাতে তাঁর গর্ভ সঞ্চার হয়। যথাসময়ে কুমারী কুন্তী সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী এক পুত্র প্রসব করেন। লোক-নিন্দায় ভয়ে কুন্তী সেই সদ্যোজাত শিশুকে এক কাষ্ঠ-পেটিকায় স্থাপন করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। সেই পেটিকা ভাসতে ভাসতে কোন সময় তীরে আটকে যায়। তখন অধিরথ সূত* সে পেটিকা দেখতে পেয়ে ডাঙ্গায় তুলে পেটিকা খুলে তাতে অপূর্ব সুন্দর শিশুটিকে দেখতে পান। তার স্ত্রী রাধা নিঃসন্তান থাকায় অধিরথ শিশুটিকে স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নিজ সন্তানের ন্যায়

* সূত : ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরস-জাত প্রতিলোমজ সংকীর্ণ জাতি।

পালন করতে বলেন। রাধাও হৃষ্ট চিত্তে শিশুটিকে পুত্রবৎ পালন করতে থাকেন। পুত্রের নাম রাখা হল কর্ণ; অন্য নাম বসুসেন।

এই অবাস্তব কাহিনী বিশ্বাস-যোগ্য নয়। লোকের চোখে ধুলো দিতে আর্য-ঋষির তৈরী কাহিনী। নর-নারীর দৈহিক মিলন না হলে অর্থাৎ নারীর ডিম্বকোষে পুরুষের শুক্রকীট প্রবিষ্ট না হলে সন্তানের জন্ম হতে পারে না। কাজেই কর্ণের জন্মের বাস্তব দিকটা যদি আলোচনা করি, তবে আমরা কি দেখতে পাই?—দুর্বাসার ভোজগৃহে এত দীর্ঘদিন থাকার (প্রায় এক বৎসর) কারণ কি? ভোজরাজকে শর্তে আবদ্ধ করার-ই বা কারণ কি? ভিক্ষান্তে যখন তখন অনিয়মিত, এমন কি গভীর রাতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে—কুন্তীকে অসহায় অবস্থায় পাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মাঝ রাতে বা শেষ রাতে গৃহে প্রবেশের হেতু। দুর্বাসার সহিত যৌন-মিলনে কুন্তীর নিশ্চয়ই অনিচ্ছা ছিল, কারণ তিনি বিদুষী, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্না এবং সমাজে নিন্দনীয় কাজ কি, তা তিনি জানতেন; তিনি ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্টাও বটেন। কিন্তু যে হেতু পিতার নিকট শপথ করে-ছিলেন—দুর্বাসার সেবার কোন ত্রুটি হবে না, তাই তিনি শপথ রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। তাছাড়া এ জ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট হয়েছিল,—কামাসক্ত বা কামার্ত ব্যক্তি যদি ঈপ্সিতকে সম্ভোগ করতে না পারে, তবে তার ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং দুর্বাসার ন্যায় তপঃ-সিদ্ধ ঋষির ক্রোধ হওয়া মানে চরম অমঙ্গলের কারণ। শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার ক্রোধের কারণ কি শুধু অতিথির অবহেলা? শকুন্তলার আমলে তো কন্যকা অবস্থায় অতিথির মনোরঞ্জনে যৌনমিলন দোষের ছিল না। কিন্তু ঋষি তো জানতেন না—শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের গান্ধর্বমতে বিবাহিতা স্ত্রী, দুষ্মন্তের সন্তান তার গর্ভে। শকুন্তলা ইচ্ছাকৃতভাবেই দুর্বাসাকে বিমুখ

করেছিলেন। তার ফল হোল দারুণ অভিশাপ। কুন্তী সে কথা জানতেন। কাজেই দুর্বাসাকে বিমুখ করতে কুন্তী সাহস পান নি। কুন্তী অসামান্যা ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী হয়ে অনিচ্ছা সত্বেও দুর্বাসার কামাচারের সঙ্গিনী হতে বাধ্য হন। কিন্তু নবযৌবন-প্রাপ্তা কুন্তী যখন অনাস্বাদিত রতিসুখানুভূতির অনির্বচনীয় আনন্দে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, তখন সূর্যসম তোজোদীপ্ত ঋষি দুর্বাসাই তাঁর পরম প্রিয় ও শ্রেয়ঃ হয়ে উঠলেন। ফলাফলের কথা না ভেবে রতিলীলায় তাঁরা উভয়ে মেতে রইলেন। ফলে কন্যকা অবস্থায় কুন্তী পুত্রের জননী হলেন। সে পুত্র আকাশের সূর্যের নয়, সে পুত্র সূর্যসম তেজোদীপ্ত ঋষি দুর্বাসার।

আরও প্রমান রয়েছে মহা পণ্ডিত মহাকবি নবীন সেনের লেখায়।—

দুর্বাসা ব্রাহ্মণ্য-শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ক্ষত্রিয়-ধ্বংশের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। কৌরব-পক্ষের কোন বীরই একা অভিমন্যুকে বধ করতে পারছিল না। অসামান্য বীর অভিমন্যুর মৃত্যু না ঘটালে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসান হবে না—একথা ঋষি দুর্বাসা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই একদিন গোপনে এক নির্জনস্থানে কর্ণকে ডাকিয়ে অভিমন্যু-বধের পরামর্শ দিলেন,—'তোমরা কৌরব-পক্ষের কোন বীর যদি একা অভিমন্যুকে বধ করতে না পার, সকলে মিলে একসঙ্গে তাকে আক্রমণ কর, তখন সে আর নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

কর্ণ এই প্রস্তাবে শিউরে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এ অন্যায় যুদ্ধ তাঁরদ্বারা সম্ভব নয়।

দুর্বাসা বলেছিলেন,—'আমায় বিমুখ করবি? অবহেলা করবি গুরু-জনকেরে?'

কর্ণ চমকে উঠে বলেছিলেন,—'জনকেরে?' দুর্বাসা

বলেছিলেন,—'হ্যাঁ, জনকেরে। তা নইলে কি তোর পরিচয় গোপন করে পরশুরামের কাছে তোর অস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেয় দুর্বাসা? সূত-পুত্র হলে কি পরশুরাম তোকে অস্ত্রশিক্ষা দিত? সেদিন এ ন্যায়-অন্যায় বোধ কোথায় ছিল? দুর্বাসা মিথ্যাবাদী নয়। তুই কুন্তীর কানীন পুত্র,* আমার মন্ত্র-পুত্র। আমার শিষ্যা রাধা আমারই ইচ্ছায় তোকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন করে।

এতে কি প্রমাণ হয় না—কর্ণ দুর্বাসার অবৈধ সন্তান?**

ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী, একজন ঋষি একজন নারীকে অভিচার মন্ত্র শেখাবেন কেন? নারীর সতীত্ব-ধর্মের কোন মূল্য তিনি দিলেন না? তিনি তাঁকে ঐ মন্ত্রের সাহায্যে বহু-বল্লভা হতে উৎসাহিত করলেন! অসৎ জীবন যাপনের জন্য বরদান? এটা কিরূপ মনস্তাত্ত্বিক বিচার? এতে দুর্বাসার কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হয়েছে? আসল কথা প্রকৃত ঘটনাকে গোপন করার চেষ্টা।

কন্যকা অবস্থায় সন্তানের জননী হলে তখন সমাজে খুব, নিন্দনীয়া হতে হোত; তাছাড়া দুর্বাসাও এ নিন্দার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তেন। তাই যাতে লোক জানাজানি না হয়, সেইজন্য দুর্বাসার পরিকল্পনায় ও চেষ্টায় কুন্তীর বিশ্বাসী দাসদাসীর সাহায্যে নৌকা-যোগে অধিরথ-গৃহে রাধার কাছে সন্তানটিকে পাঠানো হয়েছিল। তখন অধিরথ-পত্নী রাধা নিঃসন্তান ছিলেন। পরবর্তী-কালে অবশ্য তাঁর সন্তান হয়েছিল।

'রাধা' দুর্বাসার শিষ্যা ছিলেন। তাই দুর্বাসার ইচ্ছায়ই রাধা কর্ণকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন করেছিলেন। শিশুকর্ণ নদীদিয়ে পেটিকায় ভেসে আসে নি। একটি পরিকল্পনামত

---

* কুমারী মায়ের সন্তান।

** কানীন পুত্র তখন সমাজে গ্রাহ্য হোত না।

নৌকো ও লোকের সাহায্যে শিশুটি রাধার কাছে পৌঁছেছিল। এই হোল কুমারী কুন্তীর পুত্র কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত।

তারপর কুন্তীর বিবাহ। স্বয়ম্বর সভা। কুন্তীর রূপ-গুণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা ও রাজপুত্রেরা ভোজগৃহে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছেন। কুরু রাজকুমার পাণ্ডুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ী-বীর, রূপবান্ এবং কুরুরাজ্যের অধীশ্বর। পাত্রহিসেবে খুবই যোগ্য। কুন্তী তাঁর গলায়ই মালা দিলেন। পাণ্ডু নববধূকে নিয়ে রাজধানী হস্তিনায় ফিরলেন। কিছুদিন পর দেখা গেল পাণ্ডুর সহিত সহবাসে কুন্তীর কোন সন্তানাদি হোল না। তারপর পাণ্ডু মাদ্রীকে বিবাহ করেন। তাঁরও কোন সন্তানাদি হোল না। তখন কুন্তী বুঝতে পারলেন পাণ্ডুর বীর্যে মৃত শুক্রকীট। তাঁর পুত্র উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুকে কুরুরাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। পাণ্ডু নিঃসন্তান হলে সে কাজ অতি সহজ হবে। সেটা বুঝেই পাণ্ডু পত্নীদ্বয়কে নিয়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে গিয়ে ক্ষেত্রজপুত্রের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। হস্তিনায় থাকলে সেকাজ সহজ হোত না। শতশৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডুর ইচ্ছাক্রমে কুন্তীর তিনজন এবং মাদ্রীর দু'জন ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম হয়।

যুধিষ্ঠিরের বয়স যখন ১৬, ভীমের ১৫, অর্জুনের ১৪ এবং নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর কয়েক মাস, তখন পাণ্ডুর মৃত্যু ঘটে।* মাদ্রী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হন। সেই সময় শতশৃঙ্গ পর্বতের

---

* পাণ্ডুর মৃত্যু সম্বন্ধে এক অবাস্তব কাহিনী প্রচলিত আছে। পাণ্ডু একদা মৃগয়ায় গিয়ে মৃগ-মিথুনকে তীর-বিদ্ধ ক'রে তাদের একটির মৃত্যু ঘটান। মৃত্যুকালে মৃগটি অভিশম্পাত করে—পাণ্ডুরও যেন স্ত্রী-সহবাসকালে মৃত্যু ঘটে। এ গল্প বিশ্বাসযোগ্য নয়। পাণ্ডুর মৃত্যু-ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সুচিন্তিত অভিমত এখানে দেওয়া হোল।—

মুনি-ঋষিগণ পরামর্শ করে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে হস্তিনায় নিয়ে এসে কুরু বংশের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং রাজ-অন্তঃপুরে বাস করার অধিকার লাভে সহায়তা করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জরাসন্ধের মথুরা অবরোধ/কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা ত্যাগ

বিরাট বাহিনী নিয়ে জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করলেন। মথুরার সৈন্যবল ঐ বাহিনীর তুলনায় অতি নগণ্য। মাত্র কয়েক সহস্র সৈন্য নিয়ে ঐ বিরাট সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃষ্ণ-বলরাম যুদ্ধ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ-কৌশলে ঐ বিরাট বাহিনী যাদব-সৈন্যদের পরাজিত করতে পারে নি। যতবার আক্রমণ করেছে তারা, ততবারই পরাজিত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি-মগধ

দাম্পত্য-জীবনে সন্তান না হওয়ার প্রধানতঃ তিনটি স্বাভাবিক অবস্থাকে দায়ী করা যেতে পারে। প্রথমতঃ স্বামীর অক্ষমতা, দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব কিংবা উভয়পক্ষেরই সন্তান প্রজননের অক্ষমতা ; যে হেতু স্বামী ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা কুন্তী গর্ভধারণে সক্ষম হয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে পাণ্ডুর প্রজনন-ক্ষমতার ব্যর্থতাকেই দায়ী করা যেতে পারে। পাণ্ডুর ঔরসে কোনও সন্তান আসে নি।

এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য যে 'পাণ্ডু' নামও ইঙ্গিতপূর্ণ স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ-সূচক। চিকিৎসা-শাস্ত্র বলে—এমন অনেক রোগ আছে, যা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড ও রক্তসংবহন-জনিত জন্মগত শারীরিক ত্রুটী থাকলে যৌন-জীবন অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চালিত হওয়া উচিত। পাণ্ডুর সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা হেতু প্রথমা স্ত্রী কুন্তীর পুত্রের জনক হতে পারেন নি, এটা বোঝা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার তিনি বিবাহ ক'রে তার ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি করেছেন। স্বভাবতঃই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি তাঁর যৌন-জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নি। তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর যৌন-লিপ্সা স্বাস্থ্যবিধির সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

বাহিনী ও তাদের সহযোগীদেরই বেশী হয়েছে। সে তুলনায় যাদব-সৈন্যের ক্ষতি খুব কমই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন—এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে অল্পদিনের মধ্যেই মথুরার সৈন্য নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেই সময় এক জরুরী সভা আহ্বান করা হয়। সভায় নীতি-বিশারদ মহাতেজস্বী বিকদ্রু উগ্রসেনের সমক্ষে কৃষ্ণকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন,—'বৎস, এই আপৎকালে তোমাকে কিছু নূতন তথ্য জানানো কর্তব্য মনে করি। কারণ বর্তমান অবস্থায় যাদবগণের জন্য নিরাপদ স্থান খুঁজে বার করা দরকার। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই বংশের উদ্ভব-বৃত্তান্ত যা বেদব্যাসের নিকট থেকে জেনেছি, তা বর্ণনা করছি।—

[হরিবংশে যেভাবে যদুর বংশ বিস্তারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা খুবই বর্ণনা-বহুল এবং কিছু কিছু অলৌকিক ও অবাস্তব। তাই এখানে বিস্তৃত আলোচনা না করে সংক্ষেপে বাস্তব ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি।]

নরপতি যদু একদা পত্নীগণ-পরিবেষ্টিত হয়ে জলক্রীড়া করছিলেন। সেই সময় নাগরাজ ধূম্রবর্ণ তাঁকে বলপূর্বক নিজপুরীতে নিয়ে যান। ধূম্রবর্ণ বুঝতে পেরেছিলেন—এই নরপতি মহাভাগ্যবান্ এবং বিখ্যাত ইক্ষ্বাকু বংশে ইহাঁর জন্ম। তাই তিনি তাঁর পঞ্চ কন্যাকেও এঁর সঙ্গে বিবাহ দিতে মনস্থ করে নরপতিকে সে প্রস্তাব জানান, এবং আরও জানান তাঁর বরে এই কন্যাদের গর্ভজাত সন্তানগণ প্রত্যেকেই বিখ্যাত নৃপতি-রূপে গণ্য হবে। যদু নাগরাজকে বিমুখ করতে পারলেন না। ঐ পঞ্চ নাগকন্যাকে বিবাহ করে স্বপুরে ফিরে এলেন।

বহুদিন পর সেই পঞ্চ কন্যার গর্ভে পরাক্রান্ত পাঁচ তনয় জন্ম গ্রহণ করলেন। তাঁদের নাম—মধু, মুচুকুন্দ, পদ্মবন, সারস ও হরিত। পরে তাঁরা প্রাপ্ত-বয়স্ক হলে সকলে পিতার নিকট গমন-পূর্বক কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ চাইলেন।

তখন রাজা পুত্রদের বিক্রমশালী ও মহা বলশালী বুঝতে পেরে মনে মনে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি পুত্রগণকে একে একে উপদেশ দিতে লাগলেন। পুত্র মুচুকুন্দকে বললেন,—'তুমি বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্বতের ওপর দুই পুরী সন্নিবেশিত কর।' পদ্ম-বর্ণকে বললেন,—'বৎস! তুমি অবিলম্বে সহ্যাদ্রির ওঁপর দক্ষিণ পার্শ্বে একপুরী নির্মাণ কর।' সারসকে বললেন,—'বৎস সারস, তুমিও সেই পর্বতের পশ্চিম দিকে চম্পক-ভূষিত রমণীয় প্রদেশে মনোহর নগর নির্মাণ করে নাও।' হরিতকে বললেন,—'বৎস, সমুদ্রস্থিত 'দ্বীপ' যেখানে নাগজাতি বাসকরে, সেই দ্বীপ প্রতিপালন কর। আর মহাবাহু মধু সর্ব-জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও ধার্মিক; অতএব এঁকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করছি! এ আমার পুরী প্রতি-পালন করুক!'

পিত্রাদেশে চার কুমার রাজ-পদে অভিষিক্ত হয়ে নৃপতিভূষণ ছত্র ও চামর লাভ করে স্ব স্ব স্থানে গমন করতে লাগলেন।

মুচুকুন্দ নর্মদাতীরে মাহিষ্মতী নগরী ও বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্* পর্বতের পাদদেশে পুরিকা নামে ইন্দ্রপুরী তুল্য আর এক নগরী স্থাপন করলেন। রাজর্ষি পদ্মবর্ণ সহ্যাদ্রির উপরিভাগে বেনা নদীর তীরে অতি উত্তম এক নগর স্থাপন করলেন। এই নগরের এক নাম পদ্মাবত ও অপর নাম করবীরপুর।**

মহাত্মা সারস যে নগর তৈরী করলেন, তার নাম ক্রৌঞ্চপুর।*** চম্পক ও অশোক বৃক্ষে পরিপূর্ণ অতি মনোরম স্থান। শীত ও বসন্ত ঋতুজাত বৃক্ষই এখানে বেশী জন্মে। ঐ জনপদ বনবাসী নামে বিখ্যাত।

---

* ঋক্ষবান্ পর্বতের নাম অন্যত্রও পাওয়া যায়; পোরবন্দরের তিন ক্রোশ পূর্বে বড়ড়া পর্বতকেও ঋক্ষবান্ পর্বত বলা হোত'।

** বর্তমান কুর্গ। (কেরল)

*** বর্তমান কোচিন।

হরিতও সমুদ্রস্থিত দ্বীপ প্রতিপালন করতে লাগলেন। ঐ দ্বীপ বিভিন্ন রত্নে পরিপূর্ণ এবং অপূর্ব কামিনীগণে সমাকীর্ণ। সেখানে ধীবরগণ সমুদ্র-গর্ভ থেকে শংখ, মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি আহরণ-পূর্বক রাজ-কোষ পূর্ণ করতে রাজার নিকট জমা দিত। রাজা হরিত এই ভাবে কুবের তুল্য ধনবান্ হতে লাগলেন।

এইরূপে বিকদ্রু যাদবগণের পূর্ব ইতিহাস কৃষ্ণের নিকট বর্ণনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সভাস্থ সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলতে লাগলেন,—জরাসন্ধের মথুরা অবরোধের প্রধান উদ্দেশ্য হোল —তাদের দু'ভাইকে বন্দী করা। সেই সঙ্গে এ কথাও বললেন,— তাঁরা (অর্থাৎ কৃষ্ণ বলরাম) যদি মথুরায় না থাকে, তবে হয়তো তাঁর সৈন্যবাহিনীকে তাদের ধরার জন্য নিয়োগ করবেন। তখন হয়তো মথুরা অবরোধ-মুক্ত হতে পারে। তাই আগামী শেষ রাত্রিতে তাঁরা দু'ভাই মথুরা ত্যাগ করবেন। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা মথুরাবাসীকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। মথুরাবাসীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধানেই তাঁরা যাচ্ছেন। প্রথমে তাঁরা দক্ষিণ-ভারতে যাবেন। কারণ তিনি আগেই জেনেছিলেন এবং এখন মহামতি বিকদ্রুর কথায়ও জানা গেল, সেখানে অনেক যাদব-বংশধর বাস করেন। সেখানে আশ্রয়-লাভের চেষ্টা করবেন। যদি সেখানে আশ্রয় খুঁজে না পান, তবে পশ্চিম-সাগর-তীরে যে সব অঞ্চল আছে, সেখানে তারা যাবেন। মথুরাবাসীর জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বার করতেই হবে। নতুবা জরাসন্ধের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ত্যাগের কথা শুনে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। গর্গাচার্য শ্রীকৃষ্ণের কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। তিনি বললেন,—'তোমার ইচ্ছামতই কাজ হোক্; কেননা তোমার প্রজ্ঞা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে। তোমার কর্ম-নীতিতে কারও কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। তুমি

মথুরার মধুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তুমি মাধব*, তুমি মথুরাবাসীর কল্যাণ চিন্তায়ই সবকিছু করছ। আমি সর্বান্তঃকরণে তোমায় সমর্থন করি।'

সকলের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম শেষ রাতেই দ্রুতগামী অশ্বারোহণে মথুরা ত্যাগ করলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পরশুরাম-আশ্রম ও গোমন্তক আশ্রয়

সহ্যাদ্রি পর্বতের পূর্বাংশে গোমন্তক গিরি। তার পাদদেশে এক স্রোতস্বতীর তীরে বিশ্রামের আশায় অশ্বদ্বয়কে শুশ্রূষা করে তীর-ভূমিতে বিচরণের জন্য কৃষ্ণ-বলরাম ওদের মুক্ত করে দিলেন। তারপর নিজেরা স্রোতস্বতীর শীতল জলে স্নানাদি সেরে সঙ্গে আনীত খাদ্য গ্রহণ করে বিশ্রামাশায় পাহাড়ের ওপর এক বৃক্ষচ্ছায়ায় দু'ভাই বসলেন।

অদূরে হঠাৎ এক ধ্যানস্থ ঋষিকে দেখে তথায় গমন করলে ঋষির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। সবই মূল খণ্ডে পাওয়া যাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
গোমন্তক যুদ্ধ

গোমন্তক-যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এক অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছিল। সত্যই অকল্পনীয় ঘটনা। জরাসন্ধের এই পরাজয়ে ভারতের রাজন্য-বর্গের মনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভীতি ও শ্রদ্ধার ভাব প্রবলভাবে জেগেছিল।

মূল খণ্ডে পূর্ণ বিবরণ জানা যাবে।

---

* মাধব=(ব্যুৎপত্তি) মধু+(অপত্যার্থে) ষ্ণ প্রত্যয়। অর্থাৎ মধুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

করবীরপুর / শৃগাল-বাসুদেব বধ

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে শৃগাল-বাসুদেবের মৃত্যুতে এবং শ্রীকৃষ্ণের উদার নীতির ফলে দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ রাজ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের এ এক অভিনব সাফল্য। শ্রীকৃষ্ণ এখানে চতুরশ্ব-বাহিত রথ এবং বহুমূল্যবান্ উপঢৌকনাদি লাভ করলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বারাবতী

পদ্মাবতী-প্রদত্ত চতুরশ্ব* যুক্ত বেগবান্ রথে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য একটি রথে বলরাম মণি-মুক্তাদি যা সহজ বহন-যোগ্য, তা সঙ্গে নিয়ে সূর্পারকের** পথে যাত্রা করলেন, সঙ্গে চেদিরাজ দমঘোষ। সেখানে পরশুরামের সাক্ষাৎ না পেয়ে তারা গুজরাটের দিকে রওনা হলেন। পথে চেদিরাজ দমঘোষকে বিদায় দিলেন।

গুজরাটের রৈবতক পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে, সে স্থান জলময় কুশস্থলী। তার পশ্চিমেই পশ্চিম-সাগরে এক দ্বীপ দেখা গেল। সেটিও কুশস্থলী। চতুর্দিক্ জল-বেষ্টিত থাকায় সেই স্থানটি শ্রীকৃষ্ণের পছন্দ হোল। স্থানীয় লোক-জনের সাহায্যে জানতে পারলেন ঐ দ্বীপটির নাম দ্বারাবতী, প্রায় অরক্ষিত। সেখানে বসতি বিশেষ নেই, অল্প সংখ্যক অনার্যের বাস, কোন আর্য-বসতি নেই সেখানে। আর্য-ভারতে যাদবদের জন্য স্থান হবে না—এ কথা শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ তখন প্রায় সমগ্র আর্য-ভারত

---

* রথে যুক্ত চারটি অশ্বের নাম ঃ—শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প, বলাহক;

** বর্তমান সুরাট

জরাসন্ধ-গোষ্ঠীর ছত্র-ছায়ায় অবস্থিত। তাঁর স্বাভাবিক প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি এটা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই এই অনার্য-ভূমি দ্বারাবতীকেই যাদবদের নিরাপদ আশ্রয়-ভূমি ভাবলেন। কিভাবে এই কুশস্থলীতে, যার আয়তন দ্বাদশ যোজন, সুষ্ঠু পরিকল্পনা-দ্বারা নগর স্থাপন করবেন, তাই ভাবতে লাগলেন। বিশ্বকর্মার অনুসন্ধান করছিলেন। তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হওয়ায় তাঁকে নগর পরিকল্পনার বিষয় জ্ঞাত করান। প্রথমে বিশ্বকর্মার মনে সন্দেহ হয়, কারণ কৃষ্ণ-বলরাম তখন আশ্রয়হীন, বাস্তুত্যাগী; কোন পরিকল্পনা রূপায়িত করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পরে অর্থ-সংস্থানের বিষয়টি জেনে শ্রীকৃষ্ণের-ইচ্ছা মত দ্বারাবতী-নগর-পরিকল্পনা রূপায়ণে দৃঢ় সংকল্প জানালেন।

দ্বারাবতী-নগর পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণের স্থপতি-বিদ্যায় দক্ষতার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাজ শুরু হোল। বিশ্বকর্মা শ্রীকৃষ্ণের নগর-পরিকল্পনার জ্ঞানের যে পরিচয় পেলেন, তাতে বিশ্বকর্মার মত শিল্পীও বিস্মিত হয়েছিলেন এবং নিজের অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যাতে এই নগর-নির্মাণ-কার্যে প্রতিফলিত হয়, তার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

গুপ্তচর মুখে মথুরার অবস্থা জেনে বলরামের ওপর দ্বারাবতীর নির্মাণ-কার্য দেখা-শোনার ভার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রওনা হলেন।

অষ্টম/নবম পরিচ্ছেদ

মথুরা-প্রত্যাবর্তন/বিদর্ভ-সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় এসে দেখলেন—মথুরা অবরোধ-মুক্ত। নিজের প্রজ্ঞায় বুঝে নিলেন—জরাসন্ধের এ এক নূতন রাজনৈতিক কৌশল। রাজভবনে না উঠে পিতৃভবনে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রায় তিন

বৎসর অতীত। পিতা বসুদেবের নিকট গত তিন বৎসরের এক প্রতিবেদন জেনে নিলেন।

গুপ্তচর-মুখে বিদর্ভ-রাজকন্যার স্বয়ম্বর ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গের সেখানে সমাবেশের কথা জানলেন। আরও জানলেন—এই স্বয়ম্বর সভায় মথুরা নিমন্ত্রিত হয় নি। মথুরার এই অপমান শ্রীকৃষ্ণ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি উগ্রসেনের অনুমতি নিয়ে পরদিন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিদর্ভে উপস্থিত হলেন। সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, কয়েক জন গুপ্তচর সেখানে রেখে মথুরায় ফিরে এলেন।

পরদিন গুপ্তচরদের মুখে কালযবনের মথুরা আক্রমণের কথা জেনে শ্রীকৃষ্ণ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সমস্ত যাদব-প্রধানদের মথুরা থেকে দ্বারাবতী প্রেরণ করলেন এবং সেনাপতিদের নিয়ে সৈন্য-সজ্জায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

দশম পরিচ্ছেদ

কালযবন-বধ

কালযবনের জন্ম সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী জানা যায়। 'হরিবংশে' এ সম্বন্ধে যা জানা যায়, তাও খুব সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়—

গর্গাচার্য বিবাহ করলেও ব্রহ্মচর্য পালন হেতু স্ত্রী-সহবাস করতেন না। ফলে তিনি ঊর্ধ্বরেতা হন। কিন্তু গর্গাচার্যের শ্যালকরা তাকে 'ক্লীব' বলে প্রচার করতে লাগলেন। এই সময় গোপালী নাম্নী একটি গোপ-কন্যা তাঁর পরিচর্যায় রত থাকে। শ্যালকদের প্রচারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি গোপালীর সহিত যৌনাচারে লিপ্ত হন। তাতে তাঁর এক পুত্র-সন্তান জন্মে। শিশু-পুত্রের কোষ্ঠি বিচার করে গর্গাচার্য জানতে পারলেন—এই জাতক-

দ্বারা যাদবদের প্রভূত ক্ষতি হবার সম্ভাবনা এবং সে যাদবদের অবধ্য। তখন গর্গাচার্য ঐ শিশু-পুত্রকে বন-মধ্যে ত্যাগ করেন এই ভেবে যে, শিশুটি অরক্ষিত অবস্থায় কোন শ্বাপদ কর্তৃক ভক্ষিত হবে। কিন্তু নিয়তির এমনই বিধান যে, নিঃসন্তান ম্লেচ্ছ যবনরাজ কর্তৃক শিশুটি রক্ষিত হয় এবং যবনরাজ-গৃহে পালিত হয়ে যবনরাজের পুত্রের ন্যায় মানুষ হতে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অসাধারণ বলবান্ ও যুদ্ধ-পটু হয়ে ওঠে। যবনরাজের মৃত্যুর পর যবনরাজ-সিংহাসনের অধিকারী হয়ে কাল-যবন নামে বিখ্যাত হয় এবং অপরাজেয় বীর বলে খ্যাতি লাভ করে।

সৌভপতি শাল্ব যখন তার সহিত দেখা করে মহারাজ জরাসন্ধের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, তখন কালযবন আনন্দের সহিত সে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

অশ্বারোহী গজানীক*, ও পদাতিক—বহু সৈন্যসহ কালযবন মথুরার দিকে যাত্রা করল। সৈন্যদের মধ্যে শক, হূন, তুখার, দরদ, খশ, পহ্লব প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ যোগ দিয়েছিল। সপ্তাহ-কাল মধ্যে এই বিরাট বাহিনী নিয়ে কালযবন মথুরার দিকে অগ্রসর হোল। মূল গ্রন্থে পূর্ণ বিবরণ জানা যাবে।

কালযবনকে গুহাবন্দী করে রেখে শ্রীকৃষ্ণ কালযবনের সৈন্য-গণকে নিরস্ত্র করে মুক্তি দিলেন; তাদের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর আচরণ না করে বা বন্দীত্বের শৃঙ্খলে না বেঁধে শান্তিপূর্ণ-ভাবে তাদের নিজ রাজ্যে যাওয়ার সুযোগ দিলেন। তিনিও মথুরার সীমানা অতিক্রম করে সন্তর্পণে দ্বারাবতীর পথে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। মগধ-সৈন্য জানতেও পারল না তাঁর মথুরা ত্যাগের কথা।

এখানে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধ-নীতির ধারা বজায় রেখে অহেতুক লোক-ক্ষয় থেকে বিরত ছিলেন। যাঁরা পৃথিবীতে আদর্শ মানুষরূপে মানুষের কল্যাণের জন্য সারা জীবন কাজ করেন, তাঁরা

---

* গজারোহী সৈন্য।

কখনও নীতি-ভ্রষ্ট হন না। নানারূপ প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা তাঁদের নীতি বজায় রেখে চলেন। কৃষ্ণের এই পলায়নকে যারা ভীরুতা বলে ভাবেন, তারা কৃষ্ণ-চরিত্র সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই বিভিন্ন গ্রন্থে বিরূপ সমালোচনা দেখা যায়। হঠকারিতাদ্বারা মৃত্যু বরণ করায় কোন পৌরুষ নেই। আদর্শ রূপায়ণের জন্য নিজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্যন্ত আদর্শ-মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও সেই অনুপ্রেরণার বিকাশ সব সময় প্রতিফলিত হয়েছে।

মথুরা থেকে কৃষ্ণ-বলরামের পলায়নের মধ্যে ভীরুতার কথা উঠতেই পারে না। তেইশ অক্ষৌহিণী* সৈন্যের অধিনায়ক জরাসন্ধ মাত্র কয়েক হাজার যাদব-সৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের পর্যুদস্ত করতে পারেন নি। এখানে বোঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের মনোবল, সৈনাপত্য অতি উচ্চ স্তরের। ভীরুতার জন্য কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করেছেন যারা ভাবে, তারা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারে নি। প্রথম থেকেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধ-রীতিতে অযথা লোকক্ষয়ের সম্ভাবনাকে সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন।

এখানে অতীতের দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।—শস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার পর কৃষ্ণ প্রথম যুদ্ধ করেন পঞ্চজন নামক অনার্য-দস্যুর সহিত। সেখানে অন্য কোন লোক নাশ না করে শুধু পঞ্চজন দস্যুকে বধ করেছেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ কংসের সঙ্গে। সেখানেও অন্য কোন লোকের বিনাশ সাধন না করে শুধু কংসকেই বিনাশ করেছেন। তৃতীয় যুদ্ধ—গোমন্তক যুদ্ধ; সেখানে তিনি নিজ হাতে বিশেষ কিছু করেন নি, দৈব সহায় ছিল বলে প্রবল বৃষ্টির ফলে তাঁর জয় হয়েছে। চতুর্থ যুদ্ধ শৃগাল-বাসুদেবের সঙ্গে; সেখানে অন্য কোন লোক বিনষ্ট হয় নি; শুধু শৃগাল-

---

* অক্ষৌহিণী=১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, মোট ২১৮৭০০ চতুরঙ্গ সেনাবিশিষ্ট বাহিনী।

বাসুদেবকেই শ্রীকৃষ্ণ বধ করেছেন। তারপর কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধে শুধু কালযবনকেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে—নিজ নীতিতে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা অবিচল থেকেছেন। জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে তার নীতি বজায় রাখা সম্ভব ছিল না বলেই অযথা লোকক্ষয় এড়িয়ে যেতে জরাসন্ধের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধকে তাঁর বর্জন করতে হয়েছে। তাতে হয়তো কারো কারো কাছে এ কাজ ভীরুতা বলে মনে হতে পারে; কিন্তু নিজ নীতি রক্ষায় তাঁর আন্তরিক চেষ্টার কথাও সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয়। জরাসন্ধের সঙ্গে ইতিপূর্বে যত বার যুদ্ধ হয়েছে, তাতে শ্রীকৃষ্ণই যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন; কিন্তু তাঁর নীতি সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। সেই জন্য আর লোকক্ষয় না বাড়িয়ে নিজেকে জরাসন্ধের নাগালের বাইরে রাখতে মনস্থ করেই সুদূর দ্বারাবতী-উপনিবেশে নূতন করে এক আদর্শ নব-রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাতে তিনি কৃতকার্যও হয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রে ভীরুতার স্থান নেই। আদর্শ মানুষের চরিত্রই এইরূপ। বহু লোকের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজে যদি অন্যের চোখে হেয় হয়ে যান, তাতেও তিনি অপমান বোধ করেন না।*

---

* শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক আরোপ করা—আমাদের অগভীর চিন্তারই ফল। নিজ নীতি ও আদর্শ রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনেক বার অপমান সহ্য করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বারাবতীর উন্নয়ন/সৈন্য-সংগঠন/বলরামের বিবাহ

কালযবনের বিনাশ-সাধনের পর শ্রীকৃষ্ণ চিরদিনের মত মথুরা ত্যাগ করলেন। জরাসন্ধের বার বার আক্রমণে মথুরার সৈন্য-বল যথেষ্ট কমে গিয়েছিল; আসার সময় অবশিষ্ট সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং গুপ্ত সংস্থার কর্মীদের উপদেশ দিয়ে এলেন,—তারা যেন বৃন্দাবনের যুবকদের দ্বারাবতীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। নূতন উপনিবেশ দ্বারাবতীকে সুরক্ষিত করার জন্য সৈন্যবল বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিলেন। একদিকে নগর উন্নয়ন, অন্যদিকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার কাজে কৃষ্ণ-বলরাম ব্যস্ত রইলেন। উত্তর ভারতে আর্য-বসতি যত বৃদ্ধি হচ্ছিল, ততই সেখানকার অনার্যগণ পশ্চিম সাগর-পাড়ের অরণ্যাঞ্চলে নিজেদের স্থান করে নিতে লাগল। সেই অঞ্চলে তখনও আর্য বসতি হয় নি। সেই সময় উত্তর ভারতের অনার্যদের মধ্যে নাগ-বংশের বেশ প্রাধান্য ছিল; তাদের এক অংশ এই অঞ্চলে বসবাস করতে লাগল। সিন্ধু দেশের নিম্ন অরণ্যাঞ্চলকে পাতাল বলা হোত।* সেখানে নাগরাজ বাসুকি সপরিবারে বাস করতেন। অনার্য হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের মিত্র বলেই গণ্য ছিলেন। বাসুকি বীর, যোদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য সংগঠন কার্যে বাসুকির সহিত পরামর্শ করতেন। মথুরা-বিজয়ে বাসুকির অবদান ভোলেন নি শ্রীকৃষ্ণ। এই সময় বাসুকি-ভগিনী জরৎ-কারুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় হয়। জরৎ-কারু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্টা হন।

---

* নবীনসেনের গ্রন্থাবলী (রৈবতক কাব্য) পৃষ্ঠা ৪৭।

জল-পথে দ্বারাবতী আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলেও স্থল-পথে সে আশঙ্কা আছে। তাই রৈবতক পাহাড়ে দুর্গ নির্মাণ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করলেন। তাছাড়া সেখানে অতিথিশালা, মন্দির, প্রমোদ-উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ করালেন।

দ্বারাবতীকে সমৃদ্ধিশালী করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অন্য দেশের সঙ্গে, বিশেষতঃ লোহিত সাগর ও পারশ্য উপসাগরীয় অঞ্চলগুলির সহিত, বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য মনোযোগ দিলেন এবং নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানা রূপ পরিকল্পনা নিলেন।

এই সময় অনার্য-কন্যা রেবতীর সাহিত বলরামের বিবাহ হয়। রৈবতক পাহাড়ের গা বেয়ে রেবতী নদী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত। পাদদেশের একাংশে রেবত নামে এক অনার্য জাতি বাস করত। তাদের এক পরিবারের রূপবতী কন্যা রেবতী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ/রুক্মিনী/জাম্ববতী/সত্যভামা ইত্যাদি

গোমস্তক যুদ্ধে জরাসন্ধ-গোষ্ঠীর অভাবনীয় পরাজয়ে জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ-নীতিতে বিস্মিত। শ্রীকৃষ্ণকে নূতন করে কি ভাবে জালে ফেলা যায়, তিনি তারই চিন্তা করতে লাগলেন। বিদর্ভ-রাজকুমার রুক্মী জরাসন্ধের প্রিয়পাত্র। চেদির রাজপুত্র শিশুপাল জরাসন্ধের দক্ষিণ হস্ত। সেই কারণেই বিদর্ভ-রাজকন্যা রুক্মিণীর বিবাহ যাতে শিশুপালের সঙ্গেই ঘটানো যায়, তার জন্য জরাসন্ধ সচেষ্ট ছিলেন। তাই তিনি রুক্মীর পিতা বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মককে অনুরোধ করেন। সুতরাং দ্বিতীয়বার রুক্মিণীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করা হলেও শিশুপালকে বিবাহ করার জন্যই রুক্মী ভগিনী রুক্মিণীকে বাধ্য করতে চেষ্টা করে।

রুক্মিণী কোনমতেই শিশুপালকে বিবাহ করতে রাজী নন। কিন্তু পিতা ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অপরদিকে তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছেন। তাই গোপনে তাঁর বিশ্বাসী রাজ-পুরোহিত সুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে জ্ঞাত করান। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করে এনে বিবাহ করার পরিকল্পনা নিলেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, পুরাণকারগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-ব্যাপারগুলি এমন ভাবে প্রচার করেছেন, যার ফলে তাঁকে নারী-আসক্ত বলেই মনে হবে। এটা যে কত বড় মিথ্যা, সেটা জানা যায় তাঁর সমগ্র জীবনের কার্য-কলাপকে বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করলে। যদিও তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন, কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই দেখা যাবে রাজনৈতিক বা অন্য কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণে তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে নারী-ভোগের লালসা বা সেরূপ কোন দুর্বলতা ছিল না। কিন্তু কোন কোন অবিবেচক পুরাণকার বা ছদ্মবেশী কৃষ্ণদ্বেষী ব্যক্তিদের দ্বারাই তিনি নারী-আসক্ত রূপে প্রচারিত হয়েছেন। যিনি ছিলেন ষড়ৈশ্বর্য গুণের অধিকারী*, যিনি ছিলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যিনি ছিলেন সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্, তিনি হলেন ভোগ লালসায় রমণী-আসক্ত —একথা কোন বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারেন না। শুধু অজ্ঞানতার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে কলঙ্কিত করা হয়েছে, তাঁকে পরদারিক করা হয়েছে বৃন্দাবন লীলায়** ; আবার

* সৌন্দর্য, বীর্যবত্তা, জ্ঞান, নিস্পৃহতা, যশঃ এবং ঐশ্বর্য—এই ছ'টি হচ্ছে ষড়ৈশ্বর্য গুণ। ঐশ্বর্য আবার অষ্ট-বিধ ; যথা—অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা। (শ্রীকৃষ্ণ—১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪ দ্রষ্টব্য।

** যখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল পাঁচ থেকে দশ বৎসর। শ্রীকৃষ্ণ—১ম খণ্ড ভূমিকাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় বর্ণিত।

দ্বারকালীলায় ষোল হাজার নারীকে বিবাহ করে নিজ অন্তঃপুরে রাখার কাহিনীও লিখিত আছে। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এসব বিশ্বাস করতে পারে? ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে শ্রীরাধা—যিনি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে বারো বৎসরের বড়, কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী রূপে বর্ণিত হয়েছেন, আর সেই বিশ্বাসেই রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি* ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছে। অথচ সকলেই জানে,—শ্রীরাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী—শ্রীকৃষ্ণের মাতুলানী, পরস্ত্রী। (পরস্ত্রীর সহিত বিহার করা সামাজিক অপরাধ।) যিনি জগতে আদর্শ মানব, পুরুষোত্তম, তাঁর চরিত্রে এই কলঙ্কারোপ অমার্জনীয় অপরাধ।

পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের আটজন স্ত্রীর নাম পাওয়া যায়; যথা—(১) রুক্মিণী (২) জাম্ববতী (৩) সত্যভামা (৪) কালিন্দী (৫) মিত্র-বিন্দা (৬) সত্যা (৭) ভদ্রা ও (৮) লক্ষ্মণা।

তথ্য-ভিত্তিক যে বিবাহের কথা জানতে পেরেছি, সেইগুলির শুধু উল্লেখ করেছি। কারণ বাস্তব-ভিত্তিক শ্রীকৃষ্ণ-জীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম তিনটি বিবাহের ঘটনার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, প্রথমটি মানবতার আদর্শ রক্ষার্থে এবং রাজনৈতিক কারণেই ঘটেছিল; দ্বিতীয়টি নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক স্বরূপ 'চোর' অপবাদ নস্যাৎ করার জন্য এবং রক্ত-বৈষম্যের বিভেদ দূর করার জন্যও। তৃতীয়টি সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক কারণে। এর পরবর্তী পাঁচটি বিবাহের কথাও পুরাণানুসারে উল্লেখ করেছি। তবে এর মধ্যে কালিন্দীর বিবাহ ছাড়া আর চারটিই রাজনৈতিক কারণে ঘটেছিল।

---

* রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্তির একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ, ১ম খণ্ডে দেওয়া আছে। পৃঃ ৬৬। এ রাধা বৃষভানু নন্দিনী বা আয়ান ঘোষের স্ত্রী নন; যুগলের 'রাধা' ভক্তের প্রতীক; আবার জীবাত্মারও প্রতীক।

জাম্ববতীর বিবাহ নিয়ে অনেকেই নানা রূপ বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তারা জানেন না—সাড়ে তিন হাজার বৎসর আগের ভারতীয় সমাজ (অনার্য গোষ্ঠীর ও আর্য গোষ্ঠীর উভয়েরই) কিরূপ ছিল। অনার্য-সূর্য রাহুগ্রস্ত হতে থাকলেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনার্যদের প্রতিপত্তি কিছু কিছু ছিল। অনার্য সর্দার জাম্ববান্ (ভল্লুক নয়) ঋক্ষবান্ পর্বতাঞ্চলের* প্রতিপত্তিশালী অধিপতি ছিল। এর ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত।

নরকাসুরের ষোলহাজার উপপত্নীকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ :

নরকাসুরের পরিচয়ে বলা হয়েছে—তিনি ভূমি-পুত্র অর্থাৎ বসুমতীর পুত্র। যখন ঈশ্বর বরাহ-অবতারে দন্তের ওপর রেখে বসুমতীকে রক্ষা করেছিলেন, সেই সময় বরাহের স্পর্শে তার গর্ভ সঞ্চার হয়। তাতেই নরকাসুরের জন্ম।

এই নরকাসুর অসীম শক্তিশালী অজেয় বীর। একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের অবধ্য। দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল, বরুণের ছত্র এবং ইন্দ্রের মণি যখন নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল, তখন ইন্দ্র দেবতাদের মান রক্ষার্থে ঐ সকল দেববিত্ত উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল দেববিত্ত উদ্ধারের জন্য নরকাসুরের রাজ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর** গিয়েছিলেন এবং সুদর্শন

---

* বর্তমানের পোরবন্দর থেকে দশ কিলোমিটার পূর্বে বড়ড়া পর্বত ; এইটিই মনে হয় প্রাচীন ঋক্ষবান্ পর্বত। এর নিকটেই 'জাম্ববতী গুহা' (গুজরাটী ভাষায়—জাম্ববন্তী গুম্ফা) ; In English—Jambabanti Cave. (লেখকের স্বচক্ষে দেখা), এখনও বর্তমান।

** এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আসামের গৌহাটি বা কামরূপ নয়। হিমালয়ের উত্তরে কৈলাশের নিকট ভৌম্যাসুরের প্রাগ্‌জোতিষপুর, দেখা যায়। গর্গ সং বিশ্বজিৎ খণ্ড ২৫/৫৬/৫৭।

চক্রে তাকে নিহত করে তৎপুত্র ভগদত্তকে পিতৃ-সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তৎপর নরকাসুরের সুরক্ষিত পার্বত্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখলেন, সেখানে ষোড়শ সহস্র বন্দীনী-নারী। এরা নরকাসুরের বিজিত রাজ্যগুলি থেকে বলপূর্বক সংগৃহীত। সেই সকল বন্দীনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাদের দুঃখের কথা জানাল। তারা সবাই নরকাসুর কর্তৃক ধর্ষিতা ; ফলে অনেকেই গর্ভবতী। তাদের এখন কি গতি হবে ?

শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল অসহায়াদের কথা শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তাদের তিনি নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সকলকে দ্বারকার অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদা দিলেন এবং গর্ভবতীদের সন্তানেরা শ্রীকৃষ্ণের বংশধর রূপে পরিচিতি পাবে বলে তাদের আশ্বাস দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার দেহ ধারণ করে একই দিনে নরকের ষোল হাজার উপপত্নীকে* শাস্ত্র মতে বিবাহ করেছিলেন। নরকাসুরের সংগৃহীত বিপুল ধনরাশি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতীতে এনেছিলেন।

এখন কথা হচ্ছে—নরকাসুরের জন্ম, ষোড়শ সহস্র নারীকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা অপ্রাকৃত ঘটনা ;—এগুলি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাজেই তথ্যভিত্তিক শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীতে এসব স্থান পেতে পারে না। এই উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য, মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের উদার নীতি ও অসহায় ব্যক্তিকে রক্ষা করার নীতির প্রতিফলন। শুধু তাই নয়, পররাজ্য গ্রাস না করার নীতিও এতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই এই নীতি তিনি অনুসরণ করেছেন।

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। নরকাসুরের প্রসঙ্গ বাদ দিলে এই উপন্যাসের প্রসঙ্গ থেকে উদ্ভূত পারিজাত

---

* সেই যুগের বিজয়ী রাজগণ যুদ্ধে পরাজিত শত্রুদের কুলনারীগণকে হরণ করে উপপত্নী করতেন।

হরণের ব্যাপারও বাদ দিতে হয়। এ সবই মুখরোচক গল্প। কাজেই বাস্তব-ভিত্তিক শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীতে এর স্থান নেই।

আরও একটি কথা—নরকাসুরের জনক যদি বরাহরূপী বিষ্ণু হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে ভগবানের বরাহ অবতার কোন্ যুগে হয়েছিল? বরাহ অবতার হচ্ছেন তৃতীয় অবতার। আর নরকাসুরকে দেখা যাচ্ছে বলরামের সময় অর্থাৎ ভগবানের অষ্টম অবতারের সময়।* এটা কি করে সম্ভব হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জতুগৃহ-দাহে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যু সংবাদে কৃষ্ণ বিষণ্ণ

বেশ কিছুকাল অন্ততঃ ছ'সাত বৎসর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সংবাদ জানেন না। হঠাৎ এই সময় 'বারণাবতে জতুগৃহ-দাহে কুন্তীসহ পঞ্চ পাণ্ডব পুড়ে মরেছে'—সংবাদ পেলেন; এই সংবাদে তিনি খুব বিষণ্ণ হলেন এবং লোক-জন নিয়ে সেখানে চলে গেলেন। তারপর বিদুরের সঙ্গে গুপ্তচরের সাহায্যে যোগাযোগ করে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

এখানে কুরু-বংশের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার ঃ—

হস্তিনাপুর ছিল কুরুরাজগণের রাজধানী। গঙ্গার** গর্ভজাত

---

* দশাবতার—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম (৩) বরাহ (৪) নৃসিংহ (৫) বামন (৬) পরশুরাম (৭) রাম (৮) বলরাম (৯) বুদ্ধ (১০) কল্কি।

** গঙ্গার কোন পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। এক অদ্ভুত আজগুবি কাহিনী দিয়ে যে পরিচয় দেওয়া হয়, তা অবাস্তব। অর্থাৎ এই গঙ্গা পবিত্র সলিলা গঙ্গানদীকে বোঝান হয়। এটা সত্যিই হাস্যকর। একস্থানে দেখা যায় গঙ্গাকে দেবকন্যা বলা হয়েছে; কিন্তু কে বা জননী, কে বা জনক তার—তা কিছু জানা যায় না। প্রথম সাতটি সন্তানকে সে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মেরেছে। কার্য-কলাপ দেখে তাকে অপ্সরা বলে মনে হয়, কেননা তারা মর্ত্যে এসে মর্ত্য-মানবের সঙ্গে কামাচারে দ্বিধা করে না, বরং আগ্রহ প্রকাশ করে; যত দ্বিধা সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে।

পুত্র দেবব্রত কুরুরাজ শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র হয়েও সিংহাসনে আরোহণ করেন নি ; গঙ্গা শান্তনুকে ত্যাগ করার পর শান্তনু অনার্য ধীবর-কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করতে চাইলে ধীবররাজ রাজি হয় না ; কারণ হিসেবে জানায়—শান্তনুর সিংহাসনের অধিকারী তাঁর পূর্বপত্নীর পুত্র দেবব্রত ; তার কন্যা সত্যবতীর সন্তানেরা সে সিংহাসনের অধিকারী হতে পারবে না। শান্তনু কাজেই মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে এলেন। এইকথা জেনে দেবব্রত পিতাকে সুখী করার জন্যে ধীবর-রাজের কাছে শপথ করেন—তিনি নিজে তো সিংহাসনে বসবেনই না,—এমন কি তাঁর বংশধর কেউ যাতে সিংহাসনের দাবী করতে না পারে, তার জন্য তিনি জীবনে বিবাহও করবেন না। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্যই তিনি ভীষ্ম নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তখন সত্যবতীকে বিবাহ করতে মহারাজ শান্তনুর কোন বাধা রইল না। সেই সত্যবতীর সন্তান চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সেই মারা যান। তারপর শান্তনুর পর কুরু-সিংহাসনে আরোহণ করেন বিচিত্রবীর্য। অল্প বয়সে রাজা হয়ে বিচিত্রবীর্য সুরা আর নারী নিয়ে মত্ত থাকেন।

বিচিত্রবীর্যের নারী আসক্তি দেখে ভীষ্ম ভাবলেন—বিচিত্র-বীর্যকে এখন বিবাহ করানো দরকার। এই সময় কাশীরাজের তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ম্বর ঘোষিত হয়। তাই তিনি কাশীরাজ-কন্যাদের সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। সয়ম্বরা কন্যারা যদি তাঁকে বরমাল্য না দেয়, তবে কন্যা হরণ করে আনতে হবে। কিন্তু বিচিত্রবীর্য ততটা যুদ্ধ-পটু নন। কাজেই তিনি নিজেই ঐ কন্যাদের হরণ করে নিয়ে এসে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দেবেন। সেকালে বীর্যবান্ ক্ষত্রিয়গণ কন্যা হরণ করে বিবাহ করাকে গৌরবের কাজ ভাবতেন এবং এ প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। সেই সময় ভার্গব-শিষ্য

ভীষ্ম ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত বীর যোদ্ধা। তিনি স্বয়ম্বর সভাথেকে কাশীরাজের তিন কন্যাকেই হরণ করে নিয়ে আসেন। অম্বা জানতেন না—ভীষ্ম বিবাহ না করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অথচ ভীষ্মই তাঁদের হরণ করে এনেছেন। অম্বা খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি ছিলেন মদ্রাধিপতির বাগদত্তা। তিনি কিছুতেই হীনবীর্য বিচিত্রবীর্যকে বিবাহ করতে রাজি হলেন না। কিন্তু অন্যের দ্বারা অপহৃতা অম্বাকে বিবাহ করতে মদ্রাধিপতিও রাজি হলেন না। তখন অম্বা নদীগর্ভে আত্ম-বিসর্জনে মনস্থির করে ভীষ্মকে অভিশাপ দিলেন, "নিরপরাধ নিষ্পাপ একজন নারীর মৃত্যুর কারণ হলেন আপনি; আমি অভিশাপ দিচ্ছি—এইরূপ একজন নারীর হাতেই আপনার মৃত্যু হবে।"

তারপর অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহ হোল বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে। যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত বিচিত্রবীর্য কোন স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান উৎপাদন করতে পারলেন না; তারপর নিঃসন্তান অবস্থায় একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। রাজমাতা সত্যবতী চিন্তিত হয়ে পড়লেন—কুরুবংশের বংশ রক্ষার উপায় কি? তখন ক্ষেত্রজ পুত্র সমাজে গৃহীত হোত; তাই তিনি দুই বিধবা পুত্র-বধূর গর্ভে পুত্র উৎপাদনের জন্য তাঁর কানীন-পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে হস্তিনাপুরে আগমনের জন্য আহ্বান করলেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মাতৃ-আদেশে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করলেন। অম্বিকার গর্ভের সন্তান অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, আর অম্বালিকার গর্ভের পাণ্ডু-রোগ-গ্রস্ত পাণ্ডু। দু'টি সন্তানই স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ না করায় সত্যবতী তৃতীয় সন্তানের জন্য দ্বৈপায়নকে আদেশ দিলেন এবং অম্বালিকার গৃহেই তাকে প্রেরণ করলেন। অম্বালিকা সহবাসে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি তাঁর এক শূদ্রা দাসীকে নিজ শয়ন কক্ষে প্রেরণ করেন। দ্বৈপায়ন

কামাবেগ সম্বরণ করতে না পেরে দাসীর সহিতই সহবাস করেন। সেই দাসী-গর্ভে বিদুরের জন্ম হয়।

বিদুর দাসী-পুত্র ; তাই সিংহাসনের দাবীদার হতে পারেন না, যদিও তিনি স্বাস্থ্যবান্ সুপুরুষ। তিনি বিদ্যা-শিক্ষায় মন দিলেন এবং সমস্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভিক্ষান্ন নির্ভর করে ধার্মিকের জীবন যাপন করতে লাগলেন।

ভীষ্ম অভিভাবক হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। পাণ্ডু অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধতা-নিবন্ধন সে কার্যে অক্ষম।

পাণ্ডুর বীর্যবত্তায় কুরু-রাজ্য ক্রমশঃ অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল, রাজ্যের সীমাও বর্ধিত হতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ায় জ্যেষ্ঠ হয়েও সিংহাসনের অধিকারী হতে পারলেন না। সত্যবতী ও ভীষ্মের ইচ্ছায় কনিষ্ঠ পাণ্ডু কুরু-সিংহাসনে বসলেন। সিংহাসনে বসেই পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বের হলেন। বহু রাজ্য কুরু-রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করল। এই সময় কুন্তীর (পৃথার) স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে কুন্তীর বরমাল্য লাভ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র নানাভাবেই নিজেকে ভাগ্যহীন মনে করে বিষণ্ণ মনে দিন কাটাতে থাকেন। ভীষ্মের দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে যায় নি। জ্যেষ্ঠ হয়েও সিংহাসনের অধিকারী হতে পারেন নি। বিবাহ-ব্যাপারেও তিনি অযোগ্য তাঁর অন্ধত্বের জন্য। ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁর বিবাহের চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই সময় গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর রূপ-গুণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভীষ্ম গান্ধাররাজ সুবলের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহের প্রস্তাব করেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বের জন্য সে প্রস্তাব সুবল প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে ভীষ্ম খুবই অপমানিত বোধ করেন এবং এটা শুধু তাঁর নিজের অপমান নয়, কুরু বংশের অপমান। তাই তিনি গান্ধার-রাজ সুবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সাতপুত্র সহ সুবল কৌরবের কারাগারে বন্দী হন। তবুও সুবল এ বিবাহে রাজি হন না। দীর্ঘকাল কারা-যন্ত্রণা ভোগ করে সুবল ও তাঁর ছয় পুত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হন। কনিষ্ঠ পুত্র শকুনি শেষ পর্যন্ত এ বিবাহে রাজি হন। তাই তিনি মুক্তি পান এবং ধৃতরাষ্ট্রের হাতে ভগিনী গান্ধারীকে সম্প্রদান করেন। শকুনি কুরু-রাজ গৃহেই থেকে যান। গান্ধাররাজ সুবল তাঁর ছয়পুত্রসহ কুরু-কারাগারে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তবু সর্বগুণ সম্পন্না একমাত্র কন্যা গান্ধারীকে অন্ধের সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হন নি। কর্তব্য-নিষ্ঠ পিতার কর্তব্য তিনি করেছেন। আর সেই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পিতার পুত্র শকুনি পিতৃহন্তা ও ভ্রাতৃহন্তাদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করে জীবন কাটাবেন, এবং পিতার প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগিনীকে অন্ধের হাতে সমর্পণ করবেন—এটা কি সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করা যায়? পিতা অন্ধের হাতে গান্ধারীকে সমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু বরণ শ্রেয় মনে করেছিলেন। পিতা ও ভ্রাতাদের তিল তিল ক'রে মৃত্যুবরণ স্বচক্ষে দেখেও কি শকুনি এ কাজ করতে পারেন?—তাহ'লে বুঝতে হবে শকুনির এই আত্মসমর্পণের মধ্যে এক ভয়ানক প্রতিহিংসা লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করছিল। তাই তাঁর একটা উক্তিতে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। বারাণাবতে কুন্তী-সহ পঞ্চ পাণ্ডব পুড়ে মরেছে—এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন শকুনি সে কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাই তিনি নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন,—'পান্ডবেরা মরেছে—এ কথা সকলে বিশ্বাস করুক, কিন্তু তুমি শকুনি বিশ্বাস কোরো না।' —এখানে পাঠক বুঝতে পারছেন, শুধু প্রতিহিংসা চরিতার্থ

করার জন্যই শকুনি কৌরবের পরমাত্মীয়ের ছদ্মবেশে হস্তিনায় ছিলেন। এখন কথা হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীতে শকুনির সম্বন্ধে এত কথা বলার কি দরকার?—তার উত্তরে পাঠককে জানিয়ে রাখতে চাই,—এর পরের পর্ব 'কুরুক্ষেত্র', সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট ভূমিকা; আবার শকুনিরও ভূমিকা সেখানে যথেষ্ট গুরুত্ব-পূর্ণ। কিন্তু পাঠক সেখানে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন,—কৌরব পক্ষের সকলের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সজাগ, কিন্তু শকুনি সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। এই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। গান্ধারীও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে কুরু-অন্তঃপুরে দিন কাটাতে লাগলেন।

কুরুরাজ পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ আগেই হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কোন সন্তান না হওয়ায় পাণ্ডু মদ্ররাজ কন্যা মাদ্রীকে বিবাহ করেন। মাদ্রীরও কোন সন্তান না হওয়ায়* পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে হিমালয়ের শতশৃঙ্গ পর্বতের তপোবনে বাস করতে লাগলেন। সেখানে পাণ্ডুর ইচ্ছাক্রমে কুন্তীর তিনটি ও মাদ্রীর দু'টি ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম হয়।

পাণ্ডু বাণপ্রস্থে যাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র কুরুরাজরূপে সিংহাসনে বসলেন এবং ভীষ্ম ও বিদুরেব সহায়তায় শাসনকার্য চালাতে লাগলেন। শতশৃঙ্গে যখন ভীমের জন্ম হয়, তখন হস্তিনায় গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধনেরও জন্ম হয়। এরপর ধৃতরাষ্ট্রের দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি বহু সন্তান গান্ধারীর গর্ভে জন্মে। এদের মধ্যে একটি কন্যাও ছিল, তার নাম দুঃশলা। (পরবর্তী কালে জয়দ্রথের সঙ্গে তার বিবাহ হয়।)

শতশৃঙ্গে পাণ্ডু ও মাদ্রী যখন মারা যান, তখন যুধিষ্ঠিরের বয়স ১৬, ভীমের ১৫ অর্জুনের ১৪ ও নকুল সহদেবের ১৩ বৎসর কয়েক মাস। এরা পাণ্ডব নামে খ্যাত।

সেই সময় শতশৃঙ্গ পর্বতের তপোবন-বাসী ঋষিগণ কুন্তীসহ

---

* ৩৩ পৃষ্ঠায় পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে।

পঞ্চপাণ্ডবকে হস্তিনায় নিয়ে এসে কুরু-পরিবারে তাদের অধিকার নির্দিষ্ট করে দিলেন। ধার্তরাষ্ট্রগণ ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মের অভিভাবকত্বে একসঙ্গেই অস্ত্র-শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। এঁদের অস্ত্রগুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর / ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবগণকে অর্ধ কুরুরাজ্য দান

॥ ১ ॥

রাজা দ্রুপদের অন্য নাম যজ্ঞসেন ; তাই তাঁর কন্যার নাম দ্রৌপদী বা যাজ্ঞসেনী। আবার পাঞ্চাল-রাজকন্যা বলে আর এক নাম পাঞ্চালী। কিন্তু যাজ্ঞসেনী নামের উৎপত্তি—কেউ কেউ বলেন, দ্রৌপদী যজ্ঞাগ্নি-সম্ভবা, - তাই। এই 'মত' অবৈজ্ঞানিক ; কারণ এ কথা সকলেই জানেন - নর-নারীর মিলন ব্যতিরেকে সন্তানের জন্ম হয় না। দ্রৌপদীর গৌরব বৃদ্ধির জন্যই কি এরূপ প্রচার করা হয়েছে ? সন্তানের পিতৃ-পরিচয় না থাকলে সেটা যে সন্তানের পক্ষে অগৌরবের, তারা কি এটা বুঝতে পারেন না ? বোধ হয়, দ্রৌপদীর অসাধারণ রূপ-লাবণ্যের জন্যই ঐ-রূপ প্রচার করা হতে পারে। সত্যই দ্রৌপদী অনন্যা। তাই—

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দূর দূর দেশ থেকেও রাজা ও রাজপুত্রেরা দ্রুপদ নগরে এসে উপস্থিত। কিন্তু স্বয়ম্বরের শর্ত জেনে অনেকেই ভগ্নোৎসাহ হয়েছেন। রাজা যজ্ঞসেন যে মনে মনে একটা বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েই এই শর্ত আরোপ করেছেন, একথা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া বোধহয় আর কেউই বুঝতে পারেন নি। ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদদের মধ্যে এই লক্ষ্যভেদে প্রতিযোগী হওয়ার মত ক্ষত্রিয় বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের

নামই উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই একাধিক বিবাহ করেছেন, তাঁর প্রতিযোগী হওয়ার সম্ভাবনা কম ; কাজেই অর্জুন যদি জীবিত থাকেন, তবে সেই হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তি। অর্জুনকে কন্যা-সমর্পণের ইচ্ছা দ্রুপদ মনে মনে পোষণ করছিলেন অনেকদিন থেকেই। কারণ দ্রোণাচার্য অর্জুনের সাহায্যেই দ্রুপদকে এক সময় পরাজিত ক'রে যারপর নাই অপমানিত করেছিলেন। সেই অর্জুনকে জামাতা করতে পারলে একদিন তিনিও সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

স্বয়ম্বর সভায় যারা লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হতেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীকে তাঁদের পরিচয় জানিয়ে দিতেন। দুর্যোধন, দুঃশাসন, শল্য প্রভৃতি কয়েকজন অকৃতকার্য হওয়ার পর কর্ণ যখন শরাসন ধরেছেন, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর পরিচয় দিলেন। সেই মুহূর্তে দ্রৌপদী বলে বসলেন, তিনি সূতপুত্রকে বরণ করবেন না। কর্ণ অপমানিত হয়ে ফিরে এসে স্বস্থানে বসলেন। আর কোন ক্ষত্রিয় সাহস করে অগ্রসর না হওয়ায় ব্রাহ্মণদের আহ্বান করা হোল ; তখন ব্রাহ্মণ-বেশী অর্জুন অগ্রসর হলেন। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পরে সেখানে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় সেই অশান্ত পরিবেশ শান্ত অবস্থায় ফিরে এল।

এরপর কৃষ্ণ-বলরাম কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আত্মীয়ের কর্তব্য সম্পাদন করলেন। কিন্তু একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে দ্রৌপদীর বিবাহ নিয়ে। দ্রৌপদী অর্জুনের বীর্যশুল্কে লব্ধা। অর্জুনের সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও ভীম তখনও অবিবাহিত। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীমের মনোভাব বুঝে নিজের মধ্যে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত এই একটি নারীর জন্য কি ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দেবে ? পাঞ্চাল এবং

তৎসংলগ্ন পাহাড়ী অঞ্চলে এক পরিবারের একাধিক ভ্রাতা একই নারীর স্বামিত্ব* গ্রহণ করতে পারে—এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। (এখনও ঐ অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী কিন্নর দেশে এ প্রথা প্রচলিত আছে)। তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এতদঞ্চলে এক পরিবারের ভ্রাতারা একই নারীর স্বামিত্ব গ্রহণ করতে পারে। তখন কুন্তী দেবী বললেন নকুল সহদেব আমার সপত্নীপুত্র হলেও আমার পুত্রাধিক। তাদের কথাও আমাকে ভাবতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তাদেরও এক্ষেত্রে স্বামিত্ব গ্রহণে বাধা নেই।

শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্যে কুন্তীসহ পঞ্চভ্রাতা কিছুক্ষণ নীরবে স্থির হয়ে বসে রইলেন। দ্রৌপদীর বিস্ময়ের সীমা নেই : বোবা দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কী যে কোথা দিয়ে ঘটে গেল, তাঁদের কেউই যেন কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। সর্বগুণময়ী এমন এক ব্যক্তিত্ব খেলাঘরের পুতুল হয়ে গেলেন। একেই বুঝি বলে নিয়তির খেলা।

এখানে আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা দরকার। ইতিপূর্বে একচক্রাপুরে পাণ্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে মায়ের নির্দেশে ভীম বকাসুর নামক এক নিষ্ঠুর অনার্য সর্দারের (ঐ অঞ্চলাধিপতি) কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ নিয়ে কুন্তীদেবীর সহিত যুধিষ্ঠিরের কিছু অপ্রীতিকর বিতণ্ডা চলেছিল।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিরও অবসান ঘটে।

॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্রুপদনগর ত্যাগ করার সময় এক গুপ্তচরদ্বারা বিদুরকে পাণ্ডবদের বিবাহ-বিষয়ে সব জানানোর ব্যবস্থা করে

* এরূপ বিবাহ যদি প্রচলিত না থাকত, তবে এইরূপ অসামাজিক ও অশোভন বিবাহের জন্যই হস্তিনাপুরে পাণ্ডবেরা স্থান পেতেন না। ধৃতরাষ্ট্র শুধু এই কারণেই পাণ্ডবদের কুরু-রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন। কুরুপ্রধান নীতিবিদ্ ভীষ্মদেবও এ বিবাহ মেনে নিয়েছিলেন।

গেলেন এবং পাণ্ডবরা যাতে হস্তিনায় যেতে পারে, তারও ব্যবস্থা করতে বিদুরকে অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। বিদুর গুপ্তচরের মুখে সব সংবাদ জেনে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হতে লাগলেন। কারণ পাণ্ডবদের জীবিত থাকার সংবাদে ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রগণ যে মোটেই খুশি হবে না, এটা তিনি ভালভাবেই জানতেন। শেষ পর্যন্ত বিদুরের পরামর্শেই পাণ্ডবগণ সপরিবারে হস্তিনায় আবার স্থান পেলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কুট-কৌশলে পাণ্ডবদের বেশীদিন সেখানে থাকা হোল না। তাঁদের জন্য কুরু-রাজ্যের অনুন্নত, অনুর্বর অরণ্যাঞ্চল খাণ্ডবপ্রস্থে তাঁদের রাজ্যাংশ নির্দিষ্ট হোল। কিছুদিন পর তাঁরা কুন্তী ও দ্রৌপদী সহ খাণ্ডবপ্রস্থে চলে এলেন। সেখানে এসে যুধিষ্ঠির দ্বারাবতীতে দূত পাঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের নূতন বাসস্থানে নিয়ে এলেন এবং তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলেন—কিভাবে তাঁরা এইরূপ স্থানে বসবাস করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। ভীমার্জুন ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ অকরুণ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অসৌজন্য-মূলক বাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—'একেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করে তাঁর ওপর নির্ভর করে নূতন ভাবে নব উদ্যমে কাজ করতে থাকো, দেখবে —একদিন এই নগরই সকলের আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

শ্রীকৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা অনুসারে খাণ্ডবপ্রস্থের পূর্বাংশের অরণ্যাঞ্চলের কিয়দংশ নিয়ে নূতন নগর 'ইন্দ্রপ্রস্থ' পত্তন হোল।

শ্রীকৃষ্ণের পাঁচ জন পিতৃস্বসা; তার মধ্যে এই কুন্তী (পৃথা) তাঁদের সংসারে না থাকার জন্য তাঁর সম্বন্ধে দীর্ঘকাল (অন্ততঃ পৃথার জীবনের প্রথম চল্লিশ বৎসর) কিছু জানতেন না। তারপর শ্রীকৃষ্ণের সতের বৎসর বয়সে প্রথম কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের সহিত

প্রথম সাক্ষাৎ হয় মথুরায়। কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে সেই সাক্ষাতের পর থেকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এই ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে পাণ্ডবদের সরল, সহজ ও নির্লোভ চরিত্র (জন্ম থেকে কৈশোর অবধি তপোবনের সরল জীবন যাপনেই এইরূপ চরিত্র গঠিত হওয়ার মূল কারণ) এবং পৃথার ভাগ্য-বিড়ম্বিত দুঃখময় জীবন। সুখী, সচ্ছল আত্মীয়দের জন্য কেশবের কোন কৌতূহল নেই, কিন্তু দুস্থ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি খুব বেশী। দুস্থ অনাত্মীয়ের প্রতিও এই সহানুভূতির অভাব নেই। এই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। যতই দিন যাচ্ছে, পাণ্ডবদের প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ ততই বাড়ছে। পাণ্ডবেরা, বিশেষ করে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে যেন জড়িয়ে গিয়েছেন। তাই অর্জুন শুধু আত্মীয় নন, অকৃত্রিম বন্ধু, প্রাণ-সখা। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের যে ব্রত—একজাতি, এক ধর্ম, এক ভারত গঠনের পবিত্র কর্তব্য, তাতে অর্জুনের মত সত্যধর্মী, সংযমী, একনিষ্ঠ ও বীর্যবান্ যোদ্ধার একান্ত প্রয়োজন। তাই তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য ভারত-পরিক্রমায় পাঠাবার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর একদিন সে সুযোগও এলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্জুনের ভারত-পরিক্রমা/উলুপী/চিত্রাঙ্গদা/ রৈবতক/সুভদ্রাহরণ

দস্যু-কর্তৃক ব্রাহ্মণের গরুচুরির ব্যাপারটা বিকৃত হয়ে প্রচারিত হয়েছে! এ ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ বলেই এই গ্রন্থে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। দ্রৌপদীর সহিত আলাপ-রত যুধিষ্ঠিরের গৃহের মধ্য দিয়ে অর্জুনের অস্ত্রাগারে যাওয়াও অবাস্তব।

অস্ত্রাগারে যাওয়ার পথ যে স্বতন্ত্র হবে, এতে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। অর্জুনের ভারত-পরিক্রমা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শন কিভাবে ঘটেছিল, তা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। গীতায় যে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখানোর কথা বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে একটি কথা বলতে চাই,—গীতাকে মহাভারতের অংশরূপে দেখানো হয়েছে বটে, তবে এই সংযোজন যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অনেক পরে হয়েছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে এই অষ্টাদশ-অধ্যায় গীতাখানি সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছিল —একথা কোন বুদ্ধিমান্ পাঠক স্বীকার করবেন না। তবে অর্জুনের ক্লৈব্য নাশের জন্য কেশব তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন—এ কথা ঠিক। তবে তারজন্য কতখানি সময় তিনি নিয়েছিলেন এটা ভাবা দরকার। শ্রীকৃষ্ণ সারাজীবনে মানব-কল্যাণে যত নীতিবাক্য প্রয়োগ করেছেন, তার সমষ্টিগত প্রকাশই হচ্ছে সমগ্র গীতা। ভারতবর্ষ এমনই একটি মহান্ দেশ, যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই। ভারতের রূপই বিশ্ব-রূপ। তাই বলা হয়—যা নাই ভারতে, তা নাই ভূ-ভারতে। তাই সেই বিশ্ব-রূপ দর্শনের জন্য অর্জুন ভারত-পরিক্রমায় বের হলেন।

এরপর উলুপী এবং চিত্রাঙ্গদার সহিত অর্জুনের বিবাহ। এ ব্যাপারে পুরাণকারদের বক্তব্য খুবই অসামঞ্জস্য-পূর্ণ। পুরাণ-কারদের মতে অর্জুনের উলুপীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় গঙ্গাদ্বার নামক স্থানে। আর চিত্রাঙ্গদার সাক্ষাৎ হয় মাদ্রাজের অন্তর্গত মহেন্দ্র পর্বতস্থিত মণিপুরে (বর্তমান মণিকা-পত্তম)। মণিপুর রাজ্য আর মণিপুর নগর এক কথা নয়; চিত্রসেন ছিলেন মণিপুর রাজ্যের রাজা।

তারপরের প্রশ্ন,—যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বরক্ষক অর্জুন যখন মণিপুরে বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে মূর্ছিত ও

মৃত-প্রায় হয়ে পড়েছিলেন, উলুপী তখন সেখানে এসে বিলাপরতা চিত্রাঙ্গদাকে আশ্বাস দিয়ে বলে—তার পাতালস্থ পিতৃগৃহে মৃত-সঞ্জীবনী আছে, সেখান থেকে তা আনার জন্য বভ্রুবাহন সেখানে যাক্। এখন কথা হচ্ছে—কোথায় গঙ্গাদ্বার, কোথায় মণিপুর, আর কোথায় বা পাতাল ? পুরাণকার কি একবারও ভেবে দেখেছেন—অর্জুনের মূর্ছিত হওয়ার সংবাদ এতদূর থেকে উলুপীর জানার কি উপায়! তারপর পাতাল সম্বন্ধে পুরাণকার কোন সুনির্দিষ্ট স্থান বলেন নি। কাজেই এই সব কাহিনী ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের ন্যায় কাল্পনিক বলে মনে হয়। অথচ উলুপী এবং তার পুত্র ইরাবান, চিত্রাঙ্গদা ও তার পুত্র বভ্রুবাহন—এরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এদের কার্যকারতার স্বীকৃতি মহাভারতে আছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অনার্য নৃপতি অলম্বুষ (কৌরব পক্ষের যোদ্ধা) ইরাবানকে বধ করেন। মণিপুরে অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে অর্জুন মূর্ছিত হয়ে মৃত-প্রায় হয়েছিলেন,—এটাও গুরুত্বপূর্ণ কথা। অতএব উলুপী, ইরাবান, চিত্রাঙ্গদা, বভ্রুবাহন—এরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কাজেই এদের বাসস্থানও কোথাও ছিল। শুধু তাই নয়, উলুপীর এবং চিত্রাঙ্গদার বাসস্থানের দূরত্ব পুরাণকারের মতে যেভাবে দেখা যাচ্ছে, তা মেনে নেওয়া খুবই মুস্কিল। যাইহোক্, এক্ষেত্রে পুরাণ ছাড়া অন্য নজির আমাদের হাতে নেই। এর পর পার্থের প্রভাস-আগমন; সেখান থেকে রৈবতক। রৈবতকে থাকাকালে অনার্য-চন্দ্রচূড়নাগ-কন্যা শৈলজার সহিত পরিচয়। অনার্য-সভ্যতার কিছু পরিচয় এখানে পাওয়া যাবে।

বাসুদেবের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্জুন-কর্তৃক সুভদ্রা হরণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে বলরাম-কর্তৃক অর্জুনের এই কার্য খুবই নিন্দিত হয়; কারণ বলরামের ইচ্ছা ছিল দুর্যোধনের সহিত ভগিনী সুভদ্রার বিবাহ দিতে; কিন্তু অর্জুন অতিথি হয়ে এরূপ

বিশ্বাসঘাতকতা করায় তিনি খুব ক্রুদ্ধ হন। পরে অবশ্য তাঁদের বিবাহ স্বীকৃতিলাভ করে। তারপর বহু যৌতুকাদিসহ কৃষ্ণ-বলরাম ভদ্রার্জুনের অনুগমন ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে কৃষ্ণ দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেন।

এই সময় কালিন্দী নামক একজন তাপসীর সহিত বাসুদেবের পরিচয় হয় এবং সেই তাপসীর একনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করতে স্বীকৃতি দান করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খাণ্ডব-প্রস্থ / ময়দানব / যুধিষ্ঠিরের রাজসভা-নির্মাণ

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে থাকা-কালে ইন্দ্রপ্রস্থের উন্নতির কথা চিন্তা করছিলেন। তার মধ্যে একটি রাজসভা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। সেজন্য চাই একজন সুদক্ষ স্থপতিবিদ্। দ্বারাবতীতে তিনি যেমন বিশ্বকর্মাকে পেয়েছিলেন, এখানেও সেইরূপ একজন বড় শিল্পীর কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি শুনেছিলেন—নমুচি দৈত্যের সহোদর 'ময়' একজন দক্ষ গৃহ-নির্মাণ-শিল্পী। এরা দেবরাজ ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই অর্থাৎ দিতির সন্তান। স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারে ইন্দ্রের সঙ্গে ময়ের বিবাদ; ফলে ইন্দ্রের হাতে ময়ের প্রাণ-সংশয় দেখা দিলে 'ময়' পলাতক অবস্থায় খাণ্ডব-বনে আশ্রয় নেয়। তাই অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে বাসুদেব রোজই খাণ্ডব-বনের দিকে শিকারে যান; উদ্দেশ্য - যদি ময়ের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু ময়ের দেখা পাওয়া যায় না। সেটা ছিল গ্রীষ্মকাল। একদিন গ্রীষ্মের দাবদাহ এত প্রবল হোল যে, খাণ্ডব-বনের এক অংশে দাবানল দেখা দিল। তখন অর্জুনকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বনের বাইরে এসে একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল —সেই দাবানল অতিক্রম করে কে একজন ছুটে আসছে। কেশব

অনেকটা অনুমান করতে পেরেছিলেন—বোধ হয় 'ময়'। তখন তিনি একটু ছলনার আশ্রয় নিলেন। ময়ের দিকে তীর-ধনুক তুলে তাকে ভয় দেখালেন। এই ভাবে ময়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় বনের দাবানল নির্বাপিত হয়ে এলো। ইতিপূর্বে বনের মধ্যে যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন দেখছিলেন, আবার সেখানে তিন জনে চলে গেলেন। তখন তাঁদের মিলিত চেষ্টায় মাটীর নীচের সুড়ঙ্গ থেকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ ও কৌমদকী গদা গ্রহণ করে তখনকার মত আবার সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে চলে গেলেন এবং যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ময়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন ময়দানবকে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্মাণের ব্যবস্থা করে কেশব দ্বারাবতী চলে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিত্রবিন্দা প্রভৃতির বিবাহ এবং পিণ্ডারকে রাজসূয়

॥ ১ ॥

বাসুদেব দ্বারাবতীতে এসে লক্ষ্য করলেন—যাদব-রাজ উগ্রসেন বার্ধক্যের ভাড়ে ক্রমশঃ অকর্মণ্য হয়ে পড়ছেন ; অথচ বাসুদেব মথুরাতেই তাঁকে বলেছিলেন,—একদিন যাদব-রাজ উগ্রসেনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'রাজ-চক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত করে যদু-বংশের খ্যাতি জগৎ-সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। কাজেই বাসুদেব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গুপ্তচর পাঠিয়ে তাদের মনোভাব জানতে চেষ্টা করতে লাগলেন। উত্তর ভারতে মদ্র,* কেকয়, অবন্তী, কোশল, হস্তিনাপুর আর পূর্ব ভারতে মগধ—এই রাজ্যগুলি বাসুদেবের ইচ্ছা পূরণে বাধার সৃষ্টি করবে।

এই সময় বাসুদেব জানতে পারলেন তৎকালীন অবন্তীরাজ

---

* মদ্র—(১) পাঞ্জাবের ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা উপনদীর মধ্যবর্তী দেশ। (২) মাদ্রাজকেও মদ্র দেশ বলা হয়।

জয়সেন প্রবল ক্ষমতাশালী; তাঁর সঙ্গে হস্তিনাপুরের বন্ধুত্ব। অবন্তী-রাজের পুত্রদ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দ দুর্যোধনের বশবর্তী। তারা তাদের ভগিনী মিত্রবিন্দাকে দুর্যোধনের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর করতে ইচ্ছুক। বাসুদেব সে কথা জানতে পারেন এবং আরও জানতে পারেন মিত্রবিন্দা, তাঁর পিতৃস্বসা রাজাধিবেদীর (মতান্তেরে রাজাধিদেব্যার) কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা। তার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে মিত্রবিন্দাকে (তৎকালীন প্রথানুসারে) হরণ করে এনে বিবাহ করেন।* (১) এই ভাবে অবন্তীর সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করলেন, যাতে উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে অবন্তী-রাজ কোন বিরুদ্ধাচরণ না করেন।

এরপর কোশলের সূর্যবংশীয় রাজা নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতী অর্থাৎ সত্যাকে সপ্তবৃষ-দমন-রূপ বীর্যশুল্কে লাভ করেন। (২)

তারপর কেকয়-রাজ ধৃষ্ট-কেতুর (অর্থাৎ বসুদেব-ভগিনী শ্রুতকীর্তির) কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। (৩)

এরপর দেখা যায়—মদ্ররাজ বৃহৎ সেনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বরে সুকঠিন লক্ষ্যভেদ করে তাকে লাভ করেন। (৪) *

॥ ২ ॥

এদিকে রাজসূয় যজ্ঞের স্থান নির্বাচন নিয়ে বাসুদেবকে চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছিল। কারণ যে যজ্ঞের তিনি আয়োজন করতে

---

* তৎকালে মাতুলের পুত্র-কন্যার সহিত পিতৃস্বসার পুত্র-কন্যাদের বিবাহ সমাজে গ্রাহ্য ছিল। এখনও কোন কোন অঞ্চলে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

** (১) শ্রীভাঃ ১০/৫৮/৩০, ৩১, (২) শ্রী ভাঃ ১০/৫৯/৪১, ৫১ এছাড়া গর্গসংহিতা ও পদ্ম পুরাণ (৩) শ্রী ভাঃ ১০/৫৮/৫৬। (৪) শ্রী ভাঃ ১০ ৮৩/১৭।

*** শ্রীকৃষ্ণের এই বিবাহ-অনুষ্ঠানগুলির সময় বা ঘটনা পারম্পর্য সঠিক নির্দেশ করা সম্ভব নয়।

যাচ্ছেন,—তার বিপুলতার কথা কল্পনা করে যাদব প্রধান-গণের সহিত পরামর্শ করে দ্বারাবতী থেকে ষোল মাইল দূরে সাগর-তীরে অবস্থিত পিণ্ডারক (পিণ্ডারা) নামে এক সুবৃহৎ প্রান্তর মনোনীত করে সেখানে সভামণ্ডপ নির্মাণের আদেশ দিলেন।*

এখন মগধ জয়ের ব্যাপারে বাসুদেব খুবই চিন্তান্বিত হলেন। কারণ জরাসন্ধ কিছুতেই যাদবদের প্রাধান্য স্বীকার করবেন না। বরং সেখানে আবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্ভাবনা, যেটা তার নীতি বিরুদ্ধ। কাজেই বর্তমানে মগধকে এড়িয়ে যেতে হবে এবং সময়ের প্রতীক্ষা করতে হবে। তিনি বিশ্বজয়ের** পরিকল্পনা নিয়ে দুর্ধর্ষ আভীর গোপ জনতাকে মৃত্যুপণ-কারী সুশৃংখল যোদ্ধা-রূপে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। বাসুদেবের পুত্রদের মধ্যেও অনেক রথী ছিলেন। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, দীপ্তিমান, ভানু, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু প্রভৃতি***। সমগ্র যাদব-সেনাকে চারটি ব্যূহে ভাগ করা হয়েছিল। তাদের নাম—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

বাসুদেব প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধকে অতি অল্প বয়স থেকে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন এবং যাদব-সেনানীদের মধ্যে একজন রথী হিসেবে সম্মানিত করেছিলেন।

---

* ৩৫০০ বৎসরের স্মৃতির নিদর্শন পিণ্ডারকের সেই বিশাল প্রান্তর লেখক স্বয়ং সেখানে গিয়ে দেখে এসেছেন।

** সে সময় 'বিশ্ব' বলতে জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ নববর্ষ-সমন্বিত প্রাচীন এশিয়াকে বোঝাত।

*** বিশ্বজয়ী যাদব সেনানীদের মধ্যে বাসুদেবের পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে অষ্টাদশ রথীর নাম পাওয়া যায়। যথা—(১) প্রদ্যুম্ন, (২) অনিরুদ্ধ, (২) দীপ্তিমান, (৪) ভানু, (৫) শাম্ব, (৬) মধু, (৭) বৃহদ্ভানু, (৮) চিত্রভানু, (৯) বৃক, (১০) অরুণ, (১১) পুষ্কর, (১২) বেদবাহু, (১৩) শ্রুতদেব, (১৪) সুদেব, (১৫) সুনন্দন, (১৬) চিত্রকেতু, (১৭) বিরূপ, (১৮) কবি ন্যগ্রোধ।

নারায়ণী-সেনা জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন রাজ্য জয় করে বৎসরান্তে দ্বারাবতীতে ফিরে এলো। প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে অভিনন্দন জানাতে উগ্রসেন ও বসুদেব এবং অন্যান্য যাদব প্রধান-গণ নগর-দ্বারে এসে জয়মাল্যে তাদের বরণ করলেন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে সকল যাদব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পিণ্ডারকে উপস্থিত হয়ে রাজসূয় যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের পরিকল্পনা/জরাসন্ধ বধ

যুধিষ্ঠির অর্জুনের মুখে নারায়নী-সেনার বিশ্বজয় যাত্রার কাহিনী শুনলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবং ভারতের বাইরে থেকেও প্রতিনিধিগণ পিণ্ডারকে এসে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরেরও মনে এইরূপ রাজসূয়-যজ্ঞ করার অভিলাষ জাগে। সেজন্য বাসুদেবের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার। তিনি বাসুদেবকে আনার জন্য দ্বারাবতীতে লোক পাঠালেন।

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ পেয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে এসে বাসুদেব সকলের সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করে যথাসময়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট তাঁকে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছা ব্যাক্ত করলেন। অন্যান্য অনেকেই যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে ব্রতী হওয়ার ব্যাপারে অনুমোদন করলেও তিনি বাসুদেবের অনুমোদন না নিয়ে একার্যে ব্রতী হতে ইচ্ছুক নন। কারণ যুধিষ্ঠির জানেন, কৃষ্ণের সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে এবং কোন্ কার্য উচিত বা অনুচিত, তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করতে পারবেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির—উভয়েই সরল ও ধার্মিক, এখানে উভয়ের খুব মিল; কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে গরমিলও আছে।

যুধিষ্ঠির সকল বিষয় সরল ভাবেই গ্রহণ করেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন না, কিন্তু বাসুদেব সরল ভাবে গ্রহণ করলেও তাঁর জন্মগত অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞাদ্বারা বিষয়টির পরবর্তী কার্য-কারকতা সহজেই বুঝতে পারেন। যেদিন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বাসুদেবের বিশ্বজয়াভিলাষী নারায়ণী সেনার সহযাত্রী করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, সেইদিনই বাসুদেব মনে মনে জেনেছিলেন,—একদিন উচ্চাভিলাষী যুধিষ্ঠিরও রাজসূয় যজ্ঞের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। তাতে বাসুদেব মনে মনে খুশিও হয়েছিলেন; কারণ যুধিষ্ঠিরের এই উচ্চাভিলাষ-ই বাসুদেবের স্বপ্ন সার্থক করতে সহায়ক হবে।

যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন—অন্যান্য সুহৃদ্‌গণের ন্যায় বাসুদেবও তাঁকে রাজসূয়যজ্ঞে উৎসাহিত করবেন। কিন্তু বাসুদেব যখন অনুমোদন করলেন না, তখন তিনি বিস্মিত হলেন। রাজসূয়-যজ্ঞ করার যোগ্যতা তখনও যুধিষ্ঠির অর্জন করতে পারেন নি! আগে তাঁকে সম্রাট হতে হবে, তারপর তাঁর রাজসূয় যজ্ঞ করার অধিকার জন্মাবে। তাঁর সম্রাট হওয়ার পথে কি কি বাধা রয়েছে, বাসুদেব সেবিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে দিলেন। উগ্রসেন বর্তমানে রাজ চক্রবর্তীর সম্মানলাভ করলেও আর্য-ভারতে সম্রাটের সম্মান জরাসন্ধের। আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছিয়াশিজন নৃপতি জরাসন্ধের কারাগারে বন্দী রয়েছেন, এদের যদি মুক্ত করে আনা যায়, তবে যুধিষ্ঠিরের সম্রাট হওয়ার পথ সুগম হবে। জরাসন্ধ যদি এ সকল নৃপতিকে মুক্তি না দেন, তবে প্রয়োজন হলে জরাসন্ধকে বধ করে তাঁদের মুক্ত করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে বাসুদেব তাঁর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্ভাবনাকে আমল দিলেন না।

যুধিষ্ঠির খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিভাবে সেটা সম্ভব হবে? যুধিষ্ঠির অতি সাবধানী ব্যক্তি এবং ধৈর্যশীলও বটে।

কোন কাজ করার আগে তিনি বার বার ভেবে নেন। পাণ্ডবদের অন্যান্যরা এর বিপরীতি। মধ্যম পাণ্ডব ভীম দুঃসাহসী এবং গোঁয়ার বুদ্ধি সম্পন্ন; বেশী ভেবেচিন্তে কাজ করেন না। অর্জুন নিজ বাহুবলের ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাসী; যেখানে অস্ত্রবলের প্রয়োজন, সেখানে তিনি অগ্রবর্তী। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে কোন কার্যে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন। বাসুদেব এঁদের সকলের মনস্তত্ব বিচারে ভুল করেন নি।

বাসুদেবের পরামর্শ মত যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনকে বাসুদেবের সঙ্গে রাজগৃহে (মগধের রাজধানী) যেতে অনুমতি দিলেন। তিন জনে রথারোহণে দারুকসহ ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে যাত্রা করলেন। জরাসন্ধের পুরী গিরিব্রজ (রাজগৃহ) পঞ্চ-পর্বত-বেষ্টিত*। একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার। রাজাজ্ঞা না পাওয়া পর্যন্ত প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই পর্বত প্রাকারের বাইরে দারুকসহ রথ রেখে প্রধান প্রবেশ পথের ভেরীসকল চূর্ণ করে দ্বার উল্লংঘন পূর্বক পুরী প্রবেশ করে জারসন্ধের সঙ্গে দেখা করলেন।

পূর্ণ বিবরণ মূল গ্রন্থে দেওয়া আছে।

জরাসন্ধ-বধের ব্যাপারে নানা ধরণের সমালোচনা চোখে পড়েছে। তাতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে কালিমা লেপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি সেই সব সমালোচকদের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ঠিকমত অনুধাবন করতে অনুরোধ করব—। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মজ্ঞ। ধার্মিকের

---

* পঞ্চপর্বত: (১) বৈভার গিরি (বৈহার), (২) বিপুল গিরি (চৈত্যক), (৩) রত্নগিরি (৪) উদয় গিরি ও (৫) সোনা গিরি।

বর্তমান রাজগীর, যা পূর্বে রাজগৃহ এবং তার পূর্বে গিরিব্রজ নামে অভিহিত ছিল, লেখক সেখানে গিয়ে স্থানটি ঘুরে দেখে এসেছেন। যেখানে জরাসন্ধের বাসগৃহ এবং সভা মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ এবং যেখানে ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধ মল্লযুদ্ধ করেছিলেন, সেই পাহাড়-বেষ্টিত স্থানটি তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। অনেক প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন এখনও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ কি ? কোথাও মানব-ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ ঘটতে থাকলে, তার প্রতিকার করতে ধার্মিক ব্যক্তি সচেষ্ট হন। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ছিয়াশি জন নৃপতিকে জরাসন্ধ বন্দী করে রেখেছেন ; আরও চৌদ্দ জন রাজাকে বন্দী করতে পারলেই শত পূর্ণ হবে ; তখন এই বন্দী রাজাদের রুদ্রদেবের নিকট বলি দেওয়া হবে। এই নিষ্ঠুর কার্য ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ,—মানব-ধর্মের পরিপন্থী। এই নিষ্ঠুর কার্য বন্ধ করতে প্রত্যেক ধার্মিকের নীতিগত কর্তব্য। সেই কর্তব্য-বোধেই শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে এই নিষ্ঠুর কার্য থেকে বিরত করতে চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি অন্যান্য ধর্ম-প্রচারকের মত শুধু উপদেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করবেন না ; বন্দী রাজাদের প্রাণ রক্ষাকরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের অঙ্গ বলে জেনেছেন, তখন যে-কোন প্রকারে হোক্ তিনি সে-কার্য সাধন করবেন, প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগেও তিনি কুণ্ঠিত হবেন না ; তাতে যদি মৃত্যু বরণ করতে হয়, তাতেও তিনি ভয় পাবেন না। সেই বিপদের ঝুঁকি নিয়েই তিন বীর এই কার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন।

দ্বৈরথ যুদ্ধের পরিকল্পনা এই জন্য যে, জরাসন্ধের একার অপরাধে অন্য লোকের মৃত্যু ঘটানো শ্রীকৃষ্ণের নীতি-বিরুদ্ধ। এর দৃষ্টান্ত এর আগেও অনেক পাওয়া গিয়েছে। বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য জরাসন্ধকে অনুরোধ করা হয়েছে। যখন তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। তখন তাঁকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা হোল এবং তাঁদের তিন জনের যে কোন একজনকে তাঁর অভিপ্রায় মত বেছে নিতে বললেন। জরাসন্ধ বীর ; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অপেক্ষা ভীমকেই তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেছে নিলেন।

ঐসব সমালোচনায় আরও কিছু অবাস্তব কথাও উল্লিখিত আছে ; যেমন—ভীম যখন কিছুতেই জরাসন্ধকে জয় করতে পারছেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণ একটি গাছের পাতা দুভাগে চিরে ইঙ্গিতে ভীমকে জানিয়ে দিলেন—দু' পা ধরে তাঁকে চিরে ফেলতে।

যে সব কবি বা সমালোচক জরাসন্ধ-বধের ব্যাপারে এই সব উল্লেখ করছেন, তারা অতি নিম্ন স্তরের কবি বা সমালোচক ; তাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতে চেষ্টা করেছে। তাদের মত বাস্তব-জ্ঞান-বিবর্জিত কবি বা সমালোচকরাই বিশ্বাস করে—দুই মায়ের গর্ভে জরাসন্ধের দেহের দু' অংশ জন্মেছিল এবং মগধ-নরেশ বৃহদ্রথের নির্দেশে পুত্রের বিচ্ছিন্ন দু'টি অংশ শ্মশানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ; সেখানে এক পিশাচী সেই দু'টি অংশ জুড়ে নিয়ে এসে রাজবাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়। এই সব ঠাকুরমার ঝুলির গল্প সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অতি নিম্নস্তরের কবি বা সমালোচক দ্বারাই এসব লেখা সম্ভব।

জরাসন্ধ-বধের ব্যাপারেও শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যখন জরাসন্ধ নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দূর থেকেই ভীমকে ডেকে বলেছিলেন—

'হে কৌন্তেয়, ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নয়। অধিক পীড়নে মৃত্যু ঘটতে পারে। তুমি এর সহিত বাহু-যুদ্ধ কর।'

ভীম সে কথায় কর্ণপাত করেন নি, বা সেকথা তাঁর শ্রুতি-গোচর হয় নি। তিনি জরাসন্ধকে পীড়ন করেই বধ করেছেন। কৃষ্ণের মত ধর্মজ্ঞান ভীমের ছিল না।*

---

* যারা জরাসন্ধ-বধ-ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণকে কূট-কৌশলী রূপে ভাবেন, তাদের অনুরোধ করব—তারা যেন তাঁর কার্য-কলাপকে বিশেষ ভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ধর্ম-সংরক্ষণ এবং এই কার্য সম্পাদনে প্রয়োজনে অর্থাৎ নিতান্ত অপরিহার্য হলে দুষ্কৃত বিনাশ করাও তিনি একান্ত কর্তব্য বলে ভাবতেন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তি-শূন্য, কিন্তু ধর্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

মথুরা/দ্বারাবতী/রেবতক

(১৮ বৎসর বয়স থেকে ৫৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত)

মূল খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মথুরার নব পরিবেশ

শ্রীকৃষ্ণ তার বিপ্লবী সংস্থার কর্মীদের সাহায্যে উগ্রসেনের প্রথম রাজসভায় জন-নায়ক ও গণ-মুখ্যগণ এবং মথুরা-বাসীর প্রধানগণ যাতে উপস্থিত থাকেন, সে ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে মহারাজ উগ্রসেন নববেশে উচ্চ রাজ-পদাধিকারীদের সম্মুখে আসা-মাত্র সকলে তাঁকে অভিবাদন করলেন। কৃষ্ণ-বলরাম রাজার দুই পার্শ্ব রক্ষা করছেন এবং কৃষ্ণের উপদেশক্রমে সাত্যকি, কৃতবর্মা, শ্রীদাম, উদ্ধব, বিদুরথ, কঙ্ক প্রভৃতি সেনানীগণ ও বাসুকি পরপর দুই সমান্তরাল সারিতে মহারাজকে অনুসরণ করে রাজসভায় উপস্থিত হলেন। মহারাজ সিংহাসন গ্রহণ করলে অন্যান্যরা যাঁর যাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। গর্গাচার্য, অক্রূর, বসুদেব, দেবক ও সত্যক তখনও আসেন নি। কৃষ্ণ আগ্রহ-ভরে প্রবেশ পথের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, তাঁরা প্রবেশ করছেন। সকলে দাঁড়িয়ে আচার্যদেবকে অভিবাদন করতেই তিনি দু' হাত উর্ধ্বে তুলে আশীর্বাদ জানিয়ে সকলকে আসন গ্রহণের জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারপর এই প্রবীণগণ নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে মহারাজ উগ্রসেনের জয়ধ্বনি ক'রে পরে সমবেত সভাস্থ সকলকে স্বাগত ভাষণে অভিনন্দন জানালেন। এর পর বলতে লাগলেন,—'স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানে এখন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আবার গণ-প্রজাতান্তিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এখন জনগণের দায়িত্ব বেড়ে গেল অনেক। রাজ্যের উন্নতি-কল্পে রাজকার্যে, তাদের সহযোগিতা

অপরিহার্য। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে—যারা রাজরোষে গৃহহারা হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির দিকেও খুব জোর দিতে হবে। প্রাক্তন মথুরাপতি কংসের অদূরদর্শী রাজনীতির ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ রাজ্যে অবস্থিত মগধ-সৈন্যদের ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজকোষের অর্থের ওপর প্রবল চাপ পড়েছে। বিদেশী সৈন্যদের সরিয়ে দিয়ে শূরসেনের নিজস্ব সৈন্য-সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। অতি সত্বরই যাতে মগধ-সৈন্য মথুরা ত্যাগ করে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সঙ্গে এ কথাটা সকলকে জানিয়ে রাখতে চাই—জামাতা কংসের মৃত্যুকে মগধরাজ জরাসন্ধ সহজ ভাবে গ্রহণ করবেন না। এই মথুরা এখন আর তাঁর তাবেদার নয়; তাতে তাঁর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাহত হবে। মনে হয়, জরাসন্ধ মথুরার এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে মোটেই সুনজরে দেখবেন না। হয়তো বা শীঘ্রই তিনি মথুরা আক্রমণ করবেন। তারজন্য শূরসেনের জনগণকে সজাগ থাকতে হবে। মাথুর সৈন্যদের পুনর্গঠন করতে হবে। বিপ্লবী সংস্থার গোপ ও মাথুর যুবকগণ এবং অনার্য সৈন্যরাও আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাজে সহায় হবে।'

শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দরদী মনের পরিচয় পেয়ে সভায় উপস্থিত সকলেই মনে মনে খুব খুশি হোল এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগল।

এই সময় উগ্রসেন বললেন,—'কৃষ্ণ বয়সে তরুণ হলেও তার বুদ্ধি, সাহস ও রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধির তুলনা নেই; সেই সঙ্গে তার উদারতাও সকলের অনুকরণীয়। সে আমাদের গৌরব। তার পরামর্শ মতই মথুরার শাসন কার্য পরিচালিত হবে।'

গর্গাচার্য বললেন,—'মহারাজ! আপনার সিদ্ধান্ত জেনে প্রীত হলাম। কৃষ্ণ আমার স্বপ্ন সার্থক করেছে। কিন্তু আগামী দিনে শত্রুর আক্রমণের যে আশঙ্কার কথা সে ব্যক্ত করেছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শূরসেনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাস্তুচ্যুত শূরসেন-বাসীদের পুনর্বাসনের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষ্ণ তার বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে; এজন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। সমভাবাপন্ন পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে; যাতে প্রয়োজনের সময় তারা আমাদের সাহায্য করে। উপস্থিত জন-নেতাগণ শূরসেনের উন্নতিকল্পে যদি কোন সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন, তবে তা সাদরে গৃহীত হবে।'

এই সময় অক্রূর দাঁড়িয়ে উঠে বলতে লাগলেন,—'সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, কৃষ্ণ ও আচার্যদেবের বক্তব্য শুনে তারা খুবই আশান্বিত। এতদিন যে আতঙ্ক ও হতাশায় জীবন কাটাতে হয়েছে, তা থেকে তারা মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। আমি জনগণের পক্ষ থেকে সব রকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

অক্রূরের কথা শেষ হতেই সভাস্থ সকলে উত্তেজনাপূর্ণ করতালিদ্বারা তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন।

বসুদেব, সত্যক, দেবক প্রভৃতি প্রবীণগণ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে নব রাষ্ট্র গঠনে সকলের সহযোগিতা কামনা করলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ সভা চলার পর সভাভঙ্গ হোল।

সভার শেষে আচার্য গর্গ ও অন্যান্য প্রবীণদের নিয়ে বসুদেব নিজ ভবনে এলেন। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ-বলরামও গৃহে ফিরলেন। এই সময় বসুদেব বললেন,—'এখনও রাম-কৃষ্ণের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হয় নি; তাই আমার ইচ্ছা কংসের পারলৌকিক ক্রিয়াদি শেষ হলেই এদের উপনয়ন-সংস্কারের দিন

ধার্য করে আচার্য দেবের নির্দেশমত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোক।'

উপস্থিত সকলেই একমত হলেন। এই সময় কৃষ্ণ বসুদেবকে বললেন,—'এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে হস্তিনাপুরে লোক পাঠিয়ে পিতৃস্বসা পৃথাকে এখানে নিয়ে আসা হোক্। আমাদের উপনয়ন উপলক্ষে পিতৃস্বসা পৃথার এখানে আগমন পারিবারিক আনন্দ বর্ধন করবে নিঃসন্দেহ; তবে অপ্রত্যক্ষ কারণটি একটু বলা দরকার; —শুনেছি ইতিমধ্যে মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। এতেই বোঝা যায়—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু-পুত্রদের সুনজরে দেখছেন না। পিতৃস্বসা পৃথার নিকট জানা যাবে—মথুরার বর্তমান শাসক মহারাজ উগ্রসেন সম্বন্ধে কুরুরাজের মনোভাব কি! রাজনৈতিক কারণে এটা বিশেষ প্রয়োজন।'

কৃষ্ণের কথা শুনে সকলেই কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা প্রফুল্ল। তাঁরা একবাক্যে কৃষ্ণকে সমর্থন করলেন। এখন হস্তিনাপুরে কে যাবেন, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। পরে অবশ্য ঠিক হয়েছিল, —মহামতি অক্রূরই এই কাজের যোগ্য ব্যক্তি।

'আমাদের শূরসেনের নিকটবর্তী অন্যান্য রাজ্য গুলির সহিত প্রীতি বিনিময়ের দ্বারা তাদের মনোভাব জানার চেষ্টা করা খুবই প্রয়োজন। এ কার্যে আচার্য-দেবকেই দায়িত্ব নিতে হবে। সৈন্য সংগঠনের কাজে আমি সর্বদা ব্যস্ত থাকব। দাদা বলরাম আমাকে সহায়তা করবেন। সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি সেনানীগণ সহযোগিতা করবে।' কথাগুলি বলে কৃষ্ণ গর্গাচার্যের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন।

আচার্য গর্গ স্মিতহাস্যে বললেন,—'তোমার পরিকল্পনা-মতই কাজ হবে। এতে কারও অন্যমত থাকবে না।'

সেদিনের মত কথাবার্তা শেষ করে সকলে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন ও পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ

বৃন্দাবন থেকে মথুরায় আসার সময় নন্দ ঘোষ নন্দরানী যশোদার নিকট কথা দিয়ে এসেছেন,—বৃন্দাবনে ফিরে আসার সময় গোপালকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। তাই কংসবধের পর তিনি এতদিন মথুরায় রয়েছেন।

কংসের পারলৌকিক ক্রিয়াদি শেষ হলে পরদিন নন্দ ঘোষ কৃষ্ণকে বললেন,—'বাবা, গোপাল! অনেকদিন হয়ে গেল বৃন্দাবন ছাড়া। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো বলে তোমার মা-যশোদাকে কথা দিয়ে এসেছি। এইবার চল, বাবা! একবার তাঁকে দেখা দিয়ে চলে এসো!

কৃষ্ণ বললেন,—'আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, এই অবস্থায় এখন মথুরা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। আপনি অন্যান্য লোকজন নিয়ে এখন বৃন্দাবন চলে যান; এখানকার কাজ—একটু হাল্কা হলেই আমি বৃন্দাবনে যাবো এবং মায়ের চরণ বন্দনা করব।'

—না, বাবা, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না। শুধু যশোমতীই নন, বৃন্দাবনের সবাই তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের আমি কি বলে প্রবোধ দেব? তুমি একবারটি শুধু আমার সঙ্গে চল! সকলকে একবার দেখা দিয়ে আবার চলে এসো।

কৃষ্ণ নন্দকে জড়িয়ে ধরে অনুনয়ের সুরে বললেন,—'আপনি অবুঝ হবেন না, পিতা, আমি কথা দিচ্ছি—এখানকার অবস্থা আর একটু সুস্থ হলেই আমি বৃন্দাবনে যাবো; আমি কথা দিচ্ছি, —মা-কে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আর গোপপল্লীর সকলকে বলবেন,

—আমি কখনও তাদের ভুলতে পারবো না, তাদের কথা সব সময় আমার মনে হয়। আমি আপনার সঙ্গে কিছু উপহার-দ্রব্য পাঠাচ্ছি তাদের জন্য আমার প্রীতি-উপহার। আপনি যাত্রা করলেই গো-শকট সেইসব জিনিস-পত্র আর লোকজনসহ আপনার অনুগমন করবে।

নন্দঘোষ এইবার চোখের জল স্থির রাখতে পারলেন না, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। কৃষ্ণ তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে দিতে বার বার বৃন্দাবন যাবার শপথ করতে লাগলেন।

পরদিন গোপরাজ নন্দঘোষ লোকজন এবং উপঢৌকনাদিসহ বৃন্দাবন যাত্রা করলেন।

কয়েক দিন পরেই কৃষ্ণ-বলরামের 'উপনয়ন' অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে অক্রূর হস্তিনাপুর থেকে পঞ্চপুত্রসহ বিধবা পৃথাকে (কুন্তীকে) মথুরায় নিয়ে এসেছেন। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের অতিথি হয়েই তিনি হস্তিনায় গিয়েছিলেন। কুরুরাজ তাঁর হস্তিনাগমনের কারণ জেনে যথাযোগ্য সৌজন্য প্রদর্শন করলেন। কুন্তীর মথুরা-গমন-ব্যাপারে তিনি উৎসাহই দেখালেন।

কুন্তী যখন পুত্রদের নিয়ে মথুরায় দাদা বসুদেবের গৃহে এলেন, তখন হর্ষ-বিষাদের এক অভাবিত উজ্জ্বল-মলিন দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটল। শিশুকালে জনক শূরের গৃহ ত্যাগ করে কুন্তী-ভোজের কন্যারূপে ভোজ-গৃহে* মানুষ হয়েছিলেন তিনি। তারপর কত দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবন কেটেছে তাঁর। অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ-লাবণ্য ও অটুট যৌবনের অধিকারিণী, তার ওপর রাজকন্যা; তা সত্ত্বেও সুখ-ভোগের সুযোগ তাঁর জীবনে খুব কমই এসেছে। দুর্বাসা ঋষির সেবায় কুমারী কালেই এক পুত্রের জন্ম দিয়ে দুঃখের জীবন শুরু হয়। প্রথম সন্তানকেই তাঁর ত্যাগ করতে হয়

* বর্তমান বুন্দেল খণ্ড

নিন্দা-অপবাদের ভয়ে। তারপর স্বয়ম্বর সভায় নিয়তির দুর্জ্ঞেয় খেলায় তাঁর মত দুর্লভ নারীরত্নকে হস্তিনার যুবরাজ গোপন-রোগগ্রস্ত পাণ্ডুকে বরমাল্যে বরণ করতে হয়। প্রকৃত স্বামী-সুখ তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। সেই হীনবীর্য স্বামীর নির্দেশে তাই তিনটি ক্ষেত্রজ পুত্রের জননী হন তিনি।

এখানেই শেষ নয় ; সপত্নী মাদ্রী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হওয়ায় তাঁর দুই ক্ষেত্রজ পুত্রেরও দায়িত্ব নিতে হয় কুন্তীকে। এই ভাবে শত-শৃঙ্গ পর্বতের অরণ্যাঞ্চলে এই পাঁচটি নাবালক পুত্রকে নিয়ে তাঁর দিন কাটতে থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরের বয়স যখন ষোল বৎসর, ভীমের পনের ও অর্জুনের চৌদ্দ এবং নকুল-সহদেবের বয়স তের বৎসর কয়েকমাস, তখন শত-শৃঙ্গের তপোবনের ঋষিগণ পঞ্চ-পুত্রসহ কুন্তীকে হস্তিনায় নিয়ে আসেন এবং হস্তিনা-রাজ-সভায় পাণ্ডবদের পরিচয় করিয়ে দেন। ঋষি-প্রধানের বাক্-চাতুর্যে সকলেই মুগ্ধ। পাণ্ডবদের পরিচয়-ব্যাপারে কারুও কোন সন্দেহ রইল না। ভীষ্মের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে এবং বিদুরের সম্মতি-ক্রমে পঞ্চ-পুত্রসহ কুন্তী হস্তিনার রাজ-অন্তঃপুরে স্থান পেলেন। পঞ্চ পাণ্ডব কুরুবংশধর বলে পরিচিতি পেল।

কুন্তীর আগমনে বসুদেব-গৃহের সবাই আনন্দিত হয়েছে, তবে তাঁর অকাল-বৈধব্যে সবাই মর্মাহত। সকলেই সহানুভূতি-সূচক বাক্যে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন।

দেবকীকে দেখে কুন্তী তাঁকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। কত কষ্ট পেয়েছে সে বিবাহের পর থেকেই। তিনি এক দুঃখিনী, দেবকী তাঁর চেয়েও দুঃখিনী। কি সান্ত্বনা দেবেন তাঁকে কুন্তী। ভগ্ন-স্বাস্থ্য, রুগ্ন, মলিন দেবকীকে মুখে কিছু বলতে পারলেন না, শুধু গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে অন্তরের সহানুভূতি জানাতে লাগলেন তিনি।

তারপর সকলে শান্ত হয়ে বসে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

এই সময় কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন,—'পিসিমা! তোমরা বোধহয় তিন বৎসর হোল হস্তিনায় এসেছ; তোমাদের প্রতি কুরুরাজের মনোভাব কিরূপ? এ কথা জিজ্ঞেস করছি এই জন্য যে, তাঁর পুত্রেরা নাকি বিষ-প্রয়োগে তোমার এক পুত্রকে মারার চেষ্টা করেছিল!'

—যা শুনেছ, তা সত্যি। তাঁর ছেলেরা ভীমকে সহ্য করতে পারে না, তাই তাকে তারা মারার চেষ্টা করেছিল। এ ব্যাপারে কুরুরাজের মনোভাবে কিছু বুঝতে পারি নি; তাঁকে নির্বিকার থাকতেই দেখেছি। তবে মহামতি বিদুর সব জেনে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন—ব্যাপারটা যেন আর জানাজানি না হয়। কুরুরাজগৃহে তিনিই আমাদের একমাত্র বান্ধব।

কৃষ্ণ কথাগুলি তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন,—'মথুরার বর্তমান শাসক উগ্রসেনের প্রতি কুরুরাজের কি মনোভাব, তাঁ কিছু জানতে পেরেছ?'

—কংসকে বধ করে তুমি সিংহাসনে বস নি, বৃদ্ধ উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসিয়েছ; তাতে কুরুরাজ বোধ হয় একটু বিস্মিতই হয়েছেন। তাঁর ধারণা—বৃদ্ধ উগ্রসেন নামে মাত্র রাজা, তুমিই এখানকার সর্বে-সর্বা। অক্রূরের সঙ্গে হয়তো এ বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে। তবে আমার এখানে আসার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহই প্রকাশ পেয়েছে।

—শোন, পিসিমা! তুমি, বুদ্ধিমতি; এত বিপদের মধ্যেও তুমি ধৈর্য হারাও নি। তুমি কুন্তী-ভোজের পালিতা হলেও বৃষ্ণি-বংশের রক্ত তোমার দেহে, তার গৌরব তুমি রক্ষা করতে পারবে। আমি তোমার সন্তান-তুল্য, একটা কথা তোমাকে বলে দিই—খুব সাবধানে তোমাকে থাকতে হবে; ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর

পুত্রগণ সব সময় তোমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। কারণ এতদিন তারা ভাবে নি—কুরুরাজ্যের আর কোন দাবীদার আছে : কিন্তু ন্যায়তঃ তোমার পুত্রেরাও তার অংশীদার। এইজন্যই তারা তোমার পুত্রদের সুনজরে দেখবে না।

কৃষ্ণের ব্যবহারে পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই খুবই প্রীত। তাঁদের মনে হোল—এতদিনে তারা সত্যিকারের একজন আত্মীয় পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ তাঁদের হিতৈষী বন্ধু।

গর্গাচার্যের নির্দেশমত কৃষ্ণ-বলরামের 'উপনয়ন' পর্ব শেষ হোল। বসুদেবের গৃহ আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে সব সময় কোলাহল-পূর্ণ। উৎসব মিটে গেলে লোকজনেরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতে লাগল।

পঞ্চ-পুত্রসহ পৃথা যাত্রার জন্য প্রস্তুত। তাঁদের রথও প্রস্তুত। কৃষ্ণ-বলরাম পৃথা ও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ ভীমকেও প্রণাম করলেন। তারপর বলরাম ও কৃষ্ণ অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করলেন। তারা কৃষ্ণ ও বলরামকে প্রণাম জানালো।

পৃথা পুত্রদের নিয়ে রথে উঠলেন। কৃষ্ণ-বলরাম অন্য এক রথে তাঁদের অনুগমন করে অনেক পথ এগিয়ে দিলেন। কয়েক জন মাথুর সৈন্য পৃথার সঙ্গে হস্তিনাপুর পর্যন্ত গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মথুরা-অবরোধ

কংসের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হওয়ার পর মথুরার রাজ-অন্তপুরে কিছু অশান্তি দেখা দিয়েছে। রানী অস্তি ও প্রাপ্তি পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাঁদের শ্বশ্রূমাতা রানী প্রবর্ণরেখা অনেক সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত

করতে চেষ্টা করেছেন ; তাতে কোন ফল হয় নি। এ-খবর কৃষ্ণের নিকটও পেঁছেছে। কৃষ্ণ কিছুটা চিন্তিত ; অস্তি-প্রাপ্তি পিত্রালয়ে গেলে সেখানকার পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে, তা আঁচ করতে লাগলেন। আবার, তাঁদের সেখানে যেতে না দিলে এখানে অশান্তি বাড়বে। তাই ঠিক করলেন—এঁদের নির্বিঘ্নে গিরিব্রজে পেঁছে দেবার জন্য মথুরায় অবস্থিত মগধ-সৈন্য—এঁদের সঙ্গে যাবে। এতে মগধ-রাজকন্যাদের প্রতি রাজসম্মানই দেওয়া হবে ; কংসের মৃত্যুর পরও তাঁরা যথাযোগ্য সম্মানের সহিতই বিরাজ করছেন এটা অন্ততঃ জরাসন্ধ জানুক। অন্যদিকে তাঁর যে আসল উদ্দেশ্য, তা-ও সফল হবে।

অস্তি ও প্রাপ্তিকে গিরিব্রজে পাঠাবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে—এ সংবাদ তাঁদের কাছে পেঁছে দেওয়া হোল।

কৃষ্ণ এ-কথা ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে, মগধ-রাজকুমারীরা মথুরা থাকাকালে মথুরা আক্রমণের ব্যাপারে জরাসন্ধ বেশ চিন্তা করছেন। তাই কংসের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েও তিনি আক্রমণোদ্যোগে সময় নিচ্ছেন। কারণ বর্তমান মথুরাপতি জামাতা কংসের পিতা, আর কন্যারাও তাঁরই অন্তঃপুরে আছেন। অন্যদিকে যে-সকল নৃপতি এতদিন জরাসন্ধ ও কংসের ভয়ে জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন, কংসের মৃত্যুর পরও কি তাঁরা ততটা আনুগত্য স্বীকার করবেন? জরাসন্ধ রাজনীতিবিদ, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যই বোধ হয় তিনি সময় নিচ্ছেন। এটা মথুরার পক্ষে মঙ্গল। কারণ মথুরার সৈন্যবল বৃদ্ধি করতে এবং মিত্ররাজ্যগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে সময়ের প্রয়োজন। তাই অস্তি-প্রাপ্তির গিরিব্রজে যাওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবেই কিছুটা বিলম্ব ঘটানো হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই মথুরার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। মগধ-সৈন্যসহ অস্তি-প্রাপ্তি গিরিব্রজে চলে গিয়েছেন। মথুরা থেকে মগধ-সৈন্য অপসারণের যে কৌশল ও মনোবলের পরিচয়

দিয়েছেন কৃষ্ণ, তাতে সকলেই তাঁর বুদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা না ক'রে পারে না। অল্প সময়ের মধ্যেই শূরসেন রাজ্যের সকলের মধ্যে উচ্ছল প্রাণের জোয়ার ফিরে এসেছে।

মথুরার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জরাসন্ধ ওয়াকিবহাল। তাই মথুরা আক্রমণে তিনি যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করছেন। কিন্তু অস্তি ও প্রাপ্তির পীড়াপীড়িতে মথুরা আক্রমণে অগ্রসর হলেন জরাসন্ধ। আক্রমণের লক্ষ্য হোল কৃষ্ণ-বলরাম।

জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করলেন। তাঁর সৈন্য-সংখ্যা ছিল সব মিলিয়ে তেইশ অক্ষৌহিণী। মথুরার সৈন্য-সংখ্যা সে তুলনায় নগণ্য,—কয়েক সহস্র মাত্র। কাজেই জরাসন্ধ নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনায় মগধ-সৈন্যের এক বৃহৎ অংশ নিয়ে জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণের জন্য যমুনার তীরে শিবির স্থাপন করলেন। হস্তী, অশ্ব এবং বিপুল সৈন্যরাশির কোলাহলে মথুরার উপবন কল্লোলিত হয়ে উঠল। মাথুর সৈন্যগণও প্রস্তুত হচ্ছিল। গুপ্তচর মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হয়ে কৃষ্ণ অগ্রজ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে দূর থেকে জরাসন্ধের সৈন্য সমাবেশের বিপুল সমারোহ পর্যবেক্ষণ করলেন।

তারপর উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হোল। যাদব-সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে মগধ-পক্ষীয় নৃপতিগণ পশ্চাৎ অপসারণ করতে বাধ্য হয়ে জরাসন্ধ যেখানে যুদ্ধ করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন ক্ষত্রিয়-ধর্ম-পরায়ণ জরাসন্ধ তাঁদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন,—'হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন ক'রে ক্ষাত্রধর্ম-বিচ্যুত হয়েছ। প্রাণভয়ে এরূপ পলায়নকে মনীষিগণ ভ্রূণ-হত্যা-স্বরূপ মহাপাতক বলে বিবেচনা করেন। তোমাদের ক্ষত্রিয়-জীবনে ধিক্। আমি বলছি—তোমরা পলায়নে নিবৃত্ত হয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হও। অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই গোপবালকদ্বয়কে শমন ভবনে প্রেরণ না করি,

ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের রথে আরোহণ করে যুদ্ধ অবলোকন কর।'

তখন নৃপতিগণ জরাসন্ধের কথায় লজ্জিত হয়ে আবার আক্রমণ শুরু করলেন। এই সময় জরাসন্ধ আক্রমণে অগ্রসর হলে কৃষ্ণ তাঁকে প্রতিরোধ করলেন। কৃষ্ণ অদ্ভুত অস্ত্রচালনার কৌশলে জরাসন্ধের রথের অশ্বগণকে বধ করে তাঁর রথ অচল করে দিলেন। এই সময় সেনাপতি চিত্রসেন এবং সেনাপতি কৌশিক মহারাজকে বিপন্ন বোধে সাহায্য করার জন্য কৃষ্ণকে আক্রমণ করলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হোল। জরাসন্ধ বলরামের দিকে অগ্রসর হলে বলরাম বিপুল বিক্রমে তাঁকে প্রতিরোধ করলেন। বলরাম ও জরাসন্ধের মধ্যে যে গদা-যুদ্ধ আরম্ভ হোল, তাতে পরস্পরের গদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সন্ধ্যা সমাগত হতেই যুদ্ধ বন্ধ হোল এবং এই যুদ্ধে জরাসন্ধ নিজেকে পরাজিত ভেবে আত্মগ্লানিতে ভুগতে লাগলেন।

এইভাবে আঠার দিন যুদ্ধ চলল। মগধপক্ষীয় সৈন্য বেশী হতাহত হতে লাগল। দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ মগধ থেকে নিত্য নূতন অশ্বারোহী সৈন্য আনয়নের ব্যবস্থা করতে লাগলো। মথুরার সিংহাসন দখল করা জরাসন্ধের উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য হোল কৃষ্ণ-বলরামকে বন্দী করা।

এ দিকে যাদব সৈন্যেরও যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হতে লাগল। বাসুকির অনার্য সৈন্যও যুদ্ধে অনেক নিহত হওয়ায় তাঁরও মন ভেঙ্গে গেল। তাঁর অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তিনি মথুরা ত্যাগ করলেন। এই আঠার দিন অবরোধের ফলে মাথুর সৈন্যদলে খাদ্যাভাব দেখা দিল। কৃষ্ণ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। যাদব-প্রধানদের ডেকে পরামর্শ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তাঁদের বোঝালেন,—'জরাসন্ধের এই আক্রমণ আসলে আমার বিরুদ্ধে, মথুরার সিংহাসন দখলের জন্য নয়।

'আমি আর দাদা বলরাম মথুরা ত্যাগ করলে জরাসন্ধ হয়তো এ অবরোধ তুলে নেবেন। তাই আমি ঠিক করেছি,—আমরা দু'জন গোপনে আগামী শেষ রাত্রিতে মথুরা ত্যাগ করব।'

কৃষ্ণের কথা শুনে যাদবপ্রধানগণ এবং মহারাজ উগ্রসেন নিজেদের খুবই অসহায় বোধ করতে লাগলেন। মহারাজ উগ্রসেন কৃষ্ণকে বললেন,—'তোমাকে ছাড়া এ মথুরায় আমরা থাকবো না। আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো।'

তখন কৃষ্ণ তাঁদের বোঝাতে লাগলেন,—'আপনারা ভুল বুঝবেন না; আমি জানি—আপনারা আমার ওপর খুবই ভরসা রাখেন। আমাদের মথুরা ত্যাগের অর্থ আপনাদের ত্যাগ করা নয়, মথুরাকে অবরোধ মুক্ত করা। আর আপনাদের জন্য নূতন উপনিবেশের সন্ধান করা, যেখানে জরাসন্ধের থাবা আমাদের নাগাল পাবে না। শুনেছি যদুবংশের অনেক পরিবার দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ ক'রে সহ্যাদ্রি পর্বতের সন্নিকটবর্তী স্থান-সমূহে বাস করছেন। মহামতি বিকদ্রুও সে-কথা বলেছেন।* তাদের সঙ্গেও দেখা করতে চেষ্টা করব। আমরা মথুরা ত্যাগ করেছি শুনলে জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ তুলে দিয়ে আমাদের ধরার জন্য আমাদের অনুসরণ করবে। তখন আপনারা নিরাপদে মথুরায় থাকতে পারবেন। এতদিন যখন আপনারা আমার ওপর নির্ভর করেছেন, এখনও সেই বিশ্বাস নিয়েই থাকুন। মথুরা আমার জন্মভূমি, মথুরার জনগণ আমার ভাই; তাদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব? মথুরা-বাসীকে আমি যে আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় মনে করি।'

কৃষ্ণের কথায় উপস্থিত সকলেই অনেকটা আশ্বস্ত হোল। তখন গর্গাচার্য বললেন,—'তোমার অনুমান, তোমার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি বাস্তবধর্মী বলেই মনে করি। কাজেই তোমার যা ইচ্ছে, তুমি যা করতে বলবে, আমরা সেইমত কাজ করব।'

---

* মহামতি বিকদ্রুর বিবরণ (উপক্রমণিকা,—তৃতীয় পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৩৫)

শেষ রাত্রিতে দুই দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণ ও বলরাম সকলের অলক্ষ্যে মথুরা ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন।

পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ-বলরামকে দেখা গেল না। কী ব্যাপার! জরাসন্ধের নিকট এ সংবাদ যেতেই তিনি প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। পরে যখন জানতে পারলেন—সত্যিই তাঁরা পলায়ন করেছেন, তখন তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না। চারদিকে সশস্ত্র প্রহরী ও সৈন্য-পরিবেষ্টিত মথুরা; সেই অবস্থায় তাঁদের কিভাবে পালানো সম্ভব হোল? জরাসন্ধ ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছেন না।

মহারাজ জরাসন্ধকে এইরূপ ভাবিত দেখে সেনাপতি শিশুপাল বললে,—'মহারাজ, এভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে শত্রু আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আদেশ করুন—দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে অনুসরণ করি। পথেই তাকে আমরা বন্দী করব।'

জরাসন্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—'এত চেষ্টা, এত আয়োজন—সব ব্যর্থ হোল! এ যে আমার কত বড় পরাজয়!'

—মহারাজ! এখনও সময় আছে, আপনি হতাশ হবেন না। আদেশ দিন!

তখন জরাসন্ধ বললেন,—'এখনই সঠিক জানা যাচ্ছে না কোন্ পথে সে গিয়েছে; তাই সৈন্যদলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে পাঠাতে হবে। আমি দক্ষিণা পথে যাচ্ছি, বনাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে লুকোবারই সম্ভাবনা বেশী। সহ্যাদ্রির বনাঞ্চলের দিকেই আমরা যাবো। যদি পথিমধ্যে তাকে ধরতে না পারি, তবে ঐ পর্বতের পাদদেশে আমরা সকলে একত্রিত হবো।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরশুরাম-আশ্রম ও গোমন্তক আশ্রয়

দিবারাত্রি তিনদিন ক্রমাগত অশ্ব চালিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে সহ্যাদ্রির পূর্ব-সীমায় পর্বতের পাদদেশে এক ঝরনার ধারে গিয়ে থামলেন। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে তাঁদের অশ্ব এবং তাঁরা নিজেরাও খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এখানটা বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান মনে করে অশ্ব দু'টিকে শুশ্রূষা করে ঝরনার তীরস্থ শাদ্বলে* তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজেরা ঝরনার শীতল জলে স্নানাদি সেরে সঙ্গে-বাহিত খাদ্য গ্রহণ করে পর্বতোপরি এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

সেই সময় হঠাৎ এক অভাবনীয় দৃশ্য চোখে পড়ল কৃষ্ণ-বলরামের। অল্প দূরে বৃক্ষচ্ছায়ায় এক জটাজুট ধারী জ্যোতির্ময় তাপস ধ্যানমগ্ন। তাঁর পাশেই পড়ে আছে একখানা কুঠারাস্ত্র। কৃষ্ণ তখন বলরামকে বললেন,—'দাদা, লক্ষ্য করেছ, অদূরে একজন ধ্যানস্থ তাপসকে দেখা যাচ্ছে, পাশেই তাঁর রয়েছে একটি কুঠারাস্ত্র। মহর্ষি ভার্গব বলেই অনুমিত হয়। চল, এগিয়ে যাই। ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছে পূরণের ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছেন। আমরা তাঁর আশ্রমেই যেতাম তাঁর যুদ্ধরীতি জানবার জন্যে। চল।'

কৃষ্ণ-বলরাম এগিয়ে গেলেন। ধ্যানস্থ ঋষির পাশে করজোড়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ঋষির ধ্যান ভাঙল। কৃষ্ণ-বলরাম নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভার্গব তাঁদের আশীর্বাদ করে বললেন,—'খুবই আশ্চর্য লাগছে,—ধ্যানস্থ অবস্থায় তোমাদের

---

* কচিঘাসে ঢাকা জমি।

মত দু'জন তরুণ যুবককেই যেন দেখলাম। তোমাদের এখানে আসার কারণ জানতে পারি ?'

কৃষ্ণ তখন বললেন,—'আমার অনুমান তবে সত্যি ? আপনিই তা হ'লে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-ধ্বংসকারী রেনুকানন্দন ভৃগুরাম, যাঁর নাম শুনলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মনে একটা ভীতির শিহরণ জাগে ?'

—তোমার অনুমান সত্য। হৈহয়-ক্ষত্রিয় কার্তবীর্যার্জুন আমার পিতার দেহে একুশবার অস্ত্রাঘাত করে কী নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করেছিল, মাতার মুখে সে নিষ্ঠুর কাহিনী শুনে এবং পিতার দেহে সেই রক্তঝরা একুশটি আঘাত দেখে তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মচারী হয়েও আমি কোন মতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারি নি। তাই মৃত পিতার দেহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করি—এই গর্বিত ক্ষত্রিয় জাতিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য একবিংশতি বার এই ক্ষত্রিয়-নিধন-যজ্ঞ করব।

—কিন্তু এখনও সেই গর্বিত ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবীকে অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে মারছে।

—তোমার আগমনের কারণ তো বললে না ?

—সেই গর্বিত ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারের কাহিনী আপনাকে শোনাব এবং তার প্রতিকারের উপায় আপনার কাছে জানব—এই আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমি ভেবে সত্যি আশ্চর্য হয়ে যাই—আপনি এককভাবে কিরূপে এত ক্ষত্রিয় নিধনে সক্ষম হলেন !'

—আজ সে তেজ আমার নেই, সেই তপোবলও আর নেই। আমি এখন সেই ক্ষত্রিয়-ধ্বংসকারী ভার্গবের ছায়া-মূর্তি মাত্র। এখন বল—আমি তোমার জন্য কি করতে পারি ?

—আপনি বোধ হয় শুনেছেন, মগধরাজ জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করে মথুরাকে এক ঘোরতর বিপদের মধ্যে ফেলেছে। বার বার তার আক্রমণকে প্রতিহত করেছি। কিন্তু তার অগণিত সৈন্য,

তাদের পর্যুদস্ত করা সহজ নয়। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম, মথুরা বিজয়ই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, আমাদের দু'ভাইকে বন্দী করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য, তখন আমরা গোপনে মথুরা ত্যাগ করে এখানে এসেছি আশ্রয় খুঁজতে এবং আপনার নিকট পরামর্শ নিতে।

—তা হ'লে তুমিই, সেই কংস-নিসূদন কৃষ্ণ, আর এই হচ্ছে বলরাম, যাদের কথা লোকের মুখে মুখে নানাভাবে পল্লবিত হয়ে এক নূতন অবতারের কথা প্রকাশিত হয়েছে ?

—মানুষের মনে যদি কোন বিষয়ে একবার বিশ্বাস জন্মে, তাদের সেই বিশ্বাস ভাঙ্গা সহজ নয়। আমরা তাদের কিছু করতে বললে, তারা খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে সে-কাজ করে। এখন আমাদের কি কর্তব্য, সে সম্বন্ধে যদি কিছু উপদেশ দিন, তবে আমরা খুবই কৃতার্থ হই।

কৃষ্ণের কথার তখনই কোন উত্তর না দিয়ে মহর্ষি ভার্গব চক্ষু মুদ্রিত করলেন। কৃষ্ণ-বলরাম বুঝতে পারলেন—মুনি ধ্যানস্থ হয়েছেন। কিছুক্ষণ পর স্মিতাননে কৃষ্ণকে বললেন,—'জরাসন্ধ বহু সৈন্য নিয়ে এই দিকেই আসছে ; আমি দেখতে পাচ্ছি— তার সঙ্গে তোমাদের ঘোরতর যুদ্ধ হবে। এখন এখানে থাকা তোমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। এখন যেখানে আছ, সেটা করবীরপুর রাজ্যের অন্তর্গত। তোমারই পূর্ব-পুরুষেরা এই করবীরপুর স্থাপন করে রাজত্ব করেছেন। এখন মহাযশা বাসুদেব-পুত্র নরপতি শৃগাল এই রাজ্যের অধিপতি। সে অত্যন্ত কোপন-স্বভাব, পরশ্রীকাতর। বিদ্বেষ বশতঃ সে স্ব-বংশীয় দায়াদ* নরপতিদের বিনাশসাধন করেছে। কাজেই এই স্থানে তোমাদের থাকা আমার অভিপ্রেত নয়। তোমাদের আমি এমন স্থানে নিয়ে যেতে চাই, যেখান থেকে তোমরা জরসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে কোনরূপ বিপদাপন্ন

---

* দাবীদার।

না হও। চল, আজই আমরা এই 'বেনা' নদী পার হয়ে অন্য অধিকারে অতি রমণীয় দুর্গম যজ্ঞগিরিতে গমন করি। সেটি সহ্যাদ্রির একটি শৃঙ্গ। সেখানে এক রাত্রি বাস করে পরে খট্টাঙ্গী নদী* পার হবো। সেখানকার জলপ্রপাতের চারদিকে তপোবন। সেখানে বানপ্রস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণগণ তপশ্চারণ করে জীবন কাটাচ্ছে। সেখান থেকে, যাত্রা করে সহ্যাদ্রির পার্শ্ববর্তী গোমন্ত পর্বতে যাবো। তার এক শৃঙ্গ এত উচ্চ যে পাখীরাও সেখানে উঠতে পারে না। দেবতাদের বিমান সে স্থানে অবতরণ করে। তোমরা সেখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। জরাসন্ধ যদি সেখানে তোমাদের আক্রমণ করে, তবে তাকে নিশ্চিত পরাজয় বরণ করতে হ'বে। কারণ শৈল-যুদ্ধ সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞ। তাছাড়া সে শৃঙ্গ এতই ঋজু যে, শৃঙ্গে আরোহণ করা খুবই কষ্টকর। ওঠার পথ একটা আছে বটে, তবে খুবই সংকীর্ণ ও বনাকীর্ণ। জরাসন্ধের আগমনের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কাজেই তোমরা সেখানে চল। আমার আশ্রমের হোমধেনু কামদুঘার অমৃতময় দুগ্ধ পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে আমাকে অনুসরণ কর।

অনন্তর কৃষ্ণ-বলরাম কামদুঘার দুগ্ধ পান ক'রে নবোদ্যমে জমদগ্নি-পুত্র পরশুরামের সঙ্গে গোমন্ত-পর্বত অভিমুখে যাত্রা করলেন। পরশুরাম পথ-প্রদর্শক। তাঁরা তিন জনে সন্তরণ-পূর্বক বেনানদী পার হয়ে অতি রমণীয় যজ্ঞ-গিরিতে উপস্থিত হলেন। সেখানে একরাত্রি বাস করে তাঁরা খট্টাঙ্গী নদী পার হয়ে গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হলেন। পথে কয়েক দিন অতিবাহিত করে তাঁরা গোমন্ত পর্বতে উপস্থিত হলেন। এই পর্বত লতাকুঞ্জ ও নানা বৃক্ষ-শোভিত এবং চন্দন, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত। মধ্যে মধ্যে মনোহর ময়ূরগণ বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। আকাশে মেঘের সমাবেশ দেখে মত্ত ময়ূর-ময়ূরী

---

* বেনা নদী, খট্টাঙ্গী নদী, মনে হয়, কৃষ্ণার উপনদী।

পুচ্ছ বিস্তার করে নৃত্য করছে। তাদের কেকা রবে বনস্থলী মুখরিত।* পাখীর কূজনে গিরিবর শব্দায়মান। মধ্যে মধ্যে গুহাবিবরে জল-প্রপাতের গভীর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সানু-দেশে নির্ঝরিণী কল্‌কল্‌ শব্দে বয়ে যাচ্ছে। তমাল, এলাচ, মরিচ, বেত্র, ইংগুদ**, আম্রাতক, শাল, নিম্ব, অর্জুন, হিন্তাল, জম্বু, অশোক, বিল্বাদি বিবিধ বৃক্ষে বনরাজি শোভিত। মৃগযূথ ও বিভিন্ন বন্য প্রাণী স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করছে। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপ্রাণী ও মাতঙ্গের গর্জনে বন সকল প্রতিধ্বনিত।

কৃষ্ণ, বলরাম ও পরশুরাম সেই পর্বত পাদদেশে উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে গোমন্ত শৃঙ্গে আরোহণ করতে লাগলেন; অবশেষে শৃঙ্গদেশে উপস্থিত হলেন।

পরশুরামের নির্দেশমত কৃষ্ণ-বলরাম সেখানে বাসোপযোগী একখানি কুটির নির্মাণ করলেন এবং তিন জনে সেই কুটিরে বাস করতে লাগলেন। আহারের নিমিত্ত বনফল সংগ্রহ করে তিন জনেই তদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে লাগলেন। অবসর সময়ে মুনিবর তাদের শৈলযুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
গোমন্তক যুদ্ধ

এদিকে জরাসন্ধ তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে সহ্যাদ্রির পূর্ব প্রান্তে এসে উপস্থিত। অগ্রবর্তী অশ্বারোহী সৈন্যদলের সঙ্গে জরাসন্ধ নিজে ছিলেন। হঠাৎ ঝরনার ধারে দু'টি অশ্বকে বিচরণ করতে দেখে তারা সেখানে গতি মন্দীভূত ক'রে অশ্ব দু'টির

---

* সময়টি বর্ষাকাল বলেই অনুমিত হয়।

** কণ্টক যুক্ত তাপসতরু; এর বীজ থেকে তৈল পাওয়া যায়।

নিকটবর্তী হোল। জরাসন্ধের সঙ্গে চেদিরাজ দমঘোষ ছিলেন। তিনি বললেন,—'এ অশ্ব দু'টি নিশ্চয়ই কৃষ্ণ ও বলরামের। তারা এখানে কোথাও আছে।'

জরাসন্ধ বললেন,—'অশ্ব দুটি যদি তাদেরই হয়, তবু আমি বলতে পারি—তারা আশেপাশে কোথাও নেই। কারণ কৃষ্ণের বুদ্ধির পরিচয় যতটা পেয়েছি, তাতে এতটা বোকামি তারা করবে না। বরং শত্রুপক্ষকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্য নিয়েই অশ্ব দু'টিকে এখানে ছেড়ে অন্য কোথাও তারা লুকিয়েছে। সহ্যাদ্রির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গোমন্তক গিরিশৃঙ্গ। আরও ছোট বড় শৃঙ্গও অনেক আছে। সবগুলি শৃঙ্গই অনুসন্ধান করতে হবে। বিভিন্ন শৃঙ্গ খোঁজ করতে করতে গোমন্তের দিকে যাবার জন্য সব সৈন্যদলকে নির্দেশ দিন।'

তখন বিভিন্ন সৈন্যদল বিভিন্ন শৃঙ্গাভিমুখে ছুটল। শেষপর্যন্ত গোমন্তক গিরির পাদদেশে এসে জরাসন্ধের সকল সৈন্যদল সমবেত হোল। ঋজু-পৃষ্ঠ গোমন্তক শৃঙ্গের উপবিভাগ বৃক্ষবিরল; কাজেই পাদদেশ থেকেও সে স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। হঠাৎ পাদদেশ থেকে সেই শৃঙ্গে ক্ষুদ্র মনুষ্যাকৃতি বিন্দুর ন্যায় কি যেন দেখা গেল। তখন সৈন্যদলে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল। জরাসন্ধ, দমঘোষ ও অন্যান্য সেনাপতিগণও নিশ্চিত হোল—ঐ বিন্দু দু'টি মনুষ্যই বটে। তখন ঐ পর্বতের চতুর্দিকে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করে ঐ দিনের মত সকলে সেখানে বিশ্রাম করতে লাগল। ভোর হলেই শৃঙ্গে আরোহণ শুরু হবে।

কৃষ্ণ-বলরাম ওপর থেকে প্রায় সবই লক্ষ্য রাখছিলেন। আগামী ভোরেই যে তারা আক্রমণ করবে,—এ বিষয়েও তারা নিশ্চিত হলেন। পরশুরামের পরামর্শে অনেকগুলি শিলাখণ্ডের* অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে রাখলেন।

---

* চাঙড়

ভোরবেলা থেকেই জরাসন্ধের সৈন্যদলে যুদ্ধোদ্যোগের পরিবেশ দেখা গেল। তীরন্দাজ সৈন্যরা পর্বতের পাদদেশ থেকেই চূড়ার দিকে তীরনিক্ষেপ করতে লাগল। দেখা গেল—তীরগুলির কোনটিই চূড়ায় পেঁছায় না। তখন সৈন্যদের পর্বতারোহণের আদেশ দেওয়া হোল।

কৃষ্ণ-বলরাম সবই লক্ষ্য রাখছিলেন। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু পথ ধরে যখন পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী সৈন্যদল অনেক আয়াসে শৃঙ্গে ওঠার চেষ্টা করছে, তখন কৃষ্ণ-বলরাম শৃঙ্গ থেকে ভারী ভারী শিলাখণ্ড সেইপথে গড়িয়ে দিচ্ছেন। ফলে আরোহণ-রত সব সৈন্যদল সেই প্রস্তরের আঘাতে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে যাচ্ছে আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। জরাসন্ধ প্রমাদ দেখলেন। এই সময় চেদিরাজ দমঘোষ জরাসন্ধকে পরামর্শ দিলেন,—'মহারাজ। পাহাড়ের ওপরে ওঠবার প্রয়োজন নেই, গোমন্তকের এই শৃঙ্গ-মূলে পর্বতের চার দিকে আগুন ধরিয়ে দিলে কৃষ্ণ-বলরাম পালাবার পথ পাবে না। হয় তারা আগুনে পুড়ে মরবে, নয়তো আমাদের হাতে ধরা পড়বে। জরাসন্ধ দমঘোষের এ পরামর্শ খুবই সময়োপযোগী ভাবলেন এবং সৈন্যদের সেইমত শুকনো ডালপালা, খড়কুটো সংগ্রহ করে পর্বতগাত্রে চারদিকে স্হাপনকরে অগ্নি-সংযোগের আদেশ দিলেন। যেমন কথা, তেমন কাজ। সে এক ভয়ংকর অবস্হার সৃষ্টি হোল।

প্রথমে চারদিকের ধূম্রকুণ্ডলী পর্বতস্হলী অন্ধাকারাচ্ছন্ন করে ফেলল। তারপর আগুনের শিখা দেখা যেতে লাগল। সরীসৃপ ও বিভিন্ন বন্য প্রাণী ত্রাসে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। অনেক হিংস্রপ্রাণী শৃঙ্গের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কৃষ্ণ-বলরাম প্রস্তরাঘাতে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করছেন। বলরাম এই সময় ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণকে বললেন,—'কানু আমাদের জন্যই আজ এতগুলি জীব প্রাণ

হারাতে বসেছে ; এর পাপের দায় আমাদেরই। এ অবস্থা চোখে দেখা যায় না। চল, এখনই আমরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

বলরাম উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে একটু ধৈর্য ধরতে বলে পরশুরামের নিকট কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। পরশুরামও এই পরিণতির কথা পূর্বে ভাবতে পারেন নি। তিনি চিন্তাকুল চিত্তে কৃষ্ণকে বললেন,—'শোন, মানুষ চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু দৈবানুগ্রহ না থাকলে চেষ্টা ফলবতী হয় না।—একটু ভাবতে দাও।'

তিনি তখন ধ্যানস্থ হলেন। কৃষ্ণ-বলরাম পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হলে স্মিতমুখে তিনি বললেন,—'কৃষ্ণ তোমারই জয়।'

কৃষ্ণ-বলরাম বিস্মিত নেত্রে মুনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আর ভাবনা নেই, দৈব তোমার সহায়। একটু ধৈর্য ধর। প্রবল বারিপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাতে শুধু অগ্নি-ই নির্বাপিত হবে না, জরাসন্ধের সৈন্য-সামন্ত ও খাদ্য-সম্ভার সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

সত্য-সত্যই কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা সহ্যাদ্রি-অঞ্চলে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল ; চারদিকে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো : কর্ণ-বধির-করা মেঘের ভীষণ গর্জন শুরু হোল ; তারপরেই শ্রাবণের প্রবল বারিধারা সমস্ত পাহাড় ও বনস্থলীকে প্লাবিত করতে লাগল। পর্বত-শৃঙ্গে তিন জন মনুষ্য-সন্তান—একজন জটাজুটধারী ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, আর দু'জন নবীন তাপস ;—সাময়িক আশ্রয়-স্থানটি বাসের অযোগ্য হওয়ায় একটি বৃহৎ শিলাখণ্ডের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে সেই নিশ্ছিদ্র বৃষ্টিধারা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে লাগলেন।*

---

* ভারত-মহাসাগর ও পশ্চিমসাগর থেকে উত্থিত জলবাহী বায়ু সহ্যাদ্রির

ভোরের আলো যখন ফুটল, তখন সমস্ত পাহাড় ও বনপ্রকৃতি যেন সদ্য-স্নাতা পূজারিণীর ন্যায় পূজার থালা হাতে নিয়ে পূর্বদিগন্তের পানে তাকিয়ে রয়েছে নবীন সূর্যের উদয়-সম্ভাবনায়।

অপরদিকে যে বিপর্যয় ঘটে গেল, তা অভাবিত ও অকল্পনীয়। জরাসন্ধের সমস্ত সৈন্যবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

দমঘোষ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁর রথ নিয়ে বেশ কিছুটা দূরে বিপন্মুক্ত স্থানে অপেক্ষা করছিলেন। এই বিপর্যয়ের জন্য তিনিও মর্মাহত। জরাসন্ধের অবশিষ্ট যে অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল, তাদের নিয়ে তিনি স্বদেশাভিমুখে রওনা হলেন। দমঘোষ জরাসন্ধকে বললেন,—'মহারাজ! আপনি যান, আমি একবার শেষ চেষ্টা করব।'

গোমন্তক শৃঙ্গ থেকে কৃষ্ণ-বলরাম পাদদেশের অবস্থা অবলোকন করছিলেন। তাঁরা বন-ফল সংগ্রহ করে পরশুরামকে আহার করালেন এবং নিজেরাও আহার করলেন।

পরশুরাম বললেন,—'বৎস, এখন তোমরা বিপন্মুক্ত। আর আমি অপেক্ষা করব না। আমাকে শূর্পারকে যেতে হবে। তবে যাবার আগে তোমাদের জন্য কিছু দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করতে চাই। আমার জানা আছে—দেবতারা এখানে এই গোমন্তক শৃঙ্গে অনেক ভীষণ যুদ্ধাস্ত্র সঞ্চিত রাখেন; প্রয়োজনবোধে তাঁরা তা এখান থেকে বিমানপথে নিয়ে যান।'

এই বলে কৃষ্ণ-বলরামসহ তিনি শৃঙ্গোপরি পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কিয়ৎকাল পরে গুহার ন্যায় একটি গহ্বরে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র সঞ্চিত আছে দেখা গেল।

তখন পরশুরাম বললেন,—'শৈলযুদ্ধে তোমাদের কোন অস্ত্র

পশ্চিম ও পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে উত্তরদিকে বইবার সময় বৃষ্টিপাত করতে করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু গোমন্তক শৃঙ্গে বাধা-প্রাপ্ত হয়ে সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়।

প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু এখন তো তোমাদের অশ্ব দু'টিরও কোন খোঁজ পাবে না। কাজেই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দু'একখানা অস্ত্র সঙ্গে রাখা দরকার।' এই বলে পরশুরাম সেই সঞ্চিত অস্ত্রের মধ্য থেকে একটি চক্রাস্ত্র কৃষ্ণকে দিলেন, এবং একটি মুষলাস্ত্র বলরামকে দিলেন। চক্রাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে কৃষ্ণকে বোঝালেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবশ্য তার সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খটি ছিল।

এইবার বিদায়ের পালা। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ভৃগুরামকে প্রণাম করে ছলছল নেত্রে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন। ভৃগুরামের চক্ষুদুটিও শুষ্ক ছিল না। তিনি বাষ্পপূর্ণ নয়নে তাদের মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদ করে বললেন,—'তোমাদের এই শৈল-যুদ্ধের বিপুল জয়ই তোমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনে কৃতকার্য হওয়ার আভাষ দিয়ে গেল। তোমরা সর্বত্র জয়ী হবে। প্রয়োজনবোধে আমাকে স্মরণ কোরো, আমি তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। কারণ মানবকল্যাণ সাধনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তুমি পৃথিবীতে জন্মেছ।'

পরশুরাম অবতরণ করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ-বলরাম আরও দু'তিন দিন শৃঙ্গে অবস্থান করতে লাগলেন। বনের ফলমূল আহার আর প্রকৃতির শোভা দর্শন করতে করতে সেই সু-উচ্চ শৃঙ্গ থেকে ভারতের বিশালত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করতে লগলেন। এই আনন্দধারার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের মনের বিষাদের ছায়া তাঁর হৃদয়ানন্দকে ম্লান করে দিল।—এতবড় ভারত-ভূমিতে যাদবদের জন্য একটু নিরাপদ ঠাঁই মিলবে না?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

করবীরপুর

তিনদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম শৃঙ্গ থেকে অবতরণ করতে লাগলেন।

চেদিরাজ দমঘোষ সামান্য কয়েকজন রক্ষীসহ এ কয়দিন পর্বতের পাদদেশের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কৃষ্ণ-বলরামকে ধরার জন্য। কৃষ্ণ-বলরাম যখন অবতরণ করছিলেন, তখন দমঘোষের দৃষ্টি তাঁরা এড়াতে পারেন নি। তাঁরা যখন সমতলে নেমে এলেন, তখন চেদিরাজ মনে মনে এক নূতন ফন্দী আঁটলেন। কৌশলে কৃষ্ণ-বলরামকে বন্দী করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি রথ নিয়ে তাঁদের দিকে অগ্রসর হতেই বলরাম কৃষ্ণকে ইঙ্গিতে জানালেন —সামনেই শত্রু! আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও।

কৃষ্ণ বলরামকে পেছনে ঠেলে দিয়ে নিজে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

চেদিরাজ রথথেকে নেমে কৃষ্ণের নিকটে এসে বললেন,— 'তুমি ইতিপূর্বে আমাকে বোধহয় দেখ নি, যারজন্য আমাকে চিনতে পারছ না। আমি তোমাদের পরমাত্মীয়া পিতৃস্বসা শ্রুতশ্রবার স্বামী। তোমরা হয়তো আমাকে শত্রু ভেবে নিয়েছ। সেটা খুবই স্বাভাবিক; কেননা তোমরা শয়তান জরাসন্ধের পক্ষ-সমর্থনকারীদের সামিল হয়ে আমাকে যুদ্ধোদ্যোগে এখানে দেখে থাকবে।

কৃষ্ণ-বলরাম পরস্পর পরস্পরের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

দমঘোষ আবার বলতে লাগলেন,—'তোমরা আমাকে যে সহজে বিশ্বাস করতে পারছ না, এতে তোমাদের কোন দোষ দেওয়া যায়

না। কারণ এতকাল তোমাদের আত্মীয় হিসেবে কোন পরিচয় বা ব্যবহার আমার কাছ থেকে পাও নি, বরং তোমাদের শত্রুর দলেই আমাকে দেখেছ। কাজেই কি ক'রে আমাকে বিশ্বাস করবে? তবে এখন বুঝতে পেরেছি যে, আমি জরাসন্ধের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভুল করেছি। হাত না মিলালে অবশ্য আমার রাজ্য কেড়ে নেবার চেষ্টা সে করত; হয়তো আমাকে অনেক দুর্ভোগ ভোগ করতে হোতো। কিন্তু এখন আমি ঠিক করেছি, আর তার সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে থাকবো না। তাই তার সঙ্গে ফিরে না গিয়ে এখানে অপেক্ষা করছি, যদি তোমাদের কোন উপকার করতে পারি।'

দমঘোষ এত কথা বলছেন, কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম কোন কথাই বলছেন না। বলরাম মাঝে মাঝে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে যে ইঙ্গিত করছেন, তাতে বোঝায়—দমঘোষকে তিনি আক্রমণ করতে চান,—কৃষ্ণ মত দিলেই হয়।

কৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলরামকে ধৈর্য ধরতে বলে দমঘোষের দিকে এক পা এগিয়ে বললেন,—'আমাদের কি সৌভাগ্য! এই বিপদের সময় আপনার মত একজন আত্মীয় আমাদের সহায় হলেন।'

দমঘোষ এতক্ষণ যে ভয়টা করছিলেন, অর্থাৎ বলরামের হাব-ভাবে তিনি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন, কৃষ্ণের কথায় সে ভয়টা দূর হোল; তিনি আরও ভাবলেন—তাঁর কৌশল-জালে এদের ফেলতে পারবেন। তখন তিনি বললেন,—'তোমাদের সাহায্য করার জন্যই আমি আমার রথ নিয়ে অপেক্ষা করছি। কাছেই তোমাদের যাদব-বংশের শৃগাল-বাসুদেবের রাজধানী করবীরপুর; সেখানে চল, সেখানে তোমরা নির্ভয় আশ্রয় পেতে পার। আমার রথে করেই তোমাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়ল—পরশুরামের কথা; তিনি শৃগাল-বাসুদেব সম্বন্ধে পূর্বেই তাদের জানিয়েছেন। তবে কি দমঘোষ

তাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে কোন বিপদে ফেলার মতলব আঁটছেন ? দমঘোষকে কৃষ্ণ বিশ্বাস করতে পারছেন না। অথচ মথুরার যাদবদের জন্য উপনিবেশ-যোগ্য স্থান নির্বাচন তার বড় দায়িত্ব। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে তাঁর মন চঞ্চল। তাই দমঘোষের কথায়ই কৃষ্ণ-বলরাম তাঁর রথে উঠে করবীরপুর যাত্রা করলেন।

করবীরপুর পেঁছানোর পর দমঘোষের চেষ্টায় একটি আশ্রয় যোগাড় হোল। সেখানে তাঁরা কিছু দিন বসবাস করতে মনস্থ করলেন। দু'একদিনের মধ্যেই শৃগাল-বাসুদেব জানতে পারলেন—কৃষ্ণ-বলরাম তাঁর রাজ্যে এসে অবস্থান করছে। জরাসন্ধের দূত-মুখে পূর্বেই তিনি জেনেছিলেন,—কৃষ্ণ-বলরাম আশ্রয়ের জন্য দক্ষিণ দেশে পালিয়ে গিয়েছে। তাঁর দেশে গেলে তিনি যেন তাদের বন্দী করেন—এ ইঙ্গিতও তাতে ছিল।

কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে কোন সৈন্য-সামন্ত নেই,—সেকথা জেনে শৃগাল-বাসুদেব তাদের একে একে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করবেন,—এইরূপ মনস্থ করে কৃষ্ণ বলরাম যেখানে আছেন, রথ নিয়ে সেইদিকে চললেন। নিকটে গিয়ে রথ থেকে নেমে প্রথমেই কৃষ্ণকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কৃষ্ণ এটা কখনও ভাবতে পারেন নি। মনে মনে সব ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। কৃষ্ণ হঠাৎ যেন ক্রোধে লাল হয়ে উঠলেন। সঙ্গে যে চক্রাস্ত্র ছিল, তা হাতে নিয়ে শৃগাল-বাসুদেবকে আক্রমণ করলেন। সেই চক্রাস্ত্রের আঘাতে শৃগাল-বাসুদেব ধরাশায়ী হলেন। চারদিকে হাহাকার রব উঠাল। সঙ্গী সৈন্যদল কৃষ্ণের সেই চক্রাস্ত্রের অগ্নিবর্ষী রূপ দেখে আতঙ্কে কম্পিত-স্বরে বলতে লাগল,— 'আমাদের মেরো না।'

কৃষ্ণ তখন তাদের অভয় দিয়ে বললেন,— 'তোমাদের কোন ভয় নেই, প্রভুর অপরাধে ভৃত্যের শাস্তি হবে কেন ? তোমরা তোমাদের প্রভুর সৎকারের ব্যবস্থা কর।'

ইতিমধ্যে রাজ-অন্তঃপুরে এই দুঃসংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে শৃগালের মহিষিগণ বক্ষে করাঘাত করতে করতে ছুটতে ছুটতে এসে শৃগালের মৃতদেহ আঁকড়িয়ে ধরে রোদন করতে লাগলেন। প্রধানা মহিষী রানী পদ্মাবতী নাবালকপুত্র শক্রদেবের হাত ধরে স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন কৃষ্ণ-বলরাম এই শোকাবহ দৃশ্যের সম্মুখে সহানুভূতি সূচক পরিবেশ সৃষ্টি করে বিমর্ষভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। দমঘোষ হতবাক্।

কিছুক্ষণ পর একটু শান্ত হয়ে রানী পদ্মাবতী কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন,—'তুমি আজ বিজয়ী, এরাজ্য এখন তোমার। তুমি রাজ্যের সমস্ত ধনৈশ্বর্যের অধিকারী, আমরাও তোমার অধীন। তোমাকে শুধু অনুরোধ করি—আমার এই নাবালক পুত্রকে মেরো না, ওকে বাঁচতে দাও, আমাদের বাঁচার অধিকার দাও ;—এইটুকু দয়া তোমার কাছে ভিক্ষা চাই।'

কৃষ্ণ বললেন,—'আমি তো আপনার রাজ্য অধিকার করতে আসি নি। আমি এই যাদব-রাজ্যে এসেছিলাম মথুরার যাদবদের জন্য আশ্রয় খুঁজতে। কোন কথা আমার কাছে না জেনেই মহারাজ শৃগাল হঠাৎ আমায় যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং তাতেই এই পরিণতি।'

—তা'হলে তো আপনার কথায় আমি এই বুঝতে পারছি—আপনি আমাদের প্রতি বান্ধবের ন্যায়ই ব্যবহার করবেন। আপনি আমার এই নাবালক পুত্রের প্রতি স্বীয় পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করুন।'

তখন কেশব মৃদু মধুর স্বরে বললেন,—'রাজ মহিষি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। নৃপতি শৃগালের দুর্বিনীত ব্যবহারে আমি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। তাঁর মৃত্যুতে সব ক্ষোভ অপনোদিত হয়েছে। এখন আমি আপনার অকৃত্রিম বান্ধব। আপনার পুত্র

আমার পরম স্নেহের পাত্র। করবীরপুরের সিংহাসন তাকেই প্রদান করলাম। আমি নিজে তার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করব। আপনি রাজ-পুরোহিত, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজপদাধিকারী এবং প্রজাদের আহ্বান করুন।'

কৃষ্ণের এই উদারতায় উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হ'ল। শক্রদেবের অভিষেক বার্তাও অতি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শৃগাল-বাসুদেবের অনুগত ও মিত্র নৃপতিগণ শৃগালের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

তখন কৃষ্ণ সমবেত জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,—'আমি পররাজ্য জয় করতে আসি নি, আমি এসেছি আপনাদের বন্ধুত্ব অর্জন করতে। নৃপতি শৃগালের মৃত্যু একটি আকস্মিক ঘটনা। এর জন্য কেউ দায়ী নয়। তাঁর রাজ্য গ্রাস করতেও তাঁকে বধ করি নি। তাঁর অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই এই দুঃখ-জনক পরিস্থিতি। পররাজ্য গ্রাসের নীতি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি গ্রহণে আমি আগ্রহী। একমাত্র এই নীতিতেই দেশে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে। আমি আপনাদের সকলের উপস্থিতিতে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী নাবালক শক্রদেবকেই রাজপদে অভিষিক্ত করছি।'

তখন চারদিক্ থেকে 'সাধু' 'সাধু' ধ্বনি উঠল। শোকসভা আনন্দোৎসবে পরিণত হোল।

এই সময় রানী পদ্মাবতী ঘোষণা করলেন,—'আমি সর্বান্তঃকরণে এই মহান্ বীরের নীতিতে বিশ্বাস করি এবং এখন থেকে সেই নীতিই অনুসরণ ক'রে চলব।'

তখন কৃষ্ণ সকলকে শৃগালের মৃতদেহ রাজ-সম্মানে সৎকারের জন্য আহ্বান জানালেন।

শৃগালের সৎকারের পরদিন কৃষ্ণ-বলরাম যাত্রার জন্য প্রস্তুত

হলেন। রানী পদ্মাবতী তাঁদের আরও কিছুদিন করবীরপুরে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ জানালেন—মথুরার যাদবদের জন্য তিনি খুব উদ্বিগ্ন। কাজেই বর্তমানে এখানে কালযাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তিনি রানীকে আশ্বাস দিলেন, যখনই প্রয়োজন হবে, তাঁকে আহ্বান করলে তিনি তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

রানী পদ্মাবতী যতই কৃষ্ণের সহিত বাক্যালাপ করছেন, ততই তিনি মুগ্ধ হচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণকে খুব আপনজন বলে তাঁর মনে হচ্ছে এবং ক্রমশঃই কৃষ্ণের অনুরক্তা হচ্ছেন।

যাত্রার সময় উপঢৌকনের বহর দেখে কৃষ্ণ-বলরাম অবাক্। নিকটবর্তী বিভিন্ন রাজ্য থেকেও শ্রীকৃষ্ণের সম্মানে নানা মূল্যবান্ উপহার এসেছে। বহু দ্রুতগামী অশ্ব ও রণ-হস্তী এবং রণ-সম্ভার, দক্ষিণ দেশীয় শিল্প-নৈপুণ্যের নিদর্শন-স্বরূপ বহু মূল্যবান্ বস্ত্র ও কারুকার্য খচিত নানা দ্রব্য ও রত্নালঙ্কার। রানী পদ্মাবতী দিয়েছেন কয়েকটি যুদ্ধ-রথ ও শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের জন্য বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী চতুরশ্ব যুক্ত রত্নখচিত সুবর্ণমণ্ডিত এক সুদর্শন রথ। সেই সঙ্গে নানা মণিরত্ন ও হীরক-খচিত মুকুট এবং নানা অলঙ্কার ও মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভার।

এই সব উপঢৌকনের বিপুল আয়োজন দেখে কৃষ্ণ-বলরাম সত্যই বিস্মিত। তখন কৃষ্ণ চিন্তা করতে লাগলেন,—বর্তমানে এই সব রণ-সম্ভার, হস্তী, অশ্ব, রথ কিছুই তাঁদের সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বাসস্থান নির্দিষ্ট না হচেছ, ততক্ষণ পর্যন্ত এ-গুলি কি করা যায়? অথচ—এই সকল দান-উপহার ভবিষ্যতে তাঁর বিশেষ কাজে লাগবে। তাই কৃষ্ণ রানী পদ্মাবতীকে বললেন,—'আজ আপনারা আমাদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করলেন, তাতে আমরা খুবই মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ। তবে আপনাকে একটি অনুরোধ করব,—বর্তমানে আমি মথুরার

যাদবদের জন্য নির্বিঘ্ন বাসস্থান অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তাই সহজ বহনযোগ্য কিছু দ্রব্যাদি ছাড়া উপঢৌকনের অন্যান্য সবকিছু— হস্তী, অশ্ব, রণসম্ভার, রথ প্রভৃতি আপনার রাজধানীতে আপনার তত্ত্বাবধানে রেখে যেতে চাই। আপনার স্নেহের দান হিসেবে আমাকে আপনি যে রথখানা দিয়েছেন—সেটি, আমার দাদা বলরামের জন্য আর একখানা রথ এবং সহজ বহনযোগ্য কিছু উপহার এখন আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার তত্ত্বাবধানে-রাখা উপঢৌকনাদি সময় ও সুযোগ মত আমি গ্রহণ করবো।

রানী পদ্মাবতী আনন্দের সহিত সম্মতি জানালেন।

এইবার বিদায়ের পালা।

শ্রীকৃষ্ণের মধুর ব্যবহারে রাজপুরুষ থেকে আরম্ভ করে প্রজা-সাধারণ পর্যন্ত নর-নারী সকলেই প্রীত ও মুগ্ধ। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিতে সকলের অন্তরেই যেন একটু ব্যথার কাঁটা ফুটল, আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটল আঁখি কোণের অশ্রু বিন্দুতে।

স্বামী-হন্তা হয়েও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসাধারণ মহত্ত্বগুণে রাজ-মহীষীদের প্রীতিভাজন হয়ে উঠলেন। তাই বিদায়-ক্ষণে সকলেই বাষ্পাকুল নেত্রে বলেছিল,—'আবার এসো!'

শ্রীকৃষ্ণের কথামতই সব ব্যবস্থা হোল। রানী পদ্মাবতীর-দেওয়া পৃথক্ দু'টি রথে কৃষ্ণ-বলরাম রওনা হলেন। তাঁদের সঙ্গে গেল সহজ বহনযোগ্য মণিরত্ন, হীরা-জহরতাদি মূল্যবান্ দ্রব্য-সম্ভার। দমঘোষ সব দেখে-শুনে একেবারে বোবা বনে গিয়েছেন। তিনি শুধু নীরবে তাঁর রথ নিয়ে কৃষ্ণ-বলরামের অনুসরণ করে চললেন। করবীরপুর থেকে তাঁদের রথ পশ্চিমদিকে গিয়ে পশ্চিম-সাগরের উপকূলের সমতল পথ ধ'রে উত্তরদিকে সুপারকের দিকে ছুটল।

সুপারকে পেঁীছিয়ে পরশুরামের খোঁজ করলেন তাঁরা। কিন্তু দেখা হোল না। তখন দমঘোষ বললেন,—'তাহ'লে এবার চল

মথুরার পথে, তোমাদের সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে আমার রাজধানী শক্তিমতিপুরে যাত্রা করব।'

দমঘোষের কথায় কৃষ্ণ বিরক্ত হলেন। সেই সঙ্গে তাঁর কল্পনাতীত নির্লজ্জ মনের পরিচয় পেয়ে অবাক্‌ও হলেন। কৃষ্ণ দমঘোষের এইরূপ কুচক্রী মনের পরিচয় পেয়েও ধৈর্য ধরে তাঁকে সহ্য করে যাচ্ছেন এই জন্য যে, এখন তিনি যাদবদের জন্য স্হান সংগ্রহ না করা পর্যন্ত নূতন কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন না। শৃগাল-বাসুদেবের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন ; দমঘোষ তার ফল স্বচক্ষে দেখেও তাঁর শিক্ষা হয় নি। আবার তিনি তাঁদের মথুরা যাবার উপদেশ দিচ্ছেন, যেখানে তাঁর পুত্র শিশুপাল মথুরা অবরোধ করে রেখেছে এবং কৃষ্ণ-বলরামকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতে বসে আছে। দমঘোষের মত নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক মানুষও সংসারে আছে! মুখে তাঁদের আত্মীয় বলে তিনি বার বার প্রকাশ করছেন, আর তাঁদের বিপদে ফেলার জন্য মনে মনে ফন্দী আঁটছেন! এ রকম আত্মীয়ও মানুষের থাকে ?

কৃষ্ণ এইবার দমঘোষকে বললেন,—'আমাদের সাহায্যের জন্য আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আপনি এখন রাজধানীতে চলে যান। প্রয়োজন হলে তখন আপনার শরণাপন্ন হবো।'

কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে দমঘোষ যেন হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব সময় তোমাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবো।

আর বেশী কথা বলার সাহস নেই দমঘোষের। তাই তিনি কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গ ছেড়ে নূতন কৌশলের কথা ভাবতে ভাবতে আপন গন্তব্য স্হানের দিকে যাত্রা করলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বারাবতী

কৃষ্ণ-বলরাম উত্তর দিকে রওনা হলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা সৌরাষ্ট্রে এসে পেঁাছিলেন। মথুরা থেকে বের হয়ে কৃষ্ণ-বলরাম ভারতের যে সকল অঞ্চল পরিভ্রমণ করলেন, তাতে তাঁরা দেখতে পেলেন—সমস্ত রাজ্যই ঘন বসতিপূর্ণ। তাছাড়া তাঁদের আশ্রয় দেবার মত মনোভাবও বিশেষ কারও নেই। এর আর একটি কারণ তিনি অনুমান করেছিলেন,—ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই জরাসন্ধের তাবেদার; জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের সংঘর্ষের কথা সকলেই জানে; কাজেই আর্যভূমিতে যাদবদের জন্য স্থান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। তাই রৈবতক পাহাড়ের পশ্চিম দিকে সমুদ্র তীরবর্তী যে কুশস্থলী, যা পতিত জলাভূমি, যেখানে লোকবসতি নেই বললেই চলে। সে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা যায় কিনা কৃষ্ণ সেই চিন্তা করতে লাগলেন এবং দু'চার দিন আরও অনুসন্ধান ক'রে জানতে পারলেন—এই কুশস্থলীর পশ্চিম দিকে পশ্চিম সাগরে একটি নূতন দ্বীপ দেখা দিয়েছে, সেখানে জনবসতি এখনও বিশেষ গড়ে ওঠে নি। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু দেখা যায় কাশবন আর আগাছার জঙ্গল। আর্যদের দ্বারা উৎখাত-হওয়া কিছু অনার্য পরিবার সেখানে অস্থায়ী ভাবে বসবাস করছে। তিনি আরও জানতে পারলেন,—আর্য-কুলোদ্ভব কোন পরিবার সেখানে নেই; তাই ঐ দ্বীপটি অনার্য-ভূমি-রূপেই এখন চিহ্নিত হয়েছে। নাম দ্বারাবতী। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে এই দ্বীপটি বিচ্ছিন্ন। শুধু এই জলাভূমির কুশস্থলী মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপটির যোগ-সূত্র রক্ষা করছে। যে সমস্ত অনার্য-পরিবার সেখানে বসবাস করে,

মূল ভূখণ্ডে আসতে হলে তাদের এই কুশস্থলী অতিক্রম করতে হয়। ঐ দ্বপটি সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে জানার জন্য কৃষ্ণের খুবই কৌতূহল। কারণ দ্বাদশ ক্রোশ দীর্ঘ এবং দশ ক্রোশ প্রশস্ত এই দ্বীপটির অবস্থান এমনই যে, এর প্রায় চতুর্দিক্ সমুদ্র-জল-বেষ্টিত, যা স্বাভাবিক পরিখা-রূপে দ্বীপটিকে বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। সেই জন্য কৃষ্ণ-বলরাম এই পাহাড়ের পাদদেশ-অঞ্চলে রথ নিয়ে পরিভ্রমণ করে কিছু লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঐ দ্বীপটির সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই অঞ্চলের লোকেরা কেউই আর্য-বংশ-সম্ভূত নয় এবং অধিকাংশই দারিদ্র্য-পীড়িত। তাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে এবং কর্ম সংস্থানের আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম তাদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাদেরই সাহায্যে দ্বীপবাসী অনার্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে সক্ষম হলেন কৃষ্ণ। সেই দ্বীপে বসবাসকারী অনার্যদের মধ্যে কিছু নিপুণ গৃহ-নির্মাণকারী লোকও ছিল। তাদের সঙ্গে কৃষ্ণ যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হলেন। তাদের আশ্বাস দেওয়া হোল—দ্বীপবাসী কেউই বাস্তুচ্যুত হবে না, বরং পরিকল্পনা-মত স্থায়ী ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে দেওয়া হবে এবং কর্ম-সংস্থানের সুবন্দোবস্ত করা হবে। এখন থেকেই তারা যেন দ্বীপের বন-জঙ্গল, আগাছা প্রভৃতি নির্মূল করে নগর স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। তার জন্য কৃষ্ণ তাদের আগাম অর্থ সাহায্য দিলেন। অনার্যদের সঙ্গে কৃষ্ণ যতদূর মিশেছেন, তাতে তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, এরা বিশ্বাস ভঙ্গ করে না।

আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই,—যে অনার্যগণ আর্যদের অবিশ্বাসের চোখে দেখে, কৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাদের সেই অবিশ্বাস বা ভয়ের ভাব থাকে না। কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের জন্যই হোক্ বা উদারতার জন্যই হোক্, (নিজেদের আর্থিক দুর্বলতার জন্যও হতে পারে) কৃষ্ণকে তারা বিশ্বাস করে।

নূতন নগর স্থাপনের জন্য চাই সুদক্ষ স্থপতিবিদ্ এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা। সর্ববিদ্যা-বিশারদ শ্রীকৃষ্ণের এ ব্যাপারেও জ্ঞানের ন্যূনতা নেই। নিজের অধীত বিদ্যার জ্ঞানের সাহায্যে এক আদর্শ নগর স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন তিনি, কিন্তু সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে চাই সুদক্ষ স্থপতিবিদ্ ও সুদক্ষ কর্মী। তাঁর তখন দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মার কথা মনে হোল। তাঁকে কিভাবে পাওয়া যায়, তখন সেই চিন্তা তাঁর মাথায়। একটি প্রবাদ বাক্য চলিত আছে—'যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' এ প্রবাদ বাক্যটি শাস্ত্রকাররা কখন থেকে প্রয়োগ করছেন, জানি না, তবে শ্রীকৃষ্ণের বেলায়ও প্রবাদটি ফলপ্রসূ হোল। বিশ্বকর্মার সঙ্গে তাঁর দেখা হোল। ইতিপূর্বেই বিশ্বকর্মা কৃষ্ণের শৌর্য-বীর্যের কথা শুনেছেন এবং অন্তরীক্ষ-বাসী* দেবগণও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন; কংসকে বধ করে কৃষ্ণ দেবতাদের প্রীতিভাজন হয়েছেন। সেকথাও বিশ্বকর্মা জানেন। তবে যখন শ্রীকৃষ্ণ নূতন নগর স্থাপনের পরিকল্পনার বিশদ বর্ণনা তাঁকে দিলেন, তখন কিন্তু বিশ্বকর্মা এই বিরাট পরিকল্পনা রূপায়ণের অর্থের যোগান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তার কারণ এই পরিকল্পনা রূপায়ণে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণের সে সঙ্গতি কোথায়? মথুরার রাজকোষ তাঁর হাতে নেই, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এখন বাস্তুচ্যুত; সে অবস্থায় কি ক'রে এটা সম্ভব! শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞাই শ্রীকৃষ্ণকে পথ দেখায়। বিশ্বকর্মার মনোভাব তিনি বুঝতে পেরে যেখানে বলরাম তাঁদের দু'খানা রথ নিয়ে অবস্থান করছিলেন, সেখানে বিশ্বকর্মাকে নিয়ে গেলেন। ঐ রথ শ্রীকৃষ্ণের—একথা জেনে বিশ্বকর্মা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আরও অবাক্ করে দিলেন, যখন তাঁর সেই সুবর্ণমণ্ডিত মণি-মুক্তা-খচিত অপরূপ রথের ভেতর তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং ইচ্ছা করেই

* অন্তরীক্ষ=ইলাবৃত্তবর্ষের দক্ষিণাঞ্চল।

রথস্হিত হীরে-মুক্তো, জহরৎ, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি তাঁর দৃষ্টি-গোচরে আনলেন।

বিশ্বকর্মা ও শ্রীকৃষ্ণ রথের ভেতর বসে আছেন, কিন্তু কেউ কোন কথা বলছেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভালভাবেই বুঝতে পারলেন—বিশ্বকর্মার মনে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, এবার মনে হয়, সে সন্দেহ আর নেই।

শ্রীকৃষ্ণই প্রথম কথা বললেন,—'বলুন, দেব-শিল্পী, আমার এই পরিকল্পনা রূপায়ণ সম্ভব হবে কি? ঈশ্বরেচ্ছায় যখন আপনাকে এই সময় এখানে পেয়েছি, তখন আমি খুব আশা করছি,—আমার এ পরিকল্পনা সার্থক রূপ নেবে। বর্তমানে আপনার ন্যায় দক্ষ স্হপতিবিদ্ কেউ নেই। আপনি এ কার্যের ভার নিলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। অর্থের জন্য কোন চিন্তা নেই আপনার। যত অর্থের প্রয়োজন, তা আপনি যথেচ্ছ পাবেন। ঐ দ্বীপে আপনি এমন শিল্প-নিদর্শন রাখবেন, যা ইন্দ্রপুরীর সমকক্ষ হতে পারে। তারপর এই রৈবতকে দুর্গ নির্মাণ করাবো, তারও পরিকল্পনা করে রেখেছি।'

বিশ্বকর্মা শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এই তরুণ যুবকের কাছে এই বষীয়ান্ শিল্পী নিজেকে অতি নগণ্য মনে করতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা শপথ নিলেন,—'তোমার এই পরিকল্পনা রূপায়ণে আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন প্রতিফলিত করার চেষ্টা করব।'

কৃষ্ণ তখন হৃষ্ট চিত্তে বিশ্বকর্মাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ অগ্রিম বেশ কিছু মণি-মুক্তো তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

কৃষ্ণ-বলরাম অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। নগর নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মথুরা প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘদিন মথুরার অবস্থা সঠিক না জানায় কৃষ্ণ-বলরাম মথুরার সংবাদ জানার জন্য এইবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মথুরার যাদবগণও অর্থাৎ উগ্রসেন, বসুদেব, গর্গাচার্যসহ অন্যান্য যাদব-প্রধানগণ কৃষ্ণ-বলরাম বর্তমানে কোথায় কিভাবে আছেন—জানার জন্য নানা ভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কারণ জরাসন্ধ হঠাৎ মথুরার অবরোধ তুলে নিয়েছেন। ফলে শিশুপাল সসৈন্যে মথুরা ত্যাগ করেছে। এই সময় কৃষ্ণের পরামর্শ খুবই প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে মথুরা থেকে বিভিন্ন দিকে দূত প্রেরণ করা হোল।

কিছুদিন পর দু'জন যাদব-দূত সৌরাষ্ট্রে গিয়ে কৃষ্ণ-বলরামের দেখা পেলেন। তাদের মুখে কৃষ্ণ মথুরার অবস্থা জানতে পারলেন। সব জেনে কৃষ্ণ চিন্তা করতে লাগলেন,—গোমন্তক যুদ্ধে জরাসন্ধের যে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কি আবার নূতন ভাবে প্রস্তুতির জন্য কোন নূতন কৌশল অবলম্বন করতে যাচ্ছেন? মথুরায় তাঁর একবার যাওয়া দরকার। কিন্তু দ্বারাবতীতে নূতন নগর স্থাপনের কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে; এখানেও থাকা দরকার। শেষপর্যন্ত মথুরা যাওয়া মনস্থ করে—বলরামকে নগর পরিকল্পনার বিষয়টি পুনরায় ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁকে এখানে রেখে শ্রীকৃষ্ণ রানী পদ্মাবতী-প্রদত্ত দ্রুতগামী চতুরশ্বযুক্ত রথে মথুরা রওনা হলেন।

মথুরা পৌঁছুলে উগ্রসেন কৃষ্ণকে রাজভবনে নিয়ে যেতে চাইলে কৃষ্ণ তাঁর সে প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে পিতৃভবনে গিয়ে উঠলেন এবং জনক-জননীর পাদবন্দনা করে বিশ্রামান্তে পিতা বসুদেবের নিকট বসে প্রায় তিন বৎসর তাঁর অনুপস্থিত

থাকা-কালীন মথুরার একটা পূর্ণ-বিবরণ শুনে নিলেন। এই তিন বৎসর কৃষ্ণ-বলরাম কিভাবে কাটিয়েছেন এবং গোমন্তকযুদ্ধে কিভাবে জরাসন্ধ নাস্তানাবুদ হয়েছেন, করবীরপুর জয়, চেদিপতি দমঘোষের কথা এবং দ্বারাবতী দ্বীপে যাদবদের জন্য নূতন উপনিবেশ স্থাপন ইত্যাদি সব বসুদেবকে জানালেন।

বৃন্দাবনের মা যশোদা ও নন্দঘোষ সম্বন্ধে বসুদেবকে জিজ্ঞেস করাতে বসুদেব কৃষ্ণকে জানালেন, কৃষ্ণ-বলরামের এতদিন কোন সংবাদ না পেয়ে তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন আছেন। কৃষ্ণ তখন বসুদেবকে বললেন,—'আপনি তাঁদের এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। এখন মথুরা অবরোধমুক্ত। জরাসন্ধ কোন নূতন কৌশল অবলম্বন করতেই, মনে হয়, কিছুদিনের জন্য সাময়িক-ভাবে এই অবরোধ তুলে নিয়েছেন। আমি অবশ্য কিছুটা অনুমান করতে পেরেছি। আমার ইচ্ছা—এই সুযোগে মথুরা থেকে আপনাদের মত যাদব-প্রধানরা দ্বারাবতী চলে যান। আপমি সেখানে গিয়ে বলাইদাদাকে এখানে পাঠিয়ে দিন। আপনি নগর-নির্মাণকার্য আরও দ্রুততর করার চেষ্টা করুন। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মাকে নগর-পরিকল্পনার সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। আপনাকেও সে বিষয়ে অবহিত করিয়ে দিচ্ছি। মহারাজ উগ্রসেনের রাজপরিবারের জন্য নগর-মধ্যে অন্তঃস্থলে রাজভবন নির্মাণ করা হচ্ছে ; তার চতুর্দিকে রাজপথ। তারপর রাজ-পথের পার্শ্বে যাদব-প্রধানদের গৃহ। এইভাবে অন্যান্য বিভিন্ন বৃত্তিধারী লোকদের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস-গৃহ নির্মিত হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সুপ্রশস্ত পথ। এই দ্বীপের মাঝখান দিয়ে যে রাজপথ থাকবে, তারসঙ্গে অন্যান্য পথের সংযোগ থাকবে। দ্বাদশ যোজন* দ্বীপটির সীমারেখা। আশাকরি, কাজ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। আপনি অবশিষ্ট কাজ করিয়ে নেবেন।

* যোজন=আট মাইল

ঐ দ্বীপে প্রবেশের একটি মাত্র পথ। রৈবতক পর্বত পশ্চিমদিকে যেখানে সমুদ্রের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে অল্প পরিসর স্থান জলাভূমি ও কুশস্থলী। কাজেই দ্বারাবতী যাদবদের পক্ষে খুবই নিরাপদ স্থান। চতুর্দিক্ সমুদ্র বেষ্টিত; কাজেই এই জলবেষ্টনী স্বাভাবিক পরিখা-রূপে দ্বারাবতীকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। প্রবেশ-পথের মুখে বৈরতকে দুর্গ নির্মাণ করিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হবে।'

পরদিন উগ্রসেনের রাজসভায় কৃষ্ণের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হোল। সে সভায় আচার্য গর্গ, বসুদেব ও অন্যান্য যাদব-প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। গর্গাচার্য কৃষ্ণের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিছু কিছু যাদব-প্রধান অবশ্য মন্তব্য করেছিলেন—সাত পুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে নূতন স্থানে গিয়ে অনিশ্চিত অবস্থায় তাঁরা কি শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারবেন? কৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছিলেন,—'এখানেও তো আমরা সর্বদা জরাসন্ধের ভয়ে শান্তিতে বাস করতে পারছি না,—কখন কি হয়—এই ভয়। সেখানে এ ভয় তো থাকবেই না,—তাছাড়া মথুরা অপেক্ষা দ্বারাবতীতে অনেক বেশী লোকের বাসস্থানের সুযোগ থাকবে। তাতে যাদবদের কর্মসংস্থান-ব্যবস্থার উন্নতি করার সুযোগও থাকবে। যাদবদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমি দ্বারাবতীতে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছি। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

অন্যান্য সকলেই কৃষ্ণের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাঁরা মথুরা ত্যাগের জন্য-প্রস্তুত হতে লাগলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদর্ভ-সংবাদ

যে দু'জন যাদব সৌরাষ্ট্রে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে মথুরার অবস্থা জানিয়েছিল, তাদের প্রতি কৃষ্ণের নির্দেশ ছিল—তারা যেন মথুরা ফেরার পথে বিদর্ভ হয়ে আসে। কারণ কৃষ্ণ অনুমান করেছিলেন গোমন্তক যুদ্ধে পরাজিত রাজন্যবর্গকে নিয়ে জরাসন্ধ সেখানে তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে পরামর্শ করবেন।

কৃষ্ণের অনুমান সত্য। সেই দু'জন গুপ্তচর ছদ্মবেশে বিদর্ভের সংবাদ সংগ্রহ করে মথুরায় ফিরে এসে কৃষ্ণকে প্রতিবেদন নিবেদন করলে,—

'বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিননগরে বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনী রুক্মিণীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গ—দক্ষিণ দেশ থেকে আরম্ভ করে ভারতের উত্তর, পূর্ব—সব অঞ্চলের রাজাই সেখানে নিমন্ত্রিত ; শুধু মথুরাই নিমন্ত্রিত হয় নি। কয়েকদিন পরেই রাজকন্যার স্বয়ম্বর।'

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের মথুরার প্রতি এই অবহেলা কৃষ্ণকে ব্যথিত করল। কিছুক্ষণ চিন্তা করতে করতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। মহারাজ উগ্রসেনের অনুমতি নিয়ে বিনা নিমন্ত্রণেই আগামী কল্য বিদর্ভে যাবেন জানতে—কি অপরাধে মথুরাকে নিমন্ত্রণ করেন নি রাজা ভীষ্মক।

সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দ্রুতগামী রথে করে কৃষ্ণ বিদর্ভে গিয়ে পেঁছুলেন। কৃষ্ণ সেখানে পেঁছুতেই ভীষ্মক ছুটে এলেন। অন্যান্য রাজারাও হকচকিয়ে উঠল। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন—সেখানে রাজন্যবর্গের জন্য শিবির নির্দিষ্ট আছে ; কিন্তু কৃষ্ণের জন্য কোন স্হান নির্দিষ্ট নেই। অরাজা বলেই কৃষ্ণকে এই অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। ভীষ্মক জানালেন—তাঁর পুত্র রুক্মীই এজন্য দায়ী।

তখন ভীষ্মকের দু'ভাই ক্রথ ও কৌশিক লোকজনসহ কৃষ্ণকে নিয়ে কৌশিকপুরে গেলেন এবং সেখানে তাঁদের পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন।

অনিমন্ত্রিত হয়েও কৃষ্ণের বিদর্ভে আগমন অন্যান্য রাজন্যবর্গের অস্বস্তির কারণ ঘটেছে। তাদের ভয়—এই স্বয়ম্বর সভা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। যদি রাজকন্যা রুক্মিণী রাজন্যবর্গের কাউকে বরমাল্য অর্পণ না করে কৃষ্ণকেই অর্পণ করেন, তবে সভায় উপস্হিত সকল রাজাই অপমানিত বোধ করবেন! আবার

শ্রীকৃষ্ণকে মাল্য অর্পণ না করে যদি অন্য কাউকে রাজকন্যা বরমাল্য অর্পণ করে, আর সেটা যদি কৃষ্ণ সহজভাবে গ্রহণ না ক'রে বলপূর্বক রাজকন্যাকে হরণ করে নিয়ে যায়, তাতেও চরম সঙ্কট-মুহূর্ত উপস্থিত হবে। রাজন্যবর্গের মধ্যে এইরূপ জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক নিজেকে খুব বিপদাপন্ন ভাবতে লাগলেন। গোমন্তক যুদ্ধের ভয়ানক পরিণতিতে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সম্বন্ধে রাজন্যবর্গের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, তাতে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে এড়িয়ে চলতে চান। তাই ভীষ্মক ঠিক করলেন,—বর্তমানে রুক্মিণীর সয়ম্বর স্থগিত থাক্। পরে একসময় নূতন করে সয়ম্বরের কথা ঘোষণা করা হবে।

শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিন নগরের সমস্ত পরিবেশ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন, এখন আর নূতন করে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি না করে পরিবেশ শান্ত রাখাই কর্তব্য। তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সহজ হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মককে বললেন,—'এই স্বয়ম্বর সভায় মথুরাকে নিমন্ত্রণ না করে মহারাজ ভীষ্মক ন্যায় কাজ করেন নি। আমি মহারাজের কন্যার স্বয়ম্বরে প্রার্থী হয়ে আসি নি। এসেছিলাম জানতে—মহারাজ মথুরার প্রতি কেন এই অবহেলার মনোভাব দেখালেন। তাই বিনা নিমন্ত্রণেই এখানে এসেছি। এসে বুঝতে পেরেছি মহারাজ ভীষ্মক অনন্যোপায় হয়েই এই কাজ করেছেন। আপনি আপনার পুত্রের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে অন্যান্য রাজন্যবর্গের মনোভাবকে গোপন রাখতে চান। তাঁদের অসন্তুষ্টির ভয়েই আপনি এ কাজ করেছেন। আমি আপনার কন্যাপ্রার্থী নই। এই আমি আপনার রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনি নির্ভয়ে আপনার ইচ্ছামত রাজকন্যার স্বয়ম্বর ব্যবস্থা করুন।'

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মথুরায় ফিরে চললেন। গোপনে কয়েকজন গুপ্তচর সেখানে রেখে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিন নগর ত্যাগ করার পর মহারাজ ভীষ্মক রাজন্য-বর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে স্বয়ম্বরসভা আবার যথা সময়ে ঘোষিত হবে বলে আশ্বাস দিলেন এবং রাজন্য-বর্গকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনার্থে প্রত্যেককে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বিদায় জানালেন।

ভীষ্মকপুত্র রুক্মী এই স্বয়ম্বর সভা বন্ধ হওয়ার জন্য তার পিতার ভীরুতাকেই দায়ী করল। করুষাধিপতি দন্তবক্র এইসময় মহারাজ জরাসন্ধকে বললেন,—'মহারাজ, এই শ্রীকৃষ্ণের বিনাশ না ঘটাতে পারলে কোন সময়েই আমরা নিশ্চিন্তমনে থাকতে পারব না। তার বিনাশের জন্য আমি এক পরামর্শ দিতে চাই। আমি জেনেছি—ম্লেচ্ছ রাজা কাল-যবন যাদবদের অবধ্য। কাল-যবন আপনার অনুগত। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে সৌভপতি শাল্ব নিজ-রাজ্যে যাবার পথে কাল-যবনকে আপনার ইচ্ছা জানালে সে নিশ্চয় মথুরা আক্রমণ করে কৃষ্ণ-বলরামকে বিনাশ করবে অথবা বন্দী করে আপনার নিকট প্রেরণ করবে।'

তখন জরাসন্ধ বললেন,—'ম্লেচ্ছ কাল-যবন অনার্য; তার সাহায্যে এই কাজ কি সমুচিত হবে?'

তখন সকলেই পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। শাল্ব এই সময় বললেন,—'মহারাজ জরাসন্ধের অনুমতি পেলে আমি যবনরাজকে মহারাজের ইচ্ছের কথা জানাতে পারি।'

জরাসন্ধ সভায় উপস্থিত নৃপতিদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন—সকলেই দন্তবক্র ও সৌভপতির ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত। নিজের খুব একটা ইচ্ছা না থাকলেও রাজন্যবর্গের তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

সৌভপতি শাল্ব নিজ রাজ্যে যাওয়ার পথে কাল-যবনের সঙ্গে দেখা করে মহারাজ জরাসন্ধের ইচ্ছার কথা জানালেন। কাল-যবন মথুরা আক্রমণে রাজি হলেন।

এদিকে স্বয়ম্বর সভা বন্ধ হওয়ায় রাজকুমারী রুক্মিণী খুবই অপমানিত বোধ করলেন। তিনি জানলেন—অরাজা কৃষ্ণকে অপমান করার জন্যই এই ঘোষিত স্বয়ম্বর সভা স্থগিত রাখা হয়েছে। রুক্মিনী তখন সহচরীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন,—তিনি কোন রাজা বা রাজপুত্রকে বরমাল্য অর্পণ করবেন না। বরং শ্রীকৃষ্ণ যদি তাকে গ্রহণ করেন, তবে তিনি তাঁকেই বরমাল্য অর্পণ করবেন।

শ্রীকৃষ্ণের গুপ্তচরগণ মথুরায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে যবন আক্রমণের সংবাদ জানালে, শ্রীকৃষ্ণ খুব চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি সভা ডেকে গর্গমুনি, উগ্রসেন, বসুদেব, নন্দ প্রভৃতি প্রধানদের ডেকে সব কথা বললেন। এ সংবাদে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এইবার কৃষ্ণ সকল যাদব-প্রধানদের মুহূর্ত বিলম্ব না করে দ্বারাবতীর পথে রওনা হতে বললেন। আরও বললেন—প্রকাশ্য পথ ধরে না গিয়ে যাতে গা-ঢাকা দিয়ে যাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে। এখন মথুরায় সোনানী-প্রধানরা থাকবেন। যারা যাচ্ছেন, তাঁদের রক্ষী হিসাবে কিছু সৈন্য তাঁদের সঙ্গে যাবে। অন্যান্য সকলকেও কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন।

কৃষ্ণ বসুদেবকে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে বলরামকে খুব তাড়াতাড়ি পাঠাতে বললেন এবং দ্বারাবতীর সমস্ত দায়িত্ব বসুবেবের ওপর অর্পণ করলেন। উগ্রসেন, বসুদেব, গর্গমুনি, নন্দ—সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ফেলে যেতে চাইলেন না। গর্গমুনি মনে মনে জানতেন—এই কাল-যবনকে পরাজিত করা সহজ-সাধ্য নয়। তাই তাঁরা মথুরা ত্যাগ করতে ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা যেন সকলের নিকট আদেশ বলে মনে হোল। কৃষ্ণ বললেন,—'আপনারা আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করবেন না। আমি সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি সেনাপতিগণকে সৈন্য সজ্জিত করতে আদেশ দিচ্ছি। বলাই-দাদা এসে এদের সঙ্গে যোগ দেবেন। আমি নিজে সৈন্য পরিচালনা করব। আপনারা এখনই মথুরা ত্যাগ করুন। প্রজা-সাধারণ

যারা আপনাদের সঙ্গে যেতে চায়, যাক্। কাল-যবনের মথুরায় আসতে এখনও সপ্তাহ কাল সময় লাগবে, মনে হয়। খুব সাবধানে আপনারা গন্তব্য স্থলে চলে যান।

একদিকে মথুরা থেকে লোক অপসারিত হচ্ছে, অন্যদিকে সৈন্য সজ্জার পূর্ণ আয়োজন চলেছে। যারা পিতৃ-পুরুষের অর্জিত সম্পত্তি লাভ করে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছিল, তারা মথুরা ত্যাগে উৎসাহী নয়। তার কারণ ভবিষ্যতের অনিশ্চিত জীবনের প্রতি তারা ভরসা করতে সাহস পাচ্ছে না। এরূপ লোকের সংখ্যা কম নয়; কিন্তু যারা পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করতে ইচ্ছুক নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক জীবনের অবক্ষয় সহ্য করতে সর্বতোভাবে অনিচ্ছুক, তারা মথুরা ত্যাগ করতে খুবই আগ্রহী। তারা অনাগত ভবিষ্যৎকে ভয় পায় না, তারা তাকে জীবন-সংগ্রামে সহায়ক বলেই ভাবে। নিয়তি ও পুরুষকারের অক্ষক্রীড়ার ফলকে তারা হাসি মুখে গ্রহণ করতে সাহস রাখে।

দশম অধ্যায়

কালযবন বধ

বলরাম মথুরায় এসে পেঁাছেছেন। সৈন্যদলের প্রধান দায়িত্ব তাঁর ওপর দিয়েছেন কৃষ্ণ। বলরামের অধীনে অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ সৈন্যদলকে যথাযোগ্য ভাবে সজ্জিত করছেন।

দূরে কাল-যবনের বিপুল বাহিনীর অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণ লোকক্ষয়ে অনিচ্ছুক; তাই কাল-যবনকে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে এক কৌশল অবলম্বন করলেন। একটি কুম্ভে

একটি ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ সর্প রেখে তার মুখ ঢাকনা দিয়ে বেঁধে দূতের হাতে কাল-যবনের নিকট প্রেরণ করলেন। দূতকে বলে দিলেন—সে যেন কালযবনকে কুম্ভটি উপহার দিয়ে বলে—কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে ফল কি হবে—এই কুম্ভটি খুললেই কাল-যবন বুঝতে পারবে।

কালযবন কুম্ভটির মুখ খুলে ভেতরে ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ সর্পটি দেখে বুঝতে পারল—কৃষ্ণ কি বোঝতে চেয়েছেন। তখন কাল-যবনও তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল; ঐ কৃষ্ণ-সর্প-রক্ষিত কুম্ভটিতে তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রা কতকগুলি কালো পিপীলিকা প্রবেশ করিয়ে কুম্ভটি পূর্বের ন্যায় মুখ বেঁধে দূতের হাতে কৃষ্ণের নিকট ফেরৎ পাঠালে। কৃষ্ণ কুম্ভটি খুলে দেখলেন—কৃষ্ণ-পিপীলিকার দংশনে সর্পটির কঙ্কাল শুধু তাতে পড়ে আছে। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন—কালযবন কৃষ্ণকে ভয় করে না, বরং তার সঙ্গে মরণ-পণ যুদ্ধ করবে। কৃষ্ণ তখন বলরাম ও সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি সৈন্যধ্যক্ষকে ডেকে বললেন,—কাল-যবনের মত ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গে নূতন কৌশলে তিনি যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিছু যাদব সৈন্য ছদ্মবেশে কালযবনের সৈন্য-দলে মিশে গিয়ে ওদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে; অন্যান্য যাদব-সৈন্য সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগে তাদের আক্রমণ করবে। কৃষ্ণ নিজে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কালযবনকে আহ্বান করবেন।

কালযবন দূর থেকে দেখতে পেল,—কৃষ্ণ তাঁর সৈন্যদের অনেক পশ্চাতে রেখে একাই অস্ত্রহীন অবস্থায় কালযবনের দিকে এগিয়ে আসছেন। কালযবন প্রথমে ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে পারে নি। পরে বুঝতে পেরে সেও সৈন্যদের পশ্চাতে রেখে কৃষ্ণের দিকে দ্রুত এগিয়ে এসে বললে,— 'এইবার তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হবে। তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করতে চাও। ভালই হয়েছে, তোমাকে আমি পিষে মারব।'—বলেই কালযবন অট্টহাস্য করে উঠল। কৃষ্ণ স্থির হয়ে কালযবনের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে

রইলেন। 'আজ আর তোমার রক্ষা নেই!'—বলেই কালযবন হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণকে ধরতে এলো। কৃষ্ণ বিদ্যুৎ-গতিতে তার আয়ত্বের বাইরে এসে ছুটতে লাগল। কালযবনও তার পশ্চাতে ছুটতে লাগল। কালযবন যেমন শক্তিমান, দেহখানাও তার তেমনি বিপুলাকারের। কৃষ্ণের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে উঠেছে। কৃষ্ণও ছুটছেন, কালযবনও তাঁর পেছনে পেছনে ছুটছে। কৃষ্ণ এইবার তাঁর চির পরিচিত গোবর্ধন পাহাড়ে এসে পৌছুলেন। কালযবনও ঘর্মাক্ত কলেবরে গোবর্ধন পাহাড়ে এসে কৃষ্ণের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। গোবর্ধন পাহাড়ের পথ-ঘাট, গুহা-কন্দর সবই কৃষ্ণের নখ-দর্পণে। মাঝে মাঝে কালযবন কৃষ্ণকে দেখতে পায় না; কিছুক্ষণ পরে হয়তো আবার দেখতে পায়। পাহাড়ী পথে কৃষ্ণ যত সহজে ওঠা নামা করছেন, কালযবন তত সহজে ওঠা-নামা করতে পারছে না। তার ঐ বিপুল দেহ নিয়ে আর যেন ছুটতে পারছে না। একবার কালযবন কৃষ্ণকে ডেকে বললে,—'কৃষ্ণ আর ছুটে পালিও না, ভয় নেই, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।'

এদিকে কৃষ্ণ কালযবনকে পাহাড়ের এমন জায়গায় নিয়ে এসেছেন, যেখান থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে পাচ্ছে না কালযবন। তখন কালযবন কৃষ্ণকে ডেকে বলছে,—'কৃষ্ণ, তুমি কোথায়? তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে পথ দেখাও।'

কৃষ্ণ এবার সেই গুহার অন্য মুখে এসে পড়েছেন। তখন কৃষ্ণ সেই গুহার স্বল্প পরিসর মুখটিতে একটি পাথর চাপা দিয়ে বোরোবার পথটি একেবারে বন্ধ করে দিলেন। যে পথে কালযবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করেছিল, সে পথও সে হারিয়ে ফেলেছে, সেখান থেকে বেরোবার কোন পথই সে খুঁজে পেল না। সেই অন্ধকার গুহায় কালযবন চিরদিনের জন্য বন্দী হয়ে রইল।

কৃষ্ণ এইবার ম্লেচ্ছ যবন-সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতেই তারা অবাক্ বিস্ময়ে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। একা কৃষ্ণকে শুধু

দেখতে পাচ্ছে তারা, তাদের রাজা কালযবনকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কি........

কৃষ্ণ তখন তাদের বললেন,—'তোমাদের রাজা কালযবন আর ইহ-জগতে নেই। তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করে এই স্থান ত্যাগ কর।'

যবন-সৈন্যেরা হতোদ্যম হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে পলায়ন করতে লাগল। যাদব-সৈন্যেরা বলরাম, সাত্যকি প্রভৃতির নেতৃত্বাধীনে গোবর্ধনগিরির অপরদিকে এসে গিয়েছিল। কৃষ্ণের আদেশে যাদব-সৈন্যেরা যবন-সৈন্যদের পরিত্যক্ত অস্ত্র-শস্ত্র, ধনরত্ন প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করল।

ওদিকে মথুরা অবরোধকারী মাগধ সৈন্যেরা কিন্তু যাদবদের অপসরণের কথা জানতেই পারল না। তারা যখন জানল, তখন যাদব-সৈন্য তাদের নাগালের বাইরে। এইভাবে কৃষ্ণ-বলরাম চির-দিনের জন্য সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাঁদের স্বর্ণপ্রসূ প্রিয় জন্মভূমি মথুরা ত্যাগ করে নতুন উপনিবেশ দ্বারাবতীর পথে অগ্রসর হলেন।

নিয়তির এই খেলায় কারও কোন হাত নেই। কংসকে বধ করে মথুরাকে শোষণমুক্ত শান্তির রাজ্যে পরিণত করতে শ্রীকৃষ্ণ যে আশা নিয়ে নূতন পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তা ফলবতী হওয়ার পূর্বেই তাঁকে আবার নূতন রাষ্ট্র-গঠনের কথা ভাবতে হচ্ছে। তাতে তিনি হতাশ হলেন না। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—এই বাণী তাঁর নিজেরই। নিজের জীবনেও তিনি কর্ম-ফলের জন্য ভাবেন নি। নিয়তি তার গতিপথ নিজের মত করেই তৈরী করে যাচ্ছে। সে কারও মুখের দিকে তাকায় না—কারও মনের দিকেও তাকায় না। সে বড় নিষ্ঠুর—

শ্রীকৃষ্ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ

রৈবতক/জরৎকারু/বলরামের বিবাহ

কংস-বধের পর মথুরায় যে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল, এতদিনে তার অবসান ঘটল। যাদবগণ অধিকাংশই দ্বারাবতী চলে এসেছে। দ্বারাবতীর নগর-নির্মাণ-কার্যও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, প্রায় সমাপ্তির পথে। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কৃষ্ণ-বলরাম অবিশ্রান্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন।

দ্বারাবতীতে কৃষ্ণের পরিকল্পনামত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বসতি স্থাপিত হয়েছে। এই সমুদ্রবেষ্টিত নগর দ্বারাবতী বিভিন্ন দেশের বণিক্‌দের ব্যবসায়-বাণিজ্যের আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছে। ফলে দ্বারাবতীর অর্থনৈতিক পরিবর্তন খুব দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। নগরবাসীরা বিভিন্ন উপায়ে তাদের আর্থিক সামর্থ্য শক্ত বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে এবং কৃতকার্যও হয়েছে।

এখন রৈবতকে দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। রৈবতকে শুধু দুর্গ নির্মাণই নয়, এখানে নারায়ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবং যে নূতন সৈন্যদল সংগঠিত হতে চলেছে, তার নাম রাখা হোল 'নারায়ণী সেনা'। এর সদস্যদের অধিকাংশই বৃন্দাবন থেকে আগত আভীর গোপ-সম্প্রদায়ের যুবকদল। তাছাড়া বিলাস-ভবন বা শৈলাবাস নির্মাণ হয়েছে; হয়েছে অতিথিশালা। বহিরাগত কোন ব্যক্তি সহসা দ্বারাবতীতে যাতে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য এই রৈবতকেই আছে অনুমতি-পত্র লাভের একটি কেন্দ্র। বহিরাগত কেউ দ্বারাবতী নগরে প্রবেশ করতে চাইলে, সেখান থেকে অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করতে হবে। দ্বারাবতী-নগরবাসী প্রত্যেকের নিকট এমন একটি স্মারকচিহ্ন থাকে, যা-দ্বারা নগরে প্রবেশ বা নগর-ত্যাগের সময় নিযুক্ত নির্দিষ্ট-নগর-রক্ষীকে সেটা দেখাতে হয়।

কৃষ্ণ দ্বারাবতীর নিরাপত্তার জন্য এইরূপে কিছু কিছু নিয়ম প্রচলন করেছেন।

বিশ্বকর্মা কৃষ্ণের উপদেশ মত ইন্দ্রের দেবসভাতুল্য দ্বারাবতীতেও যাদবদের জন্য এক সভা নির্মাণ করলেন। পুরীর অলংকরণ সম্পূর্ণ হলে রাজকার্যের বিভিন্ন বিভাগ নির্দিষ্ট হতে লাগল। উগ্রসেনকেই মথুরার ন্যায় যাদব-প্রধান-রূপে নৃপতি-পদে বরণ করা হোল। কাশ্যপকে পুরোহিত পদে, এক যাদব-শাখার অনাধৃষ্টিকে প্রধান সেনাপতি পদে, অপর যাদব-শাখার বিকদ্রুকে মন্ত্রী পদে বরণ করলেন এবং যদুবংশের মোট আটটি শাখা থেকে দশজন প্রবীণ যাদব-প্রধানদ্বারা কেশব মন্ত্রী-মণ্ডল গঠন করলেন। সুনিপুণ দারুককে সারথ্য-পদে এবং রণদক্ষ সাত্যকি ও কৃতবর্মাকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন।* তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ও জ্ঞানী কৃষ্ণ-বলরামের শিক্ষাগুরু সান্দীপনি মুনিকে কেশব প্রধান উপদেষ্টা পদে বরণ করলেন।

দ্বারাবতী-বাসী নাগরিকদের মধ্যে জাতি-ভেদের কঠোরতা ছিল না। নগর পত্তনের পূর্বে যে অনার্যগণ সেখানে বাস করত, তাদের প্রতিও কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় নি। গুণ ও কর্মানুসারে কেশব দ্বারাবতীর জনগণকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। যজন-যাজন, যজ্ঞ ও দেবক্রিয়া এবং শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণের কাজে যাঁরা ব্যাপৃত থাকতেন, তারা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হলেন। রাজ্য রক্ষার কাজে এবং সেনাবিভাগের কাজে যারা রত ছিলেন, তাঁরা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষিকার্য প্রভৃতি নগর উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বৈশ্য নামে অভিহিত হলেন। আর যাঁরা সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সেবায় নিযুক্ত থাকলেন, তাঁরা শূদ্র নামে অভিহিত হলেন।**

---

* হরিবংশ।

** চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।

দ্বারাবতীতে কেউ যাতে অন্নকষ্ট না পায়, কেউ দারিদ্র্য-পীড়িত না হয়, তার জন্য কেশব সচেষ্ট হলেন। একদিন হৃষিকেশ কুবেরানুচর অনুদার নিধিপতি শঙ্খকে আহ্বান করলেন। নিধিপতি শঙ্খ যদুপতি* কেশবকে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন কেশব বললেন,—'দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আমার অনুরোধে দ্বারাবতীকে অমরাবতীর ন্যায় সুন্দর করে তৈরী করেছেন। এখন আমার ইচ্ছা—অমরগণ যেমন কখনও আহার্য ও ধনের অভাব বোধ করেন না, তেমনই দ্বারাবতীর নাগরিকগণও যাতে আহার্য ও ধনের অভাব বোধ না করে, তার জন্য আপনি আপনার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে এই নগরবাসীদের যথাযোগ্য ধন বিতরণ করুন।

কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের নিকট সকলেই মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই দেখা গেল। কৃপণ ও দেশাত্ম-বোধহীন নিধিপতি শঙ্খ দরিদ্র যাদবদের জন্য যথাযোগ্য ধন দান করতে লাগলেন। ফলে দ্বারাবতীতে অন্নাভাব বা অর্থাভাব আর রইল না।

এই ভাবে কেশব তার প্রতিষ্ঠিত নব নগরী দ্বারাবতীকে সকল রকমে সমৃদ্ধ করে তুললেন। দ্বারাবতীর নাগরিকগণ মথুরা ত্যাগের দুঃখ ভুলে গেল। গণমুখ্যদের পরিচালিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় মথুরায় যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়ে নিরুপদ্রবে যাদবগণ জীবন অতিবাহিত করছিল, এখানেও তারা তাদের জীবনযাত্রায় কোন দিক্ দিয়ে তার চেয়ে কম সুখী বোধ করে না; বরং তার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনই তারা ভোগ করছে। উগ্রসেন যাদব-প্রধানরূপে নৃপতির আসন অলংকৃত করলেও কার্যতঃ কেশবের সুষ্ঠু পরিচালনায়ই দ্বারাবতীর এত সমৃদ্ধি, যার ফলে নাগরিকগণ নানা-রূপ সুখের অধিকারী হতে লাগল।

কৃষ্ণের সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনায় দ্বারাবতী থেকে সর্বপ্রকার

---

* উগ্রসেন যাদবপ্রধান হলেও, যাদব-কুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকেই সকলে যদুপতি আখ্যা দিয়েছিলেন।

দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক দৈন্য এবং পাপাচার দূরীভূত হয়েছিল। সর্বজন অভিপ্রেত সুনাগরিকদ্বারা নগর পূর্ণ হয়েছিল। সেখানে সমাজ-দ্রোহীদের স্থান ছিল না। সেখানে স্বাস্থ্য-সুখ ও সম্পদের অধিকার-লাভের আনন্দ সকল নাগরিকের অন্তরকে উজ্জ্বল করে রাখত। নাগরিকদের মধ্যে যাতে ধন-বৈষম্যের অসন্তোষ দেখা না দেয়, সেদিকেও কৃষ্ণের প্রখর দৃষ্টি ছিল। দ্বারাবতীতে কোন ভিখারী ছিল না। কৃষ্ণের সুপরিকল্পনায় এখানে বহু জলাশয়, পুষ্করিণী, জলসত্র এবং বহু সুন্দর উপবন নির্মাণদ্বারা দ্বারাবতীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছিল।

দ্বারাবতীর পশুশালায় বহু বিচিত্র ও অদ্ভুদ প্রাণী সংগৃহীত হয়েছিল। সেখানে ছিল চারি-দন্ত-বিশিষ্ট ঐরাবত, শ্বেত হস্তী, নানা-দেশীয় অশ্ব ও গো-সমূহ, দ্রুতগামী শ্বেত অশ্ব ও আরও বহু বিচিত্র প্রাণী।

নানা প্রকার প্রিয়-দর্শন বিভিন্ন বর্ণের পাখীর দ্বারা নগরীর ভবন-সমূহ অলংকৃত ছিল এবং নানা দেশীয় নানা বর্ণের পুষ্পপত্র-বিশিষ্ট বৃক্ষলতাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সর্ব ঋতুতে উৎপন্ন নানাবিধ ফল ও পুষ্পবৃক্ষ রোপণের সুব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণের অনলস চেষ্টায় দ্বারাবতীতে (মাটির পৃথিবীতে) স্বর্গের নন্দন-কানন-জাত পারিজাত বৃক্ষ রোপিত হয়েছিল এবং তাতে পারিজাত পুষ্প প্রস্ফুটিত হোত। তাঁরই চেষ্টায় এই উপনিবেশ-রাষ্ট্র নানা-গুণ-সম্পন্ন সুন্দর নর-নারীর বাস-ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এই ভাবে দ্বারাবতী দেবভূমি অন্তরীক্ষের* ন্যায় এক সুখময় স্থান-রূপে পরিগণিত হয়েছিল।

* * * * *

নগর-উন্নয়ন ব্যাপারে বলরামের ওপর দায়িত্ব দিয়ে সৈন্য-সংগঠন ব্যাপারে মাঝে মাঝে নাগরাজ্যে গিয়ে বাসুকির পরামর্শ গ্রহণ করতেন বাসুদেব। বাসুকির বীরত্ব ও যুদ্ধ-কৌশল সম্পর্কে

* ইলাবৃত্ত বর্ষের দক্ষিণাঞ্চল।

তাঁর গভীর আস্হা ছিল। তাছাড়া বৃন্দাবনে সাক্ষাৎকালে বাসুকিকে তিনি কথা দিয়েছিলেন—তার পিতা তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন,— এই সংবাদে বাসুকির সঙ্গে চিরদিনের জন্য মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ থাকবেন তিনি। এই সময় পাতালপুরীতে* বাসুকির গৃহে যাতায়াত করার ফলে বাসুকি-পরিবারের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তখন বাসুকির কিশোরী ভগিনী জরৎ-কারু বাসুদেবের প্রতি আকৃষ্টা হয় এবং তাঁকে পতিরূপে পাওয়ার জন্যে মনে মনে আশা পোষণ করতে থাকে। বাসুদেবের প্রতি কারুর দুর্বলতা বাসুদেব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মিত্রের ভগিনীকে নিজ ভগিনীর ন্যায়ই স্নেহ করতেন। এই ভাবে তিন চার বৎসর কেটে যাবার পর কারু একদিন বাসুদেবকে তার মনোভাব জানায়। বাসুদেব তখন তাকে জানান— তাঁর সম্মুখে যে কঠোর কর্তব্য, তাতে তিনি বিবাহের কথা ভাবতেই পারেন না। তাছাড়া বাসুকি তাঁর মিত্র, তাঁর ভগিনীকে তিনি নিজ ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করেন।

কারুর মুখখানা হঠাৎ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। বাসুদেবের এই কথায় কারু বুঝেছিল—এটা বাসুদেবের ছলনা। আসলে তার অনার্য-রক্তই বোধ হয় তাদের মিলনের বাধা। তাই কারু বললে,—'প্রথম থেকেই কেন আমাকে জানালে না—অনার্য-কন্যাকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা'হলে তো আমি (কেঁদে ফেলল), এখন যে আমি সব হারিয়ে…'

বলেই কারু মূর্ছিতা হয়ে পড়ল। তখন বাসুদেব তাড়াতাড়ি কারুর মস্তকটি কোলে তুলে নিয়ে শুশ্রূষা করতে লাগলেন! কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে তাকাল কারু এবং বুঝতে পারল— বাসুদেবের কোলে সে শুয়ে আছে। কারু উঠে বসল ; তারপর বললে,— 'এই কি তোমার শেষ কথা ?'

বাসুদেব ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে জল-ভরা চোখে

* সিন্ধু দেশের নিম্ন অরণ্য ভূমি (নবীন সেন)

বলতে লাগলেন,—'আমায় ক্ষমা করো, কারু! তোমার প্রাণ-ঢালা ভালবাসা আমি কখনো ভুলতে পারবো না; আমার দুঃখের দিনে তোমার এই ভালোবাসার স্মৃতি আমাকে সান্ত্বনা দেবে। আমার কর্তব্যের আহ্বান আমায় চঞ্চল করে তুলেছে। এখন হাসি মুখে আমায় বিদায় দাও, বোন!'

বাসুদেব চলে গেলেন। কারু তাঁর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে ছিল। দু'চোখে ঝর-ঝর করে ধারা নেমে এল। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, তার চোখের আর্দ্রতা আর নেই। মনে হোল, অশ্রুবিন্দুগুলি যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসছে। অস্ফুট স্বরে নিজে নিজেই বলতে লাগল—জানো কি, নিষ্ঠুর! একটি নারী-জীবনকে তুমি অবহেলায় নষ্ট করে দিলে? অনার্যার প্রেম যে কত গভীর, যার সুখ-স্পর্শে পেতে সুধাপানের স্বর্গীয় আনন্দ, তা তুমি জানতে পারলে না, প্রিয়তম! কিন্তু এবার জানবে—প্রেমে-বঞ্চিতা অনার্য-নারী কি ভয়ংকরী। অনার্যার প্রতিহিংসা অরণ্যের হিংস্রতাকেও হার মানায়; প্রেমের অমর্যাদাকারী দয়িতকে দংশন করতে দলিতা ফণীনীর ন্যায় সে তাকে খুঁজে বেড়ায়।

জরৎকারু অবসন্ন হয়ে একটি শিলা-খণ্ডে উবু হয়ে চিবুক ঠেকিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল।

*   *   *   *   *

রৈবতকের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হতে কেশব প্রায়ই বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি রৈবতকের পাদদেশে রেবত নদীর তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ স্নানরতা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পেলেন। নিজে তো বিবাহ করবেন না, তাই বলাই দাদার কথা ভাবলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন—এই অঞ্চলের অধিবাসী রেবত-জাতির কন্যা,—নাম রেবতী। কেশব দাদা বলরামকে রাজি করালেন। তখন কন্যার পিতার সহিত যোগাযোগ করে এক শুভদিনে তাঁদের বিবাহ সুসম্পন্ন করালেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রুক্মিণী, জাম্ববতী ও সত্যভামার বিবাহ

কেশব তাঁর মন্ত্রণা-গৃহে বসে গুপ্তচরদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাদের কাছে জানতে পারলেন, মথুরা মগধের আধিপত্য মেনে নিয়েছে। বর্তমানে জরাসন্ধ তাঁর মিত্র রাজন্যবর্গকে নিয়ে বিদর্ভে পুনরায়োজিত স্বয়ম্বর সভায় যোগদানের জন্য যোগাযোগ করছেন। তাঁরই চেষ্টায় এবং বিদর্ভ-রাজপুত্র রুক্মির ইচ্ছা-ক্রমেই চেদী-রাজপুত্র শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহের আয়োজন চলছে। কেশব যখন গুপ্তচরদের সঙ্গে ঐসব আলোচনায় রত, তখন রক্ষী খবর দিল—বিদর্ভ থেকে আগত একজন পুরোহিত কেশবের দর্শন-প্রার্থী। 'বিদর্ভের পুরোহিত' হঠাৎ দ্বারাবতীতে! কেশব তাঁকে সসম্মানে কক্ষে নিয়ে আসার অনুমতি দিলেন।

বিদর্ভ-পুরোহিত সুদেব কোনরূপ ভূমিকা না করেই বললেন,—'এক জরুরী বার্তা নিয়ে আমি বিদর্ভ থেকে এসেছি। যে-সময় হিসেব করে এখানে রওনা হয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লেগেছে এখানে আসতে। তাছাড়া সরাসরি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়,—এ কথাও জানা ছিল না ; প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করে তবে এই দ্বারাবতীতে প্রবেশ করতে পেরেছি।

কেশব বললেন,—'আপনি বিদর্ভ-রাজ-পুরোহিত, আমার অতিথি, আমার সৌভাগ্য ; আপনি পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম করুন, তারপর আপনার বক্তব্য শুনবো।'

পুরোহিত বললেন,—'শুনুন যদুপতি, আমি বিশেষ এক জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছি রাজকন্যা রুক্মিণীর অনুরোধে। কাজেই আমার বিশ্রাম করার পূর্বে আপনি তাঁর প্রেরীত পত্রখানা

পাঠ করুন ; তারপর যথাকর্তব্য নির্ধারণ করব।' এই বলে তিনি একখানি পত্র কেশবের হাতে দিলেন।

কেশব রাজকন্যা রুক্মিণীর পত্রখানা একাধিক বার পাঠ ক'রে—পরে পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন,—'আপনি কি পত্রের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন ?'

—হ্যাঁ, রাজকন্যা আমাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং এই বিপদের মুখে আমাকেই নিতান্ত আপনজন ভেবে এই পত্র দিয়ে দূত-রূপে আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। প্রথমবার যখন ঘোষিত সয়ম্বর-সভা পন্ড হয়, তখন তিনি নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করেন এবং তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, কোন রাজা বা রাজপুত্রকে তিনি বিবাহ করবেন না। তিনি আপনার সম্বন্ধে সব জানেন এবং সেই সময় তিনি আপনাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁর ভ্রাতা রুক্মী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এ অবস্থায় আপনি ছাড়া তাঁকে এ বিপদে কে আর রক্ষা করতে পারে ?

—কিন্তু ব্রাহ্মণ, আমি তো বিবাহ করতে এখনও মনস্থির করি নি। কারণ বিবাহ অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আমার সম্মুখে। কাজেই রাজকন্যা আমাকে পতিত্বে বরণ করে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।

—আপনি যদি তাঁকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক হন, তবে অন্যকে বিবাহ করাও তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ; তিনি মনে-প্রাণে আপনাকেই পতিজ্ঞানে গ্রহণ করেছেন এবং মনে-প্রাণে আপনাকেই ভালবাসেন। এ অবস্থায় আপনি যদি তাঁকে উদ্ধার না করেন, তবে তাঁর আত্মবিসর্জন ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

—কিন্তু তাঁকে বিদর্ভ থেকে সহজে তো নিয়ে আসা সম্ভব নয়। জরাসন্ধ-গোষ্ঠীর রাজন্যবর্গ ও তাঁর ভ্রাতা রুক্মী যেখানে

শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে সচেষ্ট, সেখানে অন্যরূপ কিছু ঘটলেই একটা সংঘর্ষ অনিবার্য।

—রাজকন্যা আপনার সহায়। কাজেই তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে আসা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। আর আপনার মত একজন অজেয় বীর কি সংঘর্ষের ভয়ে একটি অমূল্য নারী-রত্নের জীবন নষ্ট হতে দেবেন? বিশেষতঃ যে নারী আপনাকেই পতিত্বে বরণ করেছেন?

কেশব গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

কেশবকে চিন্তা-নিমগ্ন দেখে সুদেব বলতে লাগলেন,--'যে ব্যক্তিকে রাজকন্যা মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন, সেই শিশুপালকে পতিত্বে বরণ করা অপেক্ষা তাঁর পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ নয় কি?'

কেশব এখন বিবাহের কথা ভাবতেই পারছেন না। অথচ অকামা কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্প্রদান করা শুধু সামাজিক অপরাধ নয়, চরম নিষ্ঠুরতার কাজ। আদর্শ মানুষ এইরূপই চিন্তা করেন।

হঠাৎ তিনি সুদেবকে বললেন,—'ব্রাহ্মণ, আপনি আহারাদি করে বিশ্রাম করুন। দ্রুতগামী রথ আপনাকে বিদর্ভ-সীমান্তে পৌঁছিয়ে দেবে। আপনি রাজকন্যাকে প্রস্তুত থাকতে বলবেন। আমি বিদর্ভে যাচ্ছি।'

—হ্যাঁ, রাজকন্যা আমাকে বলে দিয়েছেন,—তিনি রোজ সকালে মন্দিরে পুজো দিতে যান, সেই সময়—আপনি মন্দিরের কাছাকাছি কোথাও রথ নিয়ে অপেক্ষা করবেন; তিনি সুযোগ মত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে আরও দু একটি কথা বলে তাঁর আহার ও বিশ্রামের এবং রথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাদা বলরামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বলরাম আকণ্ঠ সোমরস পান করে নেশায় চূড় হয়ে নিশ্চিন্ত

আরামে বসে আছেন। পাশেই নব বিবাহিতা রেবতী। কেশব তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতেই নববধূ রেবতী কক্ষান্তরে গেলেন। বলরাম একটু অপ্রস্তুতভাবেই কেশবকে বললেন,—'কানু এসেছিস! এ সময় তো তুই বড় একটা এ মহলে ঢুকিস না,—হঠাৎ?'

— শোন, দাদা, এক খবর পেলাম,—বিদর্ভ-রাজকন্যা রুক্মিণীর আবার স্বয়ম্বর ঘোষিত হয়েছে; সেখানে যাবে তো?

—আমি আর গিয়ে কি করব? একজনের সঙ্গে আমার তো গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিস; আবার সেখানে যাবো কি করতে? তোর যদি রুক্মিণীকে পছন্দ হয়, তুই বিবাহ কর!

— তুমি দেখছি কোন খবরই রাখো না! রুক্মিণীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর দাদা রুক্মী আমাদের পিতৃস্বসা শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহের উদ্যোগ করেছে। আমার ইচ্ছা কি জানো? আমরা সকলে একবার সেখানে গিয়ে দেখি—ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।

—এটা কেমন কথা? তাকে সয়ম্বরা ঘোষণা করার পর তার ইচ্ছামত বরের কণ্ঠে সে মালা দিতে পারবে না?

—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে—শিশুপাল জরাসন্ধের প্রিয়পাত্র; তাই জরাসন্ধ বিদর্ভরাজ ভীষ্মককে অনুরোধ করেছেন—শিশুপালের সঙ্গেই রুক্মিণীর বিবাহ দিতে।

—তা'হলে স্বয়ম্বর সভা ডাকার কি প্রয়োজন ছিল?

—একবার যখন স্বয়ম্বর ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন এবারও লোক-দেখানো স্বয়ম্বরের আয়োজন করা হয়েছে।

—তুই কি রুক্মিণীকে দেখেছিস?

—কেন—বল তো?

—শুনেছি,—রুক্মিণী অপূর্ব সুন্দরী। তোর যদি পছন্দ হয়, তবে আমরা সে মেয়েকে হরণ করে নিয়ে আসবো!

—কিন্তু, সে মেয়ে যে আমাকেই পছন্দ করবে, এমন কথা কি জোর করে বলা যায়?

—কিন্তু সে তো বলেছে—শিশুপালকে সে পছন্দ করে না!

—সে যাক্, তুমি যদি রাজি থাকো, তবে আমরা সেখানে গিয়ে অবস্থা বিবেচনা করে কর্তব্য স্থির করবো।

—বেশ, তাহলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই চল!

আসলে সরল বলদেবকে সব কথা না বলে কেশব দাদার মনোভাবটা জানার জন্যই এইটুকু ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মহারাজ জরাসন্ধ নিজ গোষ্ঠীর রাজন্যবর্গ, যেমন—দন্তবক্র, পৌণ্ড্র বাসুদেব এবং অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ-নৃপতিদের সঙ্গে নিয়ে বিদর্ভে উপস্থিত হলেন। ভীষ্মকপুত্র রুক্মী তাঁদের বিশেষ সমাদরে গৃহে আনয়ন করলেন।

এদিকে কৃষ্ণ-বলরাম বৃষ্ণিদিগকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে বিদর্ভে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সেখানে উপস্থিত হতেই কুণ্ডিনরাজ-ভ্রাতা ক্রথ ও কৌশিক তাঁদের যথাযোগ্য সম্মানের সহিত স্বভবনে নিয়ে গেলেন। পরদিন সকালে রুক্মিণী মন্দিরে পুজো দিতে রথারোহণে বহির্গত হলেন, সঙ্গে রক্ষী-বাহিনী ও অন্যান্য লোকজনও ছিল। সেই সময় কেশব ও বলরাম তাঁকে দূর থেকে দেখতে পান। রুক্মিণী ইতিপূর্বেই সহচরীদের সহায়তায় কেশবের আগমন-সংবাদ জেনেছিলেন। বলদেবের ইঙ্গিতে কেশব রথ নিয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। রুক্মিণী পুজো সমাপনান্তে মন্দির থেকে বহির্গত হতেই কেশব তাঁকে হস্ত-ধারণপূর্বক রথে তুলে বেগে রথ চালনা করলেন। রক্ষিগণ কেশবকে আক্রমণ করতে তাঁর রথের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। বৃষ্ণিগণ তাদের বাধা দিতে লাগল।

এদিকে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। জরাসন্ধ দন্তবক্র, শিশুপাল, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাধিপতি এবং পৌণ্ড্র-বাসুদেবকে নিয়ে সমবেতভাবে বৃষ্ণিদের আক্রমণ করলেন। তখন বৃষ্ণিবীরগণ বলদেবকে সম্মুখভাগে রেখে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল।

কর্ষাধিপতি দন্তবক্রের সহিত অক্রূর, শিশুপালের সহিত বিপৃথু, পৌণ্ড্রের সহিত কৃতবর্মা, অঙ্গরাজের সহিত বলবান্ কঙ্ক যুদ্ধ করতে লাগলেন। বলদেব বঙ্গাধিপতিকে বিনাশের পর মগধপতি জরাসন্ধকে আক্রমণ করলেন। উভয় পক্ষই তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত হোল।

ওদিকে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেছেন শোনামাত্র বিদর্ভ-রাজপুত্র রুক্মী পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করে বললে,—'যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণকে বিনাশ করে রুক্মিণীকে উদ্ধার করতে না পারি, ততক্ষণ আমি বিদর্ভে ফিরব না।'

রুক্মী কৃষ্ণকে ধরার জন্য অতি বেগবান্ রথ নিয়ে ছুটল। নর্মদা নদীর তীরে কৃষ্ণের সঙ্গে তার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হোল। যুদ্ধে রুক্মী সাংঘাতিক ভাবে আহত হোল। রুক্মিণী তাঁর দাদার ঐ অবস্থা দেখে কেশবকে অনুরোধ করলেন—তার প্রাণ ভিক্ষা দিতে। কেশব রুক্মিণীর অনুরোধে রুক্মীকে বধ করলেন না; কিন্তু রুক্মীর দাম্ভিক উক্তির জন্য এবং কৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগের জন্য তার মস্তক মুণ্ডন করে তাকে মুক্তি দিলেন। এইরূপে কেশব শ্যালক রুক্মীর বীর্য-শ্লাঘা এবং আভিজাত্যাভিমান সম্পূর্ণ রূপে চূর্ণ করেছিলেন। কেশব রুক্মিণীকে নিয়ে দ্বারাবতীতে উপস্থিত হোলেন।

ওদিকে বলরামের নেতৃত্বে বৃষ্ণিগণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। জরাসন্ধ-গোষ্ঠী তাঁদের কাছে পরাজিত হয়ে বিষন্নমনে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে লাগল।

এইবার দ্বারাবতীতে রুক্মিণীর বিবাহের আয়োজন চলতে লাগল। এই বিবাহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল অগ্রহায়ণ মাসে। কৃষ্ণের বয়স তখন বাইশ বৎসর চার মাস। এই বিবাহ-উৎসবে কেকয়, বিদর্ভ প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বিবাহের পর রুক্মিণী খুবই সুখী হোলেন। শ্রীকৃষ্ণের

মত স্বামী লাভ করা যে-কোন নারীরই কাম্য। সেদিক থেকে রুক্মিণী খুবই ভাগ্যবতী। বিবাহের পূর্বে যখন তাঁরই প্রেরীত পুরোহিতের মুখে জেনেছিলেন—বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের খুব একটা সম্মতি ছিল না, রুক্মিণীর প্রতিজ্ঞার কথা এবং রুক্মিণীর চিঠির মর্ম ও পুরোহিতের বাচনিক সব কথা জেনে তিনি এ বিবাহে রাজি হয়েছেন, তখন রুক্মিণী মনে মনে ভেবেছিলেন, —তিনি তাঁর রূপ ও যৌবন-দীপ্ত দেহ-সৌষ্ঠব আর ভালবাসা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হবেন। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই যেন হতাশ হতে লাগলেন; শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পারছেন না তিনি। রুক্মিণীর নিকট যে-বিবাহ ছিল স্বপ্নময় সুখ-সদনের সোপান, শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ করে কিছুদিনের মধ্যেই রুক্মিণীর সে ভুল ভাঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণ যে কঠিন বাস্তব-জগতের মানুষ; কর্তব্য-বিচারে সাধারণের সঙ্গে তাঁর বড় একটা মিল নেই। তিনি কোনদিন কারও একার অধিকারের বস্তু নন,—তিনি সকলের। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর এই ধারণা নির্ভুল প্রমাণিত হোলো।

*　*　*　*　*

সত্রাজিৎ ছিলেন যাদব শাখারই একজন; দ্বারাবতীতে এসে মণি-রত্নের ব্যবসায় করতেন। একদিন কোন কারণে কেশব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। সেই সময় সত্রাজিৎ তাঁর মণি-রত্নগুলি ময়লামুক্ত করার জন্য ঘর্ষণ-বস্তুর সাহায্যে সেগুলি পরিষ্কার করছিলেন। তখন একটি বড় রকমের মণি ঘর্ষণ করার সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, তার জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তখন কেশব সেখানে ছিলেন। মণির অত্যাশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য দেখে তিনি অবাক্ হয়েছিলেন। তখন কেশব বললেন,—'এ মণিটি সাধারণ মণি নয়, এর নাম স্যমন্তক মণি। এর গুণ যেমন ভাল, আবার তেমনই

মন্দ ; লোকবিশেষে ভাল ফল দেয়, আবার লোক বিশেষে মন্দ ফল দেয়। কাজেই আমার মনে হয়,—এ মণি সাধারণ কোন ব্যক্তির পক্ষে ধারণ করা ঠিক নয়। রাজ-কোষেই এর স্থান হওয়া উচিত।'

শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্বিদ্যায়ও যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যা-বিশারদ।

সত্রাজিৎ বললেন,—'ভেবে দেখবো।'

এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলে তাঁর নিজের বক্তব্য বলে কেশব চলে গেলেন।

সত্রাজিৎ কেশবকে ভুল বুঝলেন। ভাবলেন—কেশবের বোধ হয় মণিটি নিজের নেবার ইচ্ছে ছিল। তাই রাজকোষের দোহাই দিয়ে ঐরূপ বললে।

এর পরে সত্রাজিৎ মণিটি নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয় মনে ক'রে ভাই প্রসেনজিতের কাছে রাখাই উচিত মনে করলেন। প্রসেনজিৎ মণিটি সব সময় নিজ-কণ্ঠে ধারণ করতেন। একদিন তিনি মৃগয়া করতে গিয়ে সিংহ কর্তৃক নিহত হন। সেই স্থানটি ছিল ঋক্ষবান্* পাহাড়ের একটি অঞ্চল। ঐ অঞ্চলে বাস করত এক অনার্য সর্দার—তাঁর নাম ছিল জাম্ববান্। তিনি নিজ শক্তি-বলে ঐ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি বনমধ্যে বিচরণ-কালে প্রসেনজিতের মৃতদেহ দেখতে পান এবং তাঁর কণ্ঠে ঐ মণিটি দেখতে পেয়ে সেটা নিজগৃহে নিয়ে আসেন। অনার্য জাম্ববান্ মণিটির গুণাগুণ বুঝতে পারেন নি ; তিনি গৃহের শিশুদের খেলনারূপে সেটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।

এদিকে প্রসেনজিৎ গৃহে না ফেরায় সত্রাজিতের মনে সন্দেহ হয়, —কেশবই পাকে-চক্রে প্রসেনজিৎকে হত্যা করে ঐ মণিটি অধিকার

---

* বর্তমান নাম বড়ড়া পাহাড়। পোরবন্দর থেকে ১০ কিঃমিঃ পূর্বে। ঐ অঞ্চলের জঙ্গলে তখন অনেক সিংহ বাস করত।

করেছে এবং কেশবের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তিনি বলরামের নিকট নালিশ করেন। বলরাম সরল মানুষ,—কোন বিষয় গভীর-ভাবে চিন্তা করেন না। তাই প্রাণের ভাই কানাইকে অবিশ্বাস করে মনে মনে তাঁকেই দোষী বলে ভাবলেন।

কেশবের মনে দারুণ অস্বস্তি। কিভাবে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করা যায়—তাই ভাবতে লাগলেন। মণিটি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নামে এ কলঙ্ক থেকেই যাবে। কেশব মণিটির খোঁজ করতে করতে জানতে পারলেন—সত্রাজিৎ মণিটি প্রসেনজিৎকে দিয়েছিলেন; প্রসেনজিৎ শিকারে গিয়ে নিহত হওয়ায় মণিটি নিখোঁজ হয়েছে। তিনি তখন গুপ্তচর নিযুক্ত করে মণিটির অনুসন্ধান করতে লাগলেন। গুপ্তচরেরা যে সংবাদ নিয়ে এলো, তাতে প্রসেনজিৎ কিভাবে নিহত হয়েছে, তা সঠিক জানা যায় না। তবে যেখানে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, সে অঞ্চলটি ঋক্ষবান্ পাহাড়ের একাংশ। সে স্থানটি জাম্ববান্ নামক একজন অনার্য সর্দারের এলাকা। কাজেই সেই দুর্ধর্ষ জাম্ববানের হাতেও প্রসেনজিৎ নিহত হতে পারেন। তা যদি হয়, তবে মণিটি তার কাছে থাকাই সম্ভব। এইরূপ অনুমান করে কেশব ঋক্ষবান্ পাহাড়ের সেই অঞ্চলে গেলেন এবং খোঁজ করতে করতে জাম্ববানের দেখা পেলেন।

কেশব তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চেষ্টা করলেন—প্রসেনজিতের হত্যাকারী সে কিনা! জাম্ববান্ তার কোন সদুত্তর দেয় নি। বরং প্রত্যুত্তরে কেশবকে জিজ্ঞেস করে,—এসব খবরে তাঁর দরকার কি?

এ কথায় কেশবের মনে সন্দেহ হয়—জাম্ববান্ই হয়ত প্রসেনজিতের হত্যাকারী। তখন কেশব বললেন,—'তোমার কথায় মনে হচ্ছে—তুমিই তাঁর হত্যাকারী এবং তাঁর নিকট যে মূল্যবান্ মণিটি ছিল, তা তোমার নিকটই তা'হলে আছে।'

কেশবের এই কথায় জাম্ববান্ বুঝতে পারলে—যে-মণিটি তার

গৃহে আছে, সেটা খুবই মূল্যবান্। তখন সে বললে,—সে মণি সে পেয়েছে এবং তাতে তারই অধিকার ; সে তা অন্যকে দেবে না।

সে কথা শুনে কেশব প্রথমে তাকে অনুরোধ করেন মণিটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু জাম্ববান্ কিছুতেই রাজি হয় না। অথচ মণিটি কেশবের চাই-ই। এই মণিটি উদ্ধার করতে না পারলে তাঁদের গৃহে যে অশান্তি দেখা দিয়েছে, তা দূর করা যাবে না। বিশেষতঃ তাঁর নবগঠিত দ্বারাবতীতে তাঁর নামে এই 'চোর' অপবাদ রটে গেলে, ভবিষ্যতে দ্বারাবতীতে সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। কাজেই তখন তিনি তাকে যুদ্ধের ভয় দেখান। যদি জাম্ববান্ মণিটি না দেয়, তবে তাকে বধ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হবেন না।

জাম্ববান্ তাতেও রাজি হোলো না। কেশবের সঙ্গে জাম্ববানের যুদ্ধ আরম্ভ হোল। জাম্ববান্ যুদ্ধ আরম্ভ করে বুঝতে পারল—কেশবের সঙ্গে যুদ্ধে সে জয়ী হতে পারবে না, তখন সে বললে,—একটি শর্তে মণিটি সে তাঁকে দিতে পারে ; যদি কেশব তার কন্যাকে বিবাহ করতে রাজি হয়, তবে যৌতুক-স্বরূপ মণিটি তাঁকে দিতে পারে। তার কন্যা জাম্ববতী রূপবতী, নব-যৌবনা, বুদ্ধিমতী ; সে তাঁর পত্নী হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্যা।

কেশব বলেছিলেন—তিনি বিবাহিত, তাঁর বিবাহ করা সম্ভব নয়। জাম্ববান্ বলেছিল—একাধিক স্ত্রী গ্রহণে বাধা কোথায় ? তিনি যদি অনার্য-কন্যা বলে তাকে অযোগ্যা মনে করেন, সেটা ভিন্ন কথা। তবে সে শুনেছে—তাঁর দাদা বলরাম অনার্য-কন্যাকে বিবাহ করেছেন।

কেশব কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে চুপ করে ভাবতে লাগলেন। মণিটি তাঁর খুবই প্রয়োজন। কিন্তু মণি পেতে হলে দু'টো পথ তাঁর সামনে খোলা আছে।—এক হলো জাম্ববান্‌কে

হত্যা করে মণিটি উদ্ধার করা ; আর এক উপায় হলো জাম্ববতীকে বিবাহ করে যৌতুক-স্বরূপ মণিটি লাভ করা। কোন্ পথ তিনি গ্রহণ করবেন ? হিংসার পথ গ্রহণ না করে মিত্রতার পথই শ্রেয়ঃ। তাই কেশব জাম্ববতীকে বিবাহ করে মণিটি উদ্ধার করে জাম্ববতীসহ কেশব গৃহে ফিরে এলেন।

এইবার সত্রাজিতকে গৃহে আহ্বান করে বলরাম, অক্রূর ও অন্যান্য যাদব-প্রধানদের উপস্থিতিতে মণিটি কেশব সত্রাজিৎকে ফিরিয়ে দিলেন এবং মণি-সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত ঘটনা সকলকে জানালেন। সত্রাজিৎ মণি হরণের মিথ্যা কলঙ্ক কেশবের ওপর আরোপ করার জন্য নিজে লজ্জিত ও দুঃখিত হোলেন। তখন তিনি সকলের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিজ-কন্যা সত্য-ভামাকে কেশবের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে এবং যৌতুক স্বরূপ মণিটি তাঁকে প্রদান করে নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলেন। সত্রাজিৎ মণি-ব্যবসায়ী হিসেবে বহু সম্পদের অধিকারী ছিলেন। এই বিবাহে তিনি তাঁর সম্পত্তির এক বৃহৎ অংশও কেশবকে যৌতুক দেবেন বলে স্বীকৃত হলেন।

সত্যভামা তাঁর পত্নীরূপে গৃহীত হলেন। তিন বৎসরের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বিবাহ হয়ে গেল। এই বিবাহ রুক্মিণীর মনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলে। তাঁর স্বপ্নের জগৎ কোথায় মিলিয়ে যেতে লাগল। তবু তিনি জ্যেষ্ঠের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট রইলেন।

রুক্মিণীর মানসিক অবস্থা বুঝতে কেশবের বিলম্ব হয় নি। তাই তিনিও সবদিক্ বজায় রেখে রুক্মিণীর মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জতুগৃহদাহে কুন্তী-সহ পাণ্ডবদের মৃত্যু-সংবাদে কৃষ্ণ বিষণ্ণ এবং বিদুরের সঙ্গে যোগাযোগ

লোক মুখে শোনা গেল বারণাবতে জতুগৃহ-দাহে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব পুড়ে মরেছে। কেশব ও বলদেব উভয়েই এ কথা শুনেছেন। এই দুঃসংবাদে তাঁরা উভয়ে খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। প্রায় ছ'বৎসর পূর্বে মথুরায় সকলে এক সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তখন আত্মীয় হিসেবে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে ভালবাসা-বন্ধনের সূত্রপাত হয়েছিল, সেটা যে শুধু আত্মীয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সেটা বোঝা গেল তাঁদের মৃত্যু-সংবাদে। কৃষ্ণের মনের ব্যথার তীব্রতা প্রমাণ করেছিল—পাণ্ডবরা কৃষ্ণের পরম বান্ধব। পাণ্ডবদের যে কোন সময়ে বিপদ আসতে পারে—এরূপ একটা অনুমান তিনি বহু পূর্বেই করেছিলেন; কিন্তু সেটা যে এতটা মর্মান্তিক হবে, তা ভাবেন নি। পাণ্ডবেরা মরেছে একথা সকলে বিশ্বাস করলেও কৃষ্ণ সে কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

হস্তিনায় পাণ্ডবদের হিতৈষী বলতে কেশব এক বিদুরকেই মনে করতেন। তাই তিনি হস্তিনায় বিদুরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। গুপ্তচর মুখে জতুগৃহদাহের কথা যে-রূপ শুনলেন কেশব—

পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শিতা এবং ক্রমবর্ধমান বলবিক্রমে দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রগণ ক্রমশঃ আতঙ্কগ্রস্ত হতে লাগলেন এবং কিভাবে পাণ্ডবদের বিনাশ-সাধন ঘটানো যায়, তারই চিন্তা তাঁরা করতে লাগলেন।

দুর্যোধন তখন পিতার অনুমতি নিয়ে বারণাবতে এক জতুগৃহ*

---

* লাক্ষা, গালা, ধূপ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দ্বারা তৈরী গৃহ।

নির্মাণ করালেন। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই—মনে হবে এক মনোরম বাসগৃহ। সেখানে শিবচতুর্দশীর উৎসব উপলক্ষে মাসাধিককাল মেলা বসে। সেই উৎসবের নাম করে ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী-সহ পঞ্চপাণ্ডবকে সেখানে পাঠিয়ে দেন এবং সেই মনোরম বাসগৃহে (জতুগৃহে) থাকার সুব্যবস্থা আছে বলে জানান। পুরোচন নামে একজন ঐ গৃহের রক্ষণা-বেক্ষণকারী আছে, সেই দেখা-শোনা করবে। বুদ্ধিমান্ বিদুর পাণ্ডবদের বারণাবতে প্রেরণের উদ্দেশ্য অবগত হয়ে পাণ্ডবদের সাবধান করে দেন।

এদিকে দুর্যোধন সেই পুরোচনকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন—সুযোগ মত সে ঐ জতুগৃহে আগুন দেবে, যাতে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব সেই আগুনে পুড়ে মরে। বিদুর সব জানতে পেরে—গোপনে পাণ্ডবদের পলায়নের ব্যবস্থা করলেন।

কুন্তীদেবী প্রত্যহই সেই গৃহে অতিথি-সৎকার করাতেন। মেলায় আগত লোক-জনই সেখানে অতিথি হয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে মেলায় আগমনের শ্রান্তি দূর করে বিশ্রামান্তে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করত।

বিদুরের কাছ থেকে তাঁদের বারণাবতে পাঠানোর উদ্দেশ্য অবগত হয়ে ভীম ঠিক করেছিলেন—সুযোগ মত একদিন পুরোচনকে গৃহে বন্দী করে অগ্নি সংযোগ করে কুন্তীসহ তাঁরা পলায়ন করবেন। একদিন সে সুযোগ এলো। পুরোচনকে গৃহবন্দী করে জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করলেন। সেই আগুনে পুরোচন পুড়ে মরল। কিন্তু আর একটি দঃখজনক ঘটনা সেখানে সেদিন ঘটেছিল। এক ব্যাধ-রমণী—তার পাঁচ পুত্রকে নিয়ে সেদিন পাণ্ডবদের অতিথি হয়েছিল। আহারের মাত্রাধিক্য বশতঃ বিশ্রামের ফাঁকে তারা জতুগৃহের কোন কক্ষে নিদ্রা যাচ্ছিল। কুন্তী বা পান্ডবেরা কেউই তা জানতে পারেন নি। পরদিন ভস্ম-স্তূপের মধ্যে সাতটি কঙ্কাল পাওয়া

গেল। ব্যাধদের ছ'টি এবং পুরোচনের একটি। লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল—ঐ কঙ্কাল ছ'টি কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের।

কেশব সমস্ত জেনে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। পাণ্ডবেরা যে বেঁচে আছে, তা বিদুর আর কেশব ছাড়া অন্য কেউ জানল না।

পাণ্ডবদের এই মৃত্যু-সংবাদে কৌরবগণ কুম্ভীরাশ্রু মোচন করল। অন্যেরা অর্থাৎ প্রজা-সাধারণ 'হায় হায়' করেছিল। কুরু-পক্ষের বোধ হয় একমাত্র শকুনি পাণ্ডবদের মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করেন নি।

কতদিন কেটে গেল। পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একচক্রাপুরে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা ভিক্ষাদ্বারা যা সংগ্রহ করতেন, মাতা কুন্তীকে এনে দিতেন। তিনি রন্ধন করে পুত্রদের খাওয়াতেন। এইভাবে তাঁদের দিন কাটছিল।

একস্থানে বেশী দিন থাকা নিরাপদ নয় মনে করে সেখান থেকে আরও কিছু দূরে গ্রামান্তরে এক কুম্ভকারের কর্মশালায় তাঁরা আশ্রয় নিলেন। সেখানেও তাঁরা ভিক্ষান্নের ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন।

সেই কুম্ভকারের নাম ছিল ভার্গব। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি। ব্রাহ্মণ-কুমারদের এইরূপ কষ্টে দিন-যাপন করতে দেখে তিনি কুন্তীদেবীকে বলেছিলেন, কুমারদের ভিক্ষা করতে হবে না; তাঁর গৃহেই তিনি তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করে দেবেন।

কুন্তীদেবী তাঁর বদান্যতায় প্রীত হয়ে বললেন যে, তাঁর সহানুভূতিশীল অন্তরের পরিচয় তিনি পূর্বেই পেয়েছেন। তিনি তাদের আশ্রয় দিয়েছেন, এতেই তারা তাঁর কাছে ঋণী। তার পুত্রেরা নিজ-চেষ্টায় আহারের সংস্থান করুক,—তাই তিনি চান; কাজেই তাঁর দেওয়া-অন্ন তিনি গ্রহণ করে ঋণের বোঝা আর বাড়াবেন না। এতে তিনি যেন ক্ষুণ্ণ না হন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও পাণ্ডবদের কুরুরাজ্যের অর্ধাংশ লাভ

॥ ১ ॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের সাক্ষাৎ

কুন্তীদেবীসহ পাণ্ডবেরা যখন কুম্ভকার ভার্গবের গৃহে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন তাঁর কন্যা যাজ্ঞসেনীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজা ও রাজপুত্রেরা পাঞ্চালে অর্থাৎ দ্রুপদ-নগরে এসে উপস্থিত। অঙ্গাধিপতি কর্ণ, দুর্যোধন-দুঃশাসন আদি কৌরবগণ, মদ্রাধিপতিশল্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত।

কেশব বলরামকে পাঞ্চালে যাওয়ার কথা বলতেই বলরাম বলেছিলেন, 'আমরা গিয়ে আর কি করব? আমাদের দু'জনেরই তো বিবাহ হয়ে গিয়েছে, আর স্বয়ম্বরে গিয়ে কি হবে? তোর কি আবার আরও একটি বিবাহ করার ইচ্ছে আছে ?'

—বিবাহ না করলে কি স্বয়ম্বরে যেতে নেই? কত দেশের রাজ-রাজারা সেখানে উপস্থিত হবে, তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতেরও তো একটা মূল্য আছে! তাছাড়া পাণ্ডবেরা যদি বেঁচে থাকে, তা হলে তারাও এই স্বয়ম্বর সভায় আসতে পারে। তখন তাদের সঙ্গেও দেখা হতে পারে। স্বয়ম্বরের যে শর্ত, তাতে সাধারণ ধনুর্বিদের পক্ষে সে লক্ষ্য-ভেদ সম্ভব নয়। ধনুর্বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা না থাকলে এই শর্ত পালন অসম্ভব। এই সুযোগে ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরকে জানতে পারা যাবে।

—তোর কথা না রেখেও পারি না।—চল! কিছু লোকজনও তো আমাদের সঙ্গে যাবে?

—কিছু দেহরক্ষী আর সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষ আমাদের সঙ্গে যাবে।

পাঞ্চাল-রাজধানী দ্রুপদ নগর লোকজন, অশ্ব, রথ, হস্তী প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ। চার দিকে শিবির; লোক জনের ব্যস্ততা; সব মিলিয়ে দ্রুপদ নগর সবার কাছে এক গৌরবের আসন লাভ করেছে। সভায় যথাযোগ্য স্থানে অভ্যাগতগণ আসন গ্রহণ করেছেন। রাজন্যবর্গের স্থান প্রথম শ্রেণীতে, তারপর ব্রাহ্মণগণ, তারপর অন্যান্যরা। কৃষ্ণ-বলরামও রাজন্য-বর্গের সঙ্গেই আসন গ্রহণ করেছেন। কেশবের দৃষ্টি যেন কাকে খুঁজছিল।

স্বয়ম্বরের শর্ত শুনে অনেকে কৌতূহল বশতঃ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ-বেশী পাণ্ডবগণও ব্রাহ্মণদের পঙ্‌ক্তিতে গিয়ে বসেছেন।

দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সহোদর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলেন। দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এবং তেজোদ্দীপ্ত আননের দিকে তাকিয়ে অনেকেই চোখ ফেরাতে পারছিল না।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলতে লাগলেন,—'এই আমার ভগিনী পাঞ্চালী। উপস্থিত রাজন্য-বর্গের মধ্যে যিনি সম্মুখস্থ স্ফটিক স্বচ্ছ জলাধারের নিকট রক্ষিত শরাসন গ্রহণ করে তাতে শরযোজনা করে ঊর্ধ্বে ঘূর্ণ্যমান্ চক্রের ছায়ার দিকে দৃষ্টি রেখে চক্রের ছিদ্র-পথে সেই শর নিক্ষেপ করে চক্রের উপরিস্থিত মৎস্যের চক্ষু ভেদ করতে পারবেন, তাঁরই কণ্ঠে আমার ভগিনী বরমাল্য অর্পণ করবেন।

অনেকে আসন ছেড়ে উঠে শরাসনের নিকট গিয়ে ব্যাপারটা পরিমাপ করতে চাইলেন; আবার নিজ নিজ আসনে এসে বসলেন। শল্য, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ একে একে লক্ষ্যভেদ করতে অগ্রসর হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীকে তাঁদের পরিচয়

জানিয়ে দিচ্ছেন। কেউই এতক্ষণ লক্ষ্যভেদে সমর্থ হলেন না। এই বার মহাবীর কর্ণ শরাসনের নিকট যেতেই ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন,—'ভগিনী, ইনি অঙ্গাধিপতি কর্ণ ;—সূত-পুত্র, মহাধনুর্ধর।'

কর্ণ শরাসনে হাত দিতেই দ্রৌপদীর বুক যেন কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—'আমি সূত-পুত্রকে বরণ করা অপেক্ষা নদী-গর্ভে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি।'

এরূপ অভাবনীয় পরিস্থিতির জন্য কর্ণ প্রস্তুত ছিলেন না। শরাসন থেকে হাত তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—'এই আমি শরাসন ত্যাগ করছি ; দ্রুপদ-নন্দিনীর নদী-গর্ভে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে না।'

কর্ণ বিমর্ষ মুখে এসে যথা-স্থানে দুর্যোধনের পাশে বসলেন। দুর্যোধন বন্ধুর অপমানে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—'এ অপমান আমরা নীরবে সহ্য করব না।'

স্বয়ম্বর-সভা কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে রইল। আর কোন রাজা বা রাজপুত্র লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হচ্ছেন না। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন,—'আর কেউ লক্ষ্যভেদে উৎসাহী নন দেখে মনে হচ্ছে—ধরণী বীর-শূন্যা, ক্ষত্রিয়গণ হীন-বীর্য।'

তবুও ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজপুত্রেরা কেউ অগ্রসর হলেন না।

কেশব অনেকক্ষণ যাবৎ ব্রাহ্মণ-পঙ্‌ক্তিতে লক্ষ্য করছেন—ভীমার্জুনের ন্যায় ছদ্মবেশধারী দুই ব্রাহ্মণ-কুমার বসে আছে ; বলরামকে ইঙ্গিতে সে কথা বলেওছেন।

যখন কোন ক্ষত্রিয় অগ্রসর হচ্ছেন না, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্মণ-পঙ্‌ক্তির দিকে তাকিয়ে বললেন,—'যদি কোন ব্রাহ্মণ এই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হন, আমার ভগিনী যাজ্ঞসেনী তাঁকেই বরণ করবেন।'

এইবার ব্রাহ্মণ-বেশী অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে উৎসাহ দিল, অনেকে বিদ্রূপও করল। কেশব মনে মনে খুবই খুশী হলেন। সেই ব্রাহ্মণ শরাসন ধারণ পূর্বক নিম্নে

রক্ষিত জলাধারে প্রতিবিম্বিত ঘূর্ণ্যমান্ চক্রের দিকে তাকিয়ে ঊর্ধ্বে রক্ষিত চক্রের ছিদ্র-পথে দৃষ্ট মৎস্যের চক্ষু শরবিদ্ধ করলেন। স্বয়ম্বর সভা করতালিতে বারবার শব্দিত হতে লাগল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালীসহ ব্রাহ্মণের দিকে অগ্রসর হলেন। পাঞ্চালী লক্ষ্যভেদকারী ব্রাহ্মণের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করলেন।

এই সময় সভায় খুব গোলমাল শুরু হোল। এক সামান্য ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগকে বঞ্চিত করে নারী-রত্ন যাজ্ঞসেনীকে জয় করে নিয়ে যাবে,—এটা তাঁদের সহ্য হোল না। নিজেদের খুব অপমানিত বোধ করলেন। তাঁরা বলপূর্বক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পাঞ্চালীকে হরণ করে নিয়ে যাবেন—এই মতলবে আক্রমণ করলেন। তখন ছদ্মবেশী ভীম একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে তারই সাহায্যে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করতে লাগলেন এবং এই সঙ্গে ছদ্মবেশী অর্জুনও শরাসন নিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলেন।

এই সময় কেশব সবার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নৃপতিবৃন্দকে প্রতিনিবৃত্ত করে বলতে লাগলেন,—'এই ব্রাহ্মণ বীর্য-শুল্কে পাঞ্চালীকে লাভ করেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের আহ্বানেই এই ব্রাহ্মণ এ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এতে এর দোষ কোথায়? ক্ষত্রিয়গণকে প্রথমেই আহ্বান করা হয়েছিল, তাঁরা কেউই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হন নি। আজ যদি এই ব্রাহ্মণও অসমর্থ হতেন, তবে এই স্বয়ম্বর অসমাপ্ত থাকত ; ফলে পাঞ্চালী এক অসহনীয় অবস্থায় পড়তেন। এই ব্রাহ্মণ সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে রাজ-কন্যাকে উদ্ধার করেছেন। এতে তাঁর প্রতি বিরূপ হওয়া আপনাদের উচিত নয়, বরং সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। কেননা ধর্মতঃ এই রাজকন্যা এই ব্রাহ্মণের বিজিতা। আপনারা এই হিংসার পথ পরিহার করে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যান।'

কেশবের এই যুক্তিপূর্ণ কথায় এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই নতি স্বীকার করলেন এবং যাঁর যাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন।

ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ পাঞ্চালীসহ কুম্ভকার গৃহে ফিরে গেলেন।

ভিক্ষান্তে পুত্রেরা একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। কুন্তীদেবী প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। নিজেদের আহারের সংস্থান করতেই কত কষ্ট! তার ওপর অতিরিক্ত লোক! তিনি এগিয়ে এসে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। রাজকন্যা পাঞ্চালীর অপূর্ব তেজোদ্দীপ্ত রূপ দেখে কুন্তীদেবী বিস্মিত হলেন। তিনি রাজকন্যাকে নিজ কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং পাশে বসিয়ে সব ঘটনা জানতে চেষ্টা করলেন।

সেদিন লক্ষ্যভেদের পর সভায় যে ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তাতে রাজা দ্রুপদ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়েছিলেন। কৌরবদের সঙ্গে দ্রোণাচার্যও এসেছিলেন। যদিও তাঁর সঙ্গে আজ অর্জুন নেই, যার সাহায্যে দ্রোণাচার্য দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন*। কিন্তু স্বয়ম্বর সভায় মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালী

---

* এক সময় বাল্যকালে দ্রোণাচার্য ও দ্রুপদ (যজ্ঞসেন) সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দ্রোণের দারিদ্র্য দ্রুপদকে পীড়া দিত। কথায় কথায় একদিন দ্রুপদ তাঁকে বলেছিলেন,—'আমি যখন পাঞ্চালের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবো, তখন তোমাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব দান করব।'

পরবর্তীকালে দ্রুপদ পাঞ্চালের সিংহাসনের অধিকারী হলেন—আর ভাগ্যের এমনই পরিহাস দ্রোণ শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়েও নিজ উদরান্নের সংস্থান করতে পারেন না। তখন তিনি কুরু রাজকুমার দেব অস্ত্রগুরু হন নি। এই সময় একদিন দ্রোণ দারিদ্র্যের কষাঘাতে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে দ্রুপদের শরণাপন্ন হন এবং বন্ধুত্বের দাবীতে দ্রুপদের শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। দ্রুপদ শপথ তো রাখলেনই না, বরং অপমান করে তাঁকে তাড়িয়ে দেন। দ্রুপদ দ্রোণকে তখন বলেছিলেন,—'বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে; তুমি ভিক্ষুক—আমি রাজা। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব! হাস্যকর বটে; আমার বন্ধু বলে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হোল না?'

কর্তৃক অপমানিত হওয়ায়, তিনিও অপমানের প্রতিশোধ নিতে পাণ্ডলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন। এমতাবস্থায় তিনি যাজ্ঞসেনীর বিবাহানুষ্ঠান বা বরপক্ষকে রাজধানীতে রাখা সমীচীন মনে করেন নি। গোলমাল মিটে গেলে কন্যাবিজেতা ব্রাহ্মণের খোঁজ খবর নিয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন।* তবে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত যে লক্ষ্যভেদকারী 'ব্রাহ্মণ' সামান্যব্যক্তি নন। বোধহয় কোন ছদ্মবেশী বীর। পরে তিনি কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, যখন কেশবের মধ্যস্থতায় গোলমাল মিটে গেল।

বিজয়ী ব্রাহ্মণেরা যে পথে প্রস্থান করলেন, কেশব নিজের রক্ষীদের একজনকে অপরেরঅলক্ষ্যে তাঁদের পথ অনুসরণ করতে বললেন। স্বয়ম্বর সভায় তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয় নি।

অন্যান্য রাজন্যবর্গ স্বরাজ্য অভিমুখে রওনা হলেন। কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম দ্বারকায় রওনা না হয়ে পাঞ্চালে স্থাপিত অস্থায়ী শিবিরে কিছুদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে আদিষ্ট রক্ষীর সঙ্গে কুম্ভকার ভার্গবের গৃহে রওনা হলেন। সেখানে যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরের পাদবন্দনা

দ্রোণ এই মৃত্যুতুল্য অপমানের প্রতিশোধ নিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে কুরুপ্রধান ভীষ্মের শরণাপন্ন হলেন। দ্রোণাচার্য ছিলেন কৃপাচার্যের ভগিণীপতি ভার্গব-শিষ্য দ্রোণের পরিচয় পেয়ে কুরু রাজকুমারদের অস্ত্র শিক্ষার জন্য কৃপাচার্য নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি দ্রোণকে রাজকুমারদের আচার্য পদে নিয়োগ করলেন। রাজকুমারদের মধ্যে অর্জুনের নিষ্ঠায় তিনি প্রীত হলেন এবং তাকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ করে গড়ে তুললেন। প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে একদিন তিনি দ্রুপদের তাঁর প্রতি সেদিনের সেই অপমানের কথা বর্ণনা করে তাঁর শপথের কথা বললেন। দ্রোণ দ্রুপদকে শিক্ষা দেবার জন্য সশিষ্য পাঞ্চাল আক্রমণ করতে চাইলেন। অর্জুন ও অন্যান্য কুমারেরা দ্রোণাচার্যের সঙ্গে পাঞ্চাল আক্রমণ করলেন। দ্রুপদ পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। দ্রোণাচার্য দ্রুপদকে রাজ্যার্ধ দিতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যার্ধ গ্রহণ না করে দ্রোণাচার্য তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন।

করে এবং আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে পরে অর্জুন ও নকুল সহদেবের সঙ্গে তাঁরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করলেন,—'স্বয়ম্বর সভায় তুমি আমাদের চিনতে পারলে কি করে?'

কেশব উত্তরে বললেন,—'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির দাহিকাশক্তি কি নষ্ট হয়? সে তাপ বিকীর্ণ করবেই। তা নইলে এখানেই বা এলাম কি করে?'

যুধিষ্ঠির তখন কুন্তীদেবীকে ডেকে বললেন,—'মা, কে এসেছে,—দেখ!'

কুন্তীদেবী গৃহাভ্যন্তর থেকে বাইরে এলেন। দুই ভাই পিতৃস্বসাকে প্রণাম করলেন। তারপর নানা কথার মধ্যোদয়ে কিছু কিছু দুঃখের কথাও হোল।

কিছুদিন যাবৎ কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলেন না। কারণ—ইতিপূর্বে একচক্রা পুরে থাকাকালে আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে বকাসুর নামক এক নিষ্ঠুর অনার্য সর্দারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বকাসুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে কুন্তীদেবী ভীমকে পাঠিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির সে কথা জানতে পেবে কুন্তীদেবীকে তিরস্কারের সুরে বলেছিলেন,—'পরের উপকার করতে গিয়ে যে মা নিজের ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, সে মায়ের পুত্র-স্নেহের গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।'—এই কথা উল্লেখ করে কুন্তীদেবী কৃষ্ণ-বলরামের নিকট দুঃখ জানাচ্ছিলেন। এই ঘটনার সব কথা শুনে কৃষ্ণ কুন্তীদেবীর পরোপকারী মনের পরিচয় যেমন পেলেন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃ-স্নেহের আবরণে স্বার্থ-বুদ্ধির পরিচয়ও তেমনি পেলেন। ভীম অসীম শক্তিধর। যুধিষ্ঠিরের তথা পাণ্ডবদের শত্রু-বিজয়ে প্রধান সহায়। বকাসুরের সঙ্গে লড়াইয়ে যদি ভীমকে হারাতে হোত, তবে পাণ্ডবদের শক্তি হ্রাস হোত—এ-ই যুধিষ্ঠিরের ক্ষোভের কারণ।

কৃষ্ণ এই ঘটনাকে খুব হাল্কা মনে ভাবলেন না, এর গুরুত্ব যে

কতটা, তা আঁচ করে নিলেন। কুন্তীদেবী ও যুধিষ্ঠিরকে যথাযথ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে উভয়ের মনকে হাল্কাকরে দিলেন। বললেন,—'উপকারীর প্রত্যুপকার করা যেমন মানব-ধর্ম, আবার ভ্রাতার কল্যাণ চিন্তাও মানব-ধর্ম। আপনারা উভয়েই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। মাতা-পুত্রের মধ্যে যেন এ নিয়ে আর ভুল বোঝাবুঝি না হয়,—এ আমার অনুরোধ।

এরপর কুন্তীদেবী দ্রৌপদীর বিবাহের ব্যাপারটা কেশবকে বললেন,—'অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে এ কন্যা লাভ করেছে, কাজেই তার স্বামিত্বে অর্জুনের দাবী অগ্রগণ্য। কিন্তু তার দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর যুধিষ্ঠির ও ভীম এখনও অবিবাহিত। সে অবস্থায় একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

এই সময় দ্রৌপদী সেই কক্ষের দ্বারদেশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অর্জুন তখন মাথা নীচু করে চুপ করে আছেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির ও ভীম দ্রৌপদীর দিকে লোভাতুরের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। কেশব তা লক্ষ্য করেছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, এক নারীর জন্য যদি ভ্রাতৃ-বিরোধ শুরু হয়, সেও তো শুভকর নয়! একটু ভেবে কেশব বলতে লাগলেন,—'শুনেছি এতদঞ্চলে একপরিবারে একাধিক সহোদর একই পত্নীর স্বামিত্ব গ্রহণ করতে পারে। তা যদি হয়, তবে এরাও তা গ্রহণ করতে পারে।'*

—নকুল, সহদেবকে আমি গর্ভে ধারণ না করলেও ওরা আমার পুত্রাধিক, একই পিতার ক্ষেত্রে ওদেরও জন্ম। ওদের কথাও আমাকে ভাবতে হবে।

—মনে হয়,—ওদেরও পাঞ্চালীর স্বামী হতে বাধা নেই। রাজা দ্রুপদও, মনে হয়, এ বিবাহ মেনে নেবেন, কারণ এ প্রথা এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

---

* উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য (পৃঃ—৫৯)।

—তুমি যদি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পার, তবে সহজ হবে, মনে হয়।

—এই বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা দ্রুপদ-নগর ত্যাগ করব না। বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হতে কয়েকদিন সময় লাগবে। এ ক'দিন আমরা আমাদের শিবিরেই থাকব। এরা রাজ-জামাতা হতে চলেছে, তদুপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কারও এদের চাই। তার সব ব্যবস্থা আমরা কোরব। আমি কাল প্রত্যুষেই দ্বারাবতীতে লোক পাঠাবো। ভাইয়েদের বিবাহে আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে। আজ আমরা উঠি, পিসিমা!'

দ্রৌপদী এতক্ষণ একটি কথাও বললেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কৃষ্ণের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, আর তাঁর কথার মর্মোপলব্ধি করতে চেষ্টা করছিলেন। এমন মানুষও সংসারে আছে? এর পূর্বে তিনি এরূপ মানুষ দেখতে পান নি। কথা বলার কী অদ্ভুত ভঙ্গি! প্রতিটি কথাই যেন কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে অন্তরে গেঁথে যায়। চোখে-মুখে কী দীপ্তি! দৃষ্টিতে কী আকর্ষণ। সকল অনুভূতিকে যেন এক বিন্দুতে টেনে নিয়ে আসে!

কৃষ্ণ-বলরাম চলে যাওয়ার পরেও তিনি কতক্ষণ যে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তা তাঁর হুঁস ছিল না। কুন্তীদেবীর আহ্বানে তিনি যেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

পরদিন দ্রুপদ-রাজার লোকজন কন্যা-বিজেতা ব্রাহ্মণের খোঁজে বের হোল। ইতিমধ্যে কেশব দ্রুপদ-রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই ব্রাহ্মণদের বর্তমান অবস্থিতি ও তাঁদের পরিচয় জানালেন। দ্রুপদ ইতিপূর্বে যে অনুমান করেছিলেন,—কন্যাবিজেতা ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী কোন মহাবীর, তাঁর সে অনুমান ঠিক। এ সেই মহাধনুর্ধর অর্জুন, যাঁর কাছে পাঞ্চাল একদিন দারুণভাবে পরাজিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডব জেনে রাজা

দ্রুপদ খুবই আনন্দিত হলেন। কারণ তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে ; অর্জুনকে জামাতা করার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই তিনি মনে মনে পোষণ করছিলেন। তাই অনেক ভেবে-চিন্তেই লক্ষ্যভেদে এতটা কঠিন শর্ত আরোপ করেছিলেন। তিনি দ্রৌপদীর বিবাহানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগী হলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই কেশবের নির্দেশমত দ্বারাবতী থেকে প্রচুর উপহার-সামগ্রী এসে পৌঁছুল। পাণ্ডবেরা নিঃস্ব। কাজেই কেশব সেকথা চিন্তা করেই এই বিবাহ উপলক্ষে যৌতুক হিসেবে বিচিত্র বৈদূর্য-মণি, স্বর্ণালঙ্কার, নানা দেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহ-সামগ্রী, বহু সংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত হস্তী ও উৎকৃষ্ট অশ্ব, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত-কাঞ্চন যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করলেন। যুধিষ্ঠির এই সকল সামগ্রী হৃষ্টচিত্তেই গ্রহণ করলেন। কারণ নূতন করে সংসার পাততে এসবের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া নববধূ হচ্ছেন রাজকন্যা। রাজা দ্রুপদও রাজোচিত যৌতুকাদি প্রদান-পূর্বক বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করালেন। দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর পত্নীত্ব স্বীকার করে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে পাঞ্চাল রাজ-ভবনের সন্নিকটে এক নব পরিবেশে বাস করতে লাগলেন।

কেশব ও বলরাম দ্বারাবতীতে চলে গেলেন।

॥ ২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র-কর্তৃক পাণ্ডবদের অর্ধ-কুরুরাজ্যের অধিকার-প্রদান ও ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠা

দ্বারাবতী যাত্রাকালে কেশব একজন যাদব-রক্ষীকে গোপনে বিদুরের নিকট প্রেরণ করে পঞ্চ-পাণ্ডবের বিবাহ-সংবাদ জানালেন। আরও জানালেন, তিনি যেন পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে রাজ্যের অর্ধাংশ যাতে পাণ্ডবেরা পান, সে বিষয়ে যেন সচেষ্ট থাকেন।

বিদুর পাণ্ডবদের সমস্ত সংবাদ জানতে পেরে খুবই খুশী হলেন এবং কেশবের নির্দেশ-মত পাণ্ডবদের হস্তিনায় নিয়ে আসার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি কুরু প্রধান ভীষ্মের নিকট গিয়ে সব জানালেন। এ সংবাদে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন।

তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে এ সংবাদ জানাতে গেলে পাণ্ডবদের জীবিত থাকার কথা শুনে প্রথমে তিনি বিশ্বাসই করতে পারলেন না। তারপর যখন শুনলেন,—পাণ্ডবেরা দ্রুপদ-রাজকন্যা দ্রৌপদীকে পাঁচ ভাই বিবাহ করেছেন, তখন আর তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিদুর জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্। ধৃতরাষ্ট্র যে ঐ সংবাদে সুখী হন নি, তা তিনি ভালভাবেই বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন—জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার কলঙ্ক আপনাকে প্রজাসাধারণের কাছে অপ্রিয় করে তুলেছে। আপনি যদি আপনার জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করতে চান, এই তার সুবর্ণ সুযোগ। কুন্তীদেবী ও নববধূসহ পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে নিয়ে এসে কুরুরাজ্যের অর্ধাংশের অধিকার দিন। লোকে আপনার পূর্বকৃত কলঙ্ক-জনক কার্যের কথা ভুলে আপনাকে ধন্য ধন্য করবে।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে হঠাৎ বদলে গেলেন। সকলকে অর্থাৎ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শকুনি প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ এবং দুর্যোধনাদি পুত্রদের নিজ কক্ষে ডাকালেন। সকলে সব শুনে উৎফুল্ল হলেন। হলেন না শুধু দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ এবং বন্ধুবর অঙ্গাধিপতি কর্ণ। দুর্যোধন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—'আমরা এখনই পাঞ্চাল আক্রমণ করব এবং পাণ্ডবদের বধ করে দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে আসব।' কর্ণও তাঁকে উৎসাহিত করলেন।

দ্রোণাচার্য তখন বললেন,—'স্বয়ম্বর সভায় অপমানিত হয়ে ফিরে এসে এখন আস্ফালন কোরছ। এই তো বীর পুরুষের লক্ষণ! তোমরা কি ভেবেছ—পাণ্ডবেরা একা? তাঁদের সাহায্য করবে পাঞ্চাল-সৈন্য; তাছাড়া রয়েছে যাদবরা। একবার অপমানিত হয়েছ, আর একবার হতে আর লজ্জা কি?'

ভীষ্মদেব তখন বললেন,—'বৎস ধৃতরাষ্ট্র, তুমি কি ঠিক করেছ?'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন,—'পাণ্ডু-পুত্রেরা আমাদেরই সন্তান, তাদের বধূ আমাদের কুরুকুলেরই বধূ। তাই আমার ইচ্ছা – পাঞ্চাল-দুহিতাকে নববধূর সম্মানে হস্তিনায় নিয়ে এসে যথাযোগ্য ভাবে বরণ করি*। বিদুর আমার প্রতিনিধি হয়ে পাঞ্চালে যাক্। বহু-মূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারসহ নানা উপঢৌকন-যৌতুক নিয়ে পাণ্ডব-জননী ও বধূমাতাসহ পঞ্চ পাণ্ডবকে এখানে নিয়ে আসুক। রাজা দ্রুপদের জন্যও যথাযোগ্য সম্মানজনক উপঢৌকন দিয়ে আমার অভিনন্দন জানাবে।'

ধার্তরাষ্ট্রগণ ও কর্ণ ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তকে সকলে সাধুবাদ জানালেন।

---

* দ্রৌপদীর বিবাহ যদি অসামাজিক হোত, তাহলে ধৃতরাষ্ট্র এরূপ বলতেন না।

পরদিন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশ মত পাঞ্চালে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে পাণ্ডবদের হস্তিনায় নিয়ে এলেন।

যথাবিধি আদর আপ্যায়নের দ্বারা কুন্তী ও দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ হস্তিনার রাজ-অন্তঃপুরে অভ্যর্থিত হলেন।

কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁর কক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি প্রধানগণকে আহ্বান করলেন। সেই সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবকেও। তিনি সর্ব-সমক্ষে বলতে লাগলেন,—'যুধিষ্ঠির ও তার ভ্রাতাগণ কুরু বংশেরই সন্তান; তাঁরা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্র। কাজেই তারা কুরু-রাজ্যের অর্ধাংশের অধিকারী। তাই আমি মনস্থ করেছি,—এ রাজ্যের খাণ্ডবপ্রস্থ পাণ্ডবদের অধিকারে থাকুক, আর হস্তিনাপুর ও তার সংলগ্ন স্থান সমূহ আমার পুত্রদের অধিকারে থাকুক। এতে মনে হয় কারও কোন অসন্তোষের কারণ থাকবে না।'

এই রাজ্য ভাগের ব্যাপারে কেউ কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি। সকলেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব মেনে নিলেন। পাণ্ডবেরা খাণ্ডব-প্রস্থে গিয়ে দেখলেন,—ঐ সকল অঞ্চল বনাকীর্ণ, আর বনছাড়া যে স্থান আছে, তা অনুর্বর ও জনবসতি-বিরল। ভীমার্জুন মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। কারণ হস্তিনাপুর দীর্ঘকাল রাজধানী থাকায়, সে স্থান নানা ভাবে উন্নত ও ঐশ্বর্যপূর্ণ; অন্য দিকে খাণ্ডব-প্রস্থ তার বিপরীত। যুধিষ্ঠির দ্বারাবতীতে লোক পাঠিয়ে কেশবকে নিয়ে এলেন এবং নগর পরিকল্পনায় তাঁর পরামর্শ চাইলেন। কেশব তখন এ অবস্থায় বৃহৎ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন না। মোটামুটি ভাবে খাণ্ডব প্রস্থের পূর্বাংশে একটি ছোট পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিলেন—ধীরে ধীরে নগরের আয়তন বৃদ্ধি করা যাবে। সেই পরিকল্পনা মত একে ইন্দ্রপ্রস্থ* নাম দিয়ে নূতন নগর স্থাপিত হোল। পাণ্ডবগণ

* বর্তমান নূতন দিল্লী।

কুন্তীদেবী ও দ্রৌপদীসহ দাস-দাসী সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস শুরু করলেন। যুধিষ্ঠিরের শাসনাধীনে বসবাসের জন্য হস্তিনাপুর থেকেও অনেক নাগরিক ইন্দ্রপ্রস্থে আসতে লাগল। তার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবারও ছিল। নগর নির্মাণের কাজ চলতে লাগল। কিছুদিন পর কেশব দ্বারাবতীতে ফিরে গেলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ইন্দ্রপ্রস্থের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হোল। অরণ্যাঞ্চলের কিছু অংশ ইন্দ্রপ্রস্থের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজনে অরণ্য মোচন করে ইন্দ্রপ্রস্থের সহিত যুক্ত করা হোল। এই কারণে সেখানে যে সকল অনার্য নাগ-পরিবার বাস করত, তারা গৃহ-হারা হয়ে খাণ্ডব-প্রস্থের গভীর অরণ্যাঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হোল।

ভীমার্জুনের চেষ্টায় দিন দিনই ইন্দ্রপ্রস্থের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য বৃদ্ধিও হতে লাগল। ছোট ছোট অনেক রাজ্যই যুধিষ্ঠিরের ছত্রছায়ায় থেকে নিশ্চিন্তে রাজ্য-সুখ ভোগ করতে লাগলেন।

কেশব দ্বারাবতীতে থাকলেও মাঝে মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে দেখা-শোনা করতেন এবং পাণ্ডবদের জন্য সঙ্গে আনতেন ধনরত্ন ও মূল্যবান্ সামগ্রী, যাতে যুধিষ্ঠিরের রাজ-সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়। পাণ্ডবদের সংসারে কতটা শান্তি বিরাজ করছে, তা অনুভব করার চেষ্টা করতেন তিনি। একটা বিষয় তিনি অনুভব করেছেন যে, অর্জুন রাজ্যের উন্নতি বিধানে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন বটে, তবু তাঁর মনে হয়েছে,—অর্জুন যেন পারিবারিক ব্যাপারে খুব সুখী নয়, এবং তার কারণও তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। সেটা যে দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করেই, তাতে তিনি নিঃসন্দেহ। দ্রৌপদী অর্জুনের বীর্য-শুল্কে লব্ধা,—এ-বোধ অর্জুন ও দ্রৌপদী উভয়ের মনেই জাগ্রত ছিল। প্রজ্ঞাবান্ কেশব ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অর্জুনের কর্ম-শক্তিকে তাঁর ধর্মরাজ্য স্থাপনের কাজে এবং মানবকল্যাণ-ব্রতে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হলেন। তার জন্য অর্জুনকে মোহ-মুক্ত

করতে ক্ষুদ্র গণ্ডীর সীমা ছাড়িয়ে বিশ্ব-প্রকৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁকে তিনি নিয়ে গিয়ে বিশ্বরূপ দর্শনের* সুযোগ দিয়ে তাঁকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য মনে মনে ভাবতে লাগলেন। সেদিন কথায় কথায় কেশব অর্জুনকে বলেছিলেন,—'সখা, অল্প দিনের মধ্যেই তুমি তোমার কর্ম শক্তির যে পরিচয় দিয়েছ, তাতে সত্যিই আমি বিস্মিত। সেই সঙ্গে এ কথাটাও বলতে চাই,—এই ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ না করলে তুমি তোমার শক্তির পরিমাপ করতে পারবে না, নিজেকে চিনতেও পারবে না। তাই আমার ইচ্ছা,—তুমি একবার মাতৃভূমি ভারত-পরিক্রমায় ব্রতী হও। দেখবে—এই অনন্ত উদার আকাশের নীচে বিশ্ব-প্রকৃতির কি অপূর্ব রূপ, কি অনন্ত-শক্তির আধার সে।

—তোমার কথা আমার সম্পূর্ণ বোধগম্য হোল না, সখা, আমাকে কিছু দিন ভাববার সময় দাও।

সেদিন আর বিশেষ কোন কথা হোল না। কেশব অন্যান্য সকলের সঙ্গে এবং বিশেষ করে দ্রৌপদীর সঙ্গে কথা বলে আবার দ্বারাবতীতে ফিরে গেলেন।

কিছুদিন পর এক দুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হোলেন পার্থ** সহসা এক ব্রাহ্মণ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে তাঁকে বললেন,—'এ ইন্দ্রপ্রস্থে আর বাস করা যাবে না। দিন-দুপুরে দস্যু এসে বাড়ী থেকে জোর করে গরু ধরে নিয়ে যায়। কি করে এখানে বাস করা যায়, বল?

পার্থ বললেন,—'কোথায় সে দস্যু?' ব্রাহ্মণ বললেন,—'আমার সঙ্গে যদি তাড়াতাড়ি যেতে পার, এখনও হয়তো তাকে ধরা যাবে।'

—'চলুন।' বলেই পার্থ ধনুর্বাণ নিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে চললেন। বেশ অনেকটা দূরে গিয়ে দেখা গেল—একটা লোক, মনে হোল

---

* উপক্রমণিকা, পৃঃ—৬১ ও পৃঃ—৬২ দ্রষ্টব্য।

** অর্জুন। পৃথা (অপত্যার্থে) ষ্ণ প্রত্যয়=পার্থ।

এই খাণ্ডব বনেরই অধিবাসী, গরুটিকে নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। পার্থ তাড়াতাড়ি ধনুক তুলে তার দিকে একটি শর নিক্ষেপ করলেন। শরের আঘাতে সে হতভাগ্য চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। সে চীৎকার শুনে একটি সাত-আট বৎসরের রোগা মেয়ে, কাছেই বোধ হয় কোথাও ছিল, ছুটে এসে আহতের বুকে পড়ে কাঁদতে লাগল।

ইতিমধ্যে সেই ব্রাহ্মণ ও পার্থ সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। এঁদের এগিয়ে আসতে দেখেই মেয়েটি ভয়ে ছুটে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আহত ব্যক্তি মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। ব্রাহ্মণ গিয়ে তাড়াতাড়ি গরুর দড়ি ধরে গরুটিকে টেনে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলল।

পার্থ ঘটনার পরিস্থিতিতে বিমূঢ় হয়ে আহতের পাশে বসে তার পার্শ্ব-দেশ থেকে তীরটি খোলার চেষ্টা করতেই লোকটি নিষেধ করলে। সে বোধ হয় অর্জুনকে চিনতে পেরেছে। এমনিতেই দুর্বল দেহ, তার ওপর আঘাতের তীব্রতা ; বাঁচার কোন আশা নেই বলেই বোধহয় তীরটি খুলতে নিষেধ করলে। পার্থ কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই লোকটি ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বলতে লাগল,—'আমি চন্দ্রচূড় নাগ, তোমাদের অত্যাচারেই বাড়ী-ঘর ছেড়ে দূরে গভীর জঙ্গলে বাস করছি। স্ত্রী আর ঐ একটি সাত-আট বৎসরের মেয়ে। ওর রোগ হয়েছে, একটু দুধের জন্য ঐ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়েছিলাম। গরুর কত দুধ তার বাড়িতে। দিলে না। শেষে ভাবলাম ঐ গরুটা নিয়ে ওর দুধ বার করে আবার গরুটা ওকে ফিরিয়ে দেব। তা হোল না। শেষে তোমার হাতেই—' বলতে বলতে সে ঢলে পড়ল।

অনুশোচনায় পার্থের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। তারপর মেয়েটির খোঁজ করতে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। পিতার বুকে পড়ে মেয়েটি যখন কাঁদছিল, তখন তাকে মাত্র মুহূর্তের জন্য একবার

দেখেছিলেন। সারাদিন চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া গেল না। তখন লোকজন ডাকিয়ে চন্দ্রচূড়ের সৎকারের ব্যবস্থা করে ভগ্ন মনোরথ হয়ে পার্থ গৃহে ফিরলেন। দীর্ঘ সময় গৃহে অনুপস্থিত থাকায় যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যুধিষ্ঠিরকে পার্থ সব ঘটনা বিবৃত করলেন। যুধিষ্ঠিরও মর্মাহত হলেন।

তারপর থেকে রোজই সকলের অলক্ষ্যে একবার করে পার্থ খাণ্ডব অরণ্যে যেতেন—যদি মেয়েটার খোঁজ পাওয়া যায়। এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

অনেকদিন পরে আবার কেশব ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন পাণ্ডবদের খোঁজ-খবর নিতে। এবার কেশব দেখলেন,—পার্থের মনে সে উদ্দীপনা নেই, কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব।—ব্যাপার কি?

তখন একদিন কেশব পার্থকে গৃহে না পেয়ে তাঁর খোঁজ করতে বনের দিকে গেলেন। বেশ কিছু সময় খোঁজ করে পার্থকে না পেয়ে খাণ্ডব বনের গভীরাঞ্চলের দিকে যেতে লাগলেন। হঠাৎ একস্থানে পার্থের দেখা পাওয়া গেল। কেশব বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে এই বনের মধ্যে সে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন পার্থ কেশবকে চন্দ্রচূড়-হত্যার ব্যাপারটা সব খুলে বললেন এবং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চন্দ্রচূড়ের অনাথা নাবালিকা কন্যাটির ভরণ-পোষণের একটা সুব্যবস্থা করে দিতে চান পার্থ।

কেশব তাঁকে নিয়ে গৃহে ফেরার পথে বোঝালেন,—তাঁর এই চেষ্টা বৃথা; কারণ তাকে যদি পাওয়াও যায়, সে কিছুতেই পিতৃহন্তাকে বিশ্বাস করতে পারবে না এবং তাঁর দেওয়া কোন সাহায্যই সে নেবে না।

কেশব আরও দু' একদিন ইন্দ্রপ্রস্থে কাটালেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-পরিচালনা-ব্যাপারে তাঁকে কিছু উপদেশও দিলেন এবং এই সব কথার মধ্যে তিনি আরও বললেন,—'আপনার রাজ্য এখন সুগঠিত। কিন্তু রাজ্যে সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা দরকার। তবে কাজটি বিশেষ সতর্কতার সহিতই করতে হবে। কারণ জরাসন্ধ গোষ্ঠীর নৃপতিবৃন্দ জানতে পারলে অবশ্য সন্দেহের চোখে দেখবে। এ কাজে পার্থই যোগ্য ব্যক্তি। আমার ইচ্ছা— কিছু রক্ষী সহ ছদ্মবেশে পার্থ ভারতপরিক্রমায় বের হোন।'

যুধিষ্ঠির তখন বললেন,—'এই নবগঠিত রাজ্যে অর্জুনের অনুপস্থিতি বিপদের কারণ ঘটাতে পারে! কারণ অর্জুনের সৈনাপত্যেই এ রাজ্যের সামরিক বাহিনী সুশিক্ষিত হচ্ছে।'

—সে কার্যের জন্য মধ্যম-পাণ্ডব সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি। তা ছাড়া নকুল-সহদেবও যথেষ্ট সামরিক দক্ষতা লাভ করেছে। কাজেই আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।

শেষ পর্যন্ত কেশবের কথাই সকলকে মেনে নিতে হোল।

এ সংবাদে দ্রৌপদী খুবই বিস্মিত ও দুঃখিত হলেন। কেশবের এরূপ পরামর্শের পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি? দ্রৌপদী তাঁর বিবাহের পর এই কয় বৎসরে কেশবকে দেখছেন,— তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ বাক্যালাপও করেছেন, কিন্তু কিছুতেই যেন তাঁর মনের তল খুঁজে পাওয়া যায় না। পাণ্ডবদের তিনি আত্মীয় ও বান্ধব মাত্র, কিন্তু কার্যতঃ তাঁর নির্দেশই তো সকলে মেনে চলেন!

কেশব সকলের কুশল বার্তা সংগ্রহ করে দ্বারাবতীতে ফিরে গেলেন।

পার্থের ভারত-পরিক্রমার যাত্রার দিন স্থির হয়েছে। দু' একদিন নিভৃতে তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদীর আলাপও হয়েছে। উভয়েরই আগামী বিরহের দিনগুলির কথা মনে হয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়েছে। কিন্তু কেশবের ইচ্ছার অন্যথা হবার যো নেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অর্জুনের ভারত পরিক্রমা, উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা, রৈবতকে কেশবের আতিথ্য ও সুভদ্রাহরণ

কয়েকজন দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে পার্থ ভারত পরিক্রমায় বের হয়েছেন। যাত্রা করে উত্তরাভিমুখে চলেছেন। কিছুদিন পর গঙ্গাদ্বারে* এসে উপস্থিত। স্থানটি বড় মনোরম। এখন পাহাড় প্রকৃতির কোলে এসে আর এক নূতন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। সমতল ক্ষেত্রে এতদিন বিচরণ করেছেন, এখন গিরিরাজ হিমালয়ের শোভা তাঁকে মুগ্ধ করেছে ; এ অনুভূতি পার্থের একেবারেই অনাস্বাদিত। এর মাদকতা ভিন্নরূপ। এখানকার মানুষগুলিও অন্যরূপ। এ এক আলাদা জগৎ। এখানকার মানুষের মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, পাহাড়-প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বন্ধনে আবদ্ধ।

এই পাহাড়ী অঞ্চলের একস্থানে শিবির ফেলে কয়েকদিন বাস করছেন পার্থ। এখানকার লোকজনের চাল-চলন, ভাষা সবই সম্পূর্ণ পৃথক্। পার্থ নিজের লোকজন নিয়ে শিবিরে বাস করছেন। প্রত্যহ নদীতে স্নান সেরে মন্ত্রাদি জপ করে আপন মনে শিবিরে গিয়ে আহারাদির পর বিশ্রাম করেন। তারপর লোকজন নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে ঘুরে বেড়ান।

একদিন স্নান ও জপ সেরে তীরে উঠেছেন পার্থ, এমন সময় আট-দশ জন স্থানীয় লোক তীর-ধনুক নিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। তারা ইঙ্গিতে তাঁকে তাঁদের সঙ্গে যেতে বলছে। পার্থ তখন চারদিকে তাকিয়ে তাঁর রক্ষীদের খোঁজ করলেন ; কাউকে দেখতে

---

* গঙ্গাদ্বার = বর্তমান হরিদ্বার।

পেলেন না। নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের অবাধ্য হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় ভেবে পার্থ তাদের সঙ্গে অগ্রসর হতেই কিয়দ্দূরে একটি পরমা সুন্দরী যুবতীকে দেখতে পেলেন। যুবতীটি মুচকি মুচকি হাসছে। আপেলের মত গোলাপী দুই গণ্ডদেশ—টোল খাওয়ায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। সমতলের যুবতী নারীদের অপেক্ষা সুডৌল এবং কমনীয় দেহের গঠন তাঁর; পার্থক্য শুধু অনুন্নত নাসিকা। পার্থের কৌতূহলী দৃষ্টি সেই পার্বতীর দৃষ্টির সঙ্গে বিনিময় হতেই যুবতী দ্রুত সরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পার্থের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। তারপর তিনি ঐ লোক-গুলোর সঙ্গে জাঁক-জমকপূর্ণ এক গৃহের অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। তখন আর লোকগুলিকে দেখা গেল না; তার পরিবর্তে একজন অর্ধপক্ক কেশযুক্ত এক প্রৌঢ় পার্থের নিকটে এসে সমাদর জানিয়ে একটি সজ্জিত কক্ষে নিয়ে গিয়ে স্নানের বস্ত্রাদি পরিবর্তনের জন্য রাজ পরিবারের যোগ্য মহার্ঘ্য বস্ত্রাদি তাঁকে দিলেন। এর শেষ কোথায় দেখার জন্য পার্থ বস্ত্রাদি পরিবর্তন করলেন। তখন সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি তাঁকে খাদ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। পার্থ ইতস্ততঃ করছিলেন। তখন সেই প্রৌঢ় জানালেন,—'তুমি আজ আমাদের অতিথি।'

পার্থ মনে মনে ভাবলেন—অতিথির অভ্যর্থনার যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন, তাতে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থায় কি না হয়! তখন তিনি প্রকাশ্যে বললেন—তাঁর সঙ্গে লোকজন আছে, দীর্ঘ-সময় তাঁর অদর্শনে তারা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে খোঁজ করতে বেরুবে।

তখন সেই প্রৌঢ় জানালেন,—তাঁর শিবিরে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তারাও আজ এই গৃহে অতিথি।

ক্রমশঃ ব্যাপারটা পার্থের নিকট আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল।

সেই প্রৌঢ়-ব্যক্তির একান্ত অনুরোধে পার্থ আহারে প্রবৃত্ত

হলেন। রাজসিক ব্যাপার। পরিক্রমায় বের হওয়ার পর এরূপ খাদ্য গ্রহণের সুযোগ হয় নি।

আহার-শেষে তাঁকে একটি বিশ্রাম-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হোল। সে কক্ষে প্রবেশ করেই পার্থ বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগলেন—পথে-দেখা সেই যুবতী গুয়া-পান ইত্যাদি মশলা সহ একটি রৌপ্যাধার হাতে নিয়ে কক্ষের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে : মুখে সেই হাসি।

পার্থ ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। যুবতী ঘনিষ্ঠ হয়ে নিঃসঙ্কোচে পার্থের হাতে রৌপ্যাধারটি গুঁজে দিলে। পার্থ সেটা হাতে নিয়ে যুবতীকে জিজ্ঞেস করলেন,—'এ-সবের উদ্দেশ্য কি ?'

এইবার যুবতী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। পার্থ অবাক্ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

যুবতী বললে,—'শুনেছি তুমি মস্ত বড় বীর : কিন্তু নারীর হৃদয় বুঝতে পার না ? বীরেরাই তো নারীর হৃদয় সহজে জয়' করতে পারে। আমার হৃদয়ও তুমি জয় করে ফেলেছ। তাইতো তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এলাম।

—আমার পরিচয় তুমি জানলে কি ক'রে ?

—না জানলে কি আর তোমাকে আমাদের অন্দর মহলে নিয়ে এসেছি ? তোমাকে বিবাহ করবো বলেই তো তোমার কাছে ধরা দিয়েছি।

—আমি তো তোমাকে ধরতে চাই নি।

—তুমি না চাইলে কি হবে ? আমি তো চেয়েছি।

—আমি তো বিবাহিত।

—হ্যাঁ, ঐ তো বিবাহ ! এক বৌ নিয়ে পাঁচজনে টানাটানি !

এবার পার্থ বিস্ময়ে নির্বাক্ হ'য়ে গেলেন। এতসব খবর এ জানলে কি ক'রে ? এই সুদূর পাহাড়-জঙ্গলে আমাদের

পারিবারিক ব্যাপারের খবর এলো কি ক'রে ? পার্থ বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

যুবতী তখন বললে,—'তুমি অবাক্ হয়ে ভাবছ,—আমি এসব জানলাম কি ক'রে ? কি ক'রে জেনেছি, পরে বলব। তুমি এখন বিশ্রাম করো।'

বলেই গমনোদ্যত হতেই পার্থ বললেন,—'শোন !

'যুবতী অদ্ভুদ কটাক্ষ-বাণে পার্থের হৃদয় বিদ্ধ করে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পার্থ যুবতীর গমন-পথের দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে ছিলেন। শেষ মুহূর্তে আর একবার তাঁর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে যুবতী অদৃশ্য হয়ে গেল। সে দৃষ্টির মধ্যে কত কথাই না লুকিয়ে আছে !

পার্থ অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন এবং এই পরিস্থিতির তল খুঁজতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তবে কি সখা কেশবের কোন গোপন হাত আছে এতে ? এখন কী তাঁর কর্তব্য ? এই সুনিতম্বিনী নারী যে কোন পুরুষেরই কাম্য। এই পর্বত-দুহিতার দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর ভোগলালসাকে দুর্দমনীয় করে তুলছে। তিনি ভাবতে ভাবতে শয্যায় গা এলিয়ে দিলেন।

নিদ্রাদেবীর কোলে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম লাভ করে উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে পার্থের। তিনি শয্যায় উঠে বসেছেন। এতক্ষণ দিবানিদ্রায় তিনি অনভ্যস্ত। আজ তার ব্যতিক্রম। এই দিবানিদ্রায়ও তিনি স্বপ্ন দেখেছেন এই অরণ্য-চারিণীকে। সে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে পার্থের প্রশস্ত বক্ষে লীন হয়ে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিয়েছে।

এমন সময় সেই স্বপ্ন-চারিণী বাস্তবে দেখা দিল, সঙ্গে তার এক সহচরী, মুখ প্রক্ষালনের জন্য সুগন্ধী সুশীতল বারি এবং সুকোমল বস্ত্র-খণ্ড তার হাতে। আর সেই সুনিতম্বিনীর হাতে

নানা ফল ও গৃহজাত নানা মিষ্টি একটি রৌপ্য থালায়। যথাস্থানে জল ও বস্ত্রখণ্ড রেখে সহচরী কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হোল। পার্থকে স্থাণুর মত বসে থাকতে দেখে যুবতী থালাটি যথাস্থানে রেখে বারিপাত্রটি পার্থের হাতে দিলে। পার্থ সুবোধ বালকের মত হাত মুখ প্রক্ষালন করে সুকোমল বস্ত্র-খণ্ডে মুখ মুছে আবার শয্যায় গিয়ে বসলেন। তখন যুবতী তাঁকে খেতে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু পার্থ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন। যুবতী ভাবল—তখনকার ব্যবহারে কি পার্থের অভিমান হয়েছে? সে পার্থের কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে হাত ধরে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে। পার্বতীর দেহের স্পর্শে পার্থের দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল বুঝি। কি দুর্নিবার আকর্ষণ! পার্থ তখন যুবতীকে পাশে বসালেন এবং আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চুম্বন করলেন। পার্থের দেহে শোণিত প্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রথমে যুবতী কোন বাধা দেয় নি। কিন্তু উত্তেজনার আবেগে পার্থ যখন তাকে দ্বিতীয়বার চুম্বনোদ্যত, তখন নারী পার্থের মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে বাধা দিল। কিন্তু পার্থ বল প্রয়োগের চেষ্টা করতেই যুবতী কাতর অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললে,—'এখন নয়, আর একটি দিন। কালই আমাদের বিবাহ। তারপর যা খুশি, তাই কোরো।'

পার্থ নিজের—এই ব্যবহারে খুবই লজ্জিত হোলেন। একি সেই পার্থ? দ্রৌপদীর মত নারী-রত্নকে লাভ করেও যিনি সংযমের বাঁধনে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন! পার্থ মাথা নীচু করে বসে রইলেন। তাঁর পাশে-বসা সেই যুবতী পার্থের পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললে,—'রাগ কোরো না, আমি তোমাকে সবই দিয়েছি, শুধু একটা দিন, একটা অনুষ্ঠান; তার পরে আর কোন বাধা থাকবে না। এইবার খেয়ে নাও, নইলে আমি খুব কষ্ট পাবো।'

পার্থ যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার অশ্রু-মাখা

চোখ দুটি থেকে জল গড়াচ্ছে। পার্থ নিজের হাতে তার গোলাপ-কোমল কপোলের অশ্রু-রেখা মুছিয়ে দিলেন। এইবার যুবতী খাবারগুলি পার্থের মুখের কাছে তুলে ধরলে। খাওয়া হলে যুবতী থালাটি নিয়ে বেরিয়ে গেল। অদৃশ্য হবার আগে আর একবার পার্থের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে।

ঐ দৃষ্টি যেন পার্থকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছে। দ্রৌপদীর সাহচর্য শীতল পানীয়ের ন্যায় দেহ-মনকে এক অপূর্ব তৃপ্তি দান করে; কিন্তু এই পাবতীর সাহচর্য উগ্র মদিরার ন্যায় দেহ-মনকে শুধু চঞ্চলই করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই নারী-দেহের সর্ব অঙ্গের স্পর্শ-সুখকে লুণ্ঠন করতে না পারে, ততক্ষণ সে শান্ত হয় না। একি স্থান-মাহাত্ম্য, না – স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ?

কিছুক্ষণ পর সেই কক্ষে গৃহকর্তা প্রৌঢ় প্রবেশ করলেন। সম্মুখে-রাখা একটি আসনে বসে তিনি বলতে থাকেন, –'তোমার তো কোন কষ্ট হয় নি ?'

পার্থ মাথা নেড়ে জ্যানালেন,—'না তাঁর কোন কষ্ট হয় নি।'

—তোমাকে এখন আমাদের সব পরিচয় দেওয়া দরকার।—এই পাহাড় আমাদের জন্ম-স্থান, এর কোলেই আমরা মানুষ; আমরা নাগ-বংশের লোক, তাই নাগ-জাতি বলেই পরিচিত। বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব কম-ই; আমাদের মেয়েরা সম্পত্তির মালিক, কাজেই তারা বিবাহ করে পিতৃ-গৃহেই থাকে। এ আমার একমাত্র কন্যা—আমার এই নাগরাজ্যের উত্তরাধিকারিণী। এর বিবাহ হয়েছিল ছোট বেলায়ই; কিন্তু অল্পদিন পরেই স্বামীটি মারা যায়। আর বিবাহ করতে 'ও' রাজি হয় না। সে স্বামীর কথা বোধ হয় ওর মনেই নেই; কারণ সে অনেক দিনের কথা, তখন এ ছিল নাবালিকা। বিয়ের প্রতি ওর কেমন একটা ভয়। হঠাৎ এখন দেখছি,—বিয়ে করতে ইচ্ছুক। বোধ হয়, তোমাকে দেখে ওর ভাল লেগেছে। আমাদের স্বজাতি অনেক

যুবকই একে বিবাহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু 'ও' রাজি হয় নি। কালই তোমাদের বিবাহ অনুষ্ঠান।

—আমার পরিচয় তো আপনারা জানেন না, অপরিচিত লোকের সঙ্গে কন্যার বিবহ দেবেন? আমার মত আছে কিনা, সেটাই বা জানলেন কি করে?

—তোমার পরিচয় আমরা যতটা জানি, তাই যথেষ্ট। তুমি তো পঞ্চ-পাণ্ডবের একজন। পাণ্ডবেরা রাজপুত্র—বড় যোদ্ধা। এই পরিচয়ই যথেষ্ট। তোমার তো' মত আছেই, নইলে আমার মেয়েই বা বলবে কেন—কাল তোমাদের বিয়ে?

—কিন্তু আমি তো আপনার গৃহে দীর্ঘকাল থাকতে পারব না। আমি ভারত-পরিক্রমায় বের হয়েছি। এখনও দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল বাকী।

—কতদিন এখানে থাকবে, না থাকবে, সে বিষয়টি বোঝাপড়া হবে তোমাতে আর আমার কন্যা উলুপীর মধ্যে। আমি এ নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছি না এই জন্য যে, এখন সে সাবালিকা, নিজের ভাল মন্দ বুঝতে শিখেছে। এতদিন বিয়ে করতে রাজি হয় নি বলে আমার মন খুব খারাপ ছিল। কারণ ওর সন্তান হবে এ রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর। বিবাহ না হলে সন্তানও হবে না, তখন এ রাজ্যের অধিকার আমার বংশের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আজ যখন সে তোমাকে বিবাহ করতে রাজি হয়েছে, তাতেই আমি খুব খুশী। তোমার আর শিবিরে যেতে হবে না, তুমি এখানেই থাকবে। তোমার লোকজনকে বলে দিয়েছি—কালই তোমাদের বিবাহ-অনুষ্ঠান। তোমার লোকজনেরাও এরপর এখানেই থাকবে।

পরের দিন বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সারাদিন হৈ চৈ, লোক জনের খাওয়া-দাওয়া। অনুষ্ঠানের সময় উলুপী বধূ-বেশে

লজ্জাবতী লতার ন্যায় পার্থের পাশে পাশে থেকেছে। তারপর আর তার দেখা নেই।

রাত্রির আহারাদি সেরে পার্থ তাঁর শয়ন-কক্ষে শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবছেন,—একি হোল? কেশব আমাকে ভারত-পরিক্রমায় উৎসাহিত করেছেন—আমর মনের অবস্থা বুঝেই। মৃত নাগরাজ চন্দ্রচূড়ের সেই আট বৎসরের শিশু-কন্যার ভীতত্রস্ত মুখখানি কতবার মনে পড়েছে; এখন যেন তা হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন তাঁর মনের পর্দায় সেই স্হানে উলুপী দাঁড়িয়ে আছে। তাই পার্থ মনে মনে কল্পনাময় রঙীন স্বপ্ন দেখছেন।

অনেক সময় অতিবাহিত হোল—উলুপীর দেখা নেই। ভাবতে ভাবতে পার্থের চক্ষু দু'টি তন্দ্রায় মুদিত হয়ে এলো। হঠাৎ এক সময় কক্ষের দরজা বন্ধের শব্দে তিনি তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে শয্যায় উঠে বসলেন। দরজার দিকে তাকিয়ে তিনি আর চোখ ফেরাতে পারলেন না। একি উলুপী— না স্বর্গের কোন অপ্সরা? অনুষ্ঠান কালের সেই ব্রীড়ানত বধূটির একি অপরূপ রূপ! দেহে তার অতি স্বল্প আবরণ। নিম্ন অঙ্গে কটিতে জড়ানো হাঁটু পর্যন্ত স্বল্প পরিসর একটি হালকা রেশমী বস্ত্র-খণ্ড কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করছে; ঊর্ধাঙ্গে কোন বক্ষ-বন্ধনী নেই, শুধু একটি অতি মিহি ঊর্ণা বুকের ওপর দিয়ে গিয়ে কাঁধের দু' পাশে ঝুলে আছে। ঊর্ণাটি এত মিহি যে, দেহের সর্বাংশ দর্শকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হচ্ছে। পার্থ বিস্ফারিত নেত্রে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মদনের লীলাক্ষেত্র উলুপীর অনাবৃত-প্রায় দেহের দিকে।

উলুপী সেখানে দাঁড়িয়েই অপাঙ্গে তাকিয়ে মৃদুমৃদু হাসছে। পার্থ তাকে কাছে আসার ইঙ্গিত করলেন; উলুপী কয়েক পা এগিয়ে পার্থের প্রায় নাগালের মধ্যে এসে কপট অনিচ্ছা জানিয়ে

হাসতে হাসতে পিছ্‌পা হবার চেষ্টা করতেই পার্থ তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলেন।

উলূপী ধরা পড়ল না, ধরা পড়ল তার ঊর্ণা। অনাবৃত স্তন-যুগলের লজ্জা নিবারণের অছিলায় উলূপী তার ভাঁজ করা বাহু দু'টি তির্যকভাবে বুকের ওপর চেপে ধ'রে জয়ের হাসি হাসতে লাগল। পার্থ এ পরাজয় মেনে নিতে রাজি নন। তিনি উলূপীর সান্নিধ্যে এসে তার বাহু দু'খানি আকর্ষণ করে নিজ-কণ্ঠে জড়িয়ে চুম্বনে চুম্বনে তার রাঙা কপোল দু'টিকে আরো রাঙিয়ে দিলেন। নাগিনী এবার দলিতা ফণীনীর ন্যায় পার্থের মুখে গণ্ডে দংশনের ভঙ্গিমায় চুম্বন করতে করতে উত্তেজনায় শিহরিত হয়ে উঠল। পার্থের পৌরুষ জাগ্রত হোল। তিনি উলূপীকে তাঁর সবল বাহুদ্বয়ের ওপর তুলে পুতুলের ন্যায় দোল খাইয়ে শয্যায় শুইয়ে দিলেন। নগ্ন-নারী দেহের সর্ব অঙ্গের স্পর্শে পার্থের সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তখন উভয়ে রতি-লীলায় মেতে উঠলেন। তারপর খেলা শেষে ক্লান্ত উলূপী অবসন্ন দেহে পরম নিশ্চিন্তে পার্থের প্রশস্ত বক্ষে লীন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নারীর ভালবাসা আর দেহ-সম্ভোগের মধ্যে যে এত মাদকত. এর আগে পার্থ তার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নি। উলূপী যেন এক সুখের স্বপ্নপুরীতে নিয়ে গিয়ে তার হৃদয়ের রাজাসনে বসিয়ে যৌবনোচ্ছলিত দেহের নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রেমপুষ্পে তাঁর পুজো করছে। এ সুখ বর্ণনাতীত। পার্থ আজ উলূপীর দেহমনের একেশ্বর অধিপতি। উলূপীর প্রেমে তিনি ডুবে গিয়েছেন, আকণ্ঠ পান করছেন তার প্রেমসুধা। বহির্জগৎকে তিনি ভুলে গিয়েছেন। দিন-রাত্রিও তাঁর অনুভূতির বাইরে। উলূপীর দেহ-বল্লরী তাঁর কণ্ঠহার। সেই কণ্ঠহারকে নিয়ে তিনি খেলা করেন, দোল খাওয়ান, সেই দোলায় নিজেকেও এক সময় হারিয়ে ফেলেন ঐ কণ্ঠ-হারের মধ্যে। এমনি ভাবে দিন কেটে যাচ্ছে।

উলূপী তার দেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে বীর পার্থের একান্ত আপন হয়ে সর্বদা তাঁর বক্ষলগ্ন থেকে যে সুখানুভূতি লাভ করেছে, তাতে সে তার নারী-জন্মকে সার্থক মনে করে আনন্দে ভরপুর। বীর পার্থকে সে জয় করতে পেরেছে,—এ তার গর্ব। এমনি সুখসাগরে ভাসতে ভাসতে কোথা দিয়ে একটি বৎসর নাগপুরীর অন্তঃপুরে তাদের কেটে গেল, তারা টেরও পেল না।

তারপর উলূপীর দেহে দেখা দিল সন্তানের লক্ষণ। নাগরাজ কোরব্য যেদিন এ খবর জানতে পারলেন, সেদিন তাঁর আর আনন্দ ধরে না। এ নাগ রাজ্যের অধিকার আর তাঁর বংশের হাতছাড়া হবে না।

পার্থের কণ্ঠহার উলূপী সন্তানের মা হতে চলেছে, সে সন্তান পুত্র কি কন্যা কে বলতে পারে? পার্থ ও উলূপী উভয়েই আনন্দিত। উলূপীর প্রেম পার্থকে বাইরের জগৎ ভুলিয়ে রেখেছে। উলূপীর প্রেমবন্ধনকে ছিন্ন করা যেন পার্থের সাধ্যাতীত; কিন্তু একদিন তাঁর এই শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তি নিতেই হবে। কারণ সখা কেশব তাকে যে কর্তব্য-কর্মে নিয়োজিত করেছেন, তা এখনও শেষ হয় নি।

এরপর যথা সময়ে উলূপীর একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হোল। উলূপীর পিতা এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করলেন সেই উপলক্ষে। নাগপতি কৌরব্য নব-জাতকের নাম রাখলেন ইরাবান।* উৎসব শেষে একদিন উলূপী পার্থের কাছে বসে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা বলছিল।

পার্থ বললেন,—'তুমি যদি পুত্রকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে না গিয়ে এখানেই থাক, তবে পুত্রের ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব তোমার। একটা কথাই তোমাকে বলব,—বংশের গৌরব যেন সে রক্ষা করতে পারে। এবার আমাকে বিদায় দিতে হবে, উলূপী!'

---

* ইরাবান্ = পৃথিবীপতি।

—তুমি কি আর আমার কাছে তৃপ্তি পাও না? আমার সেবায় কি তোমার মন ভরছে না? আমার দেহমন সবই উজার করে দিয়ে তোমার সেবা করছি। আমার বলে তো আর কিছু রাখি নি। তবু কি তুমি তৃপ্ত নও?........

উলুপীর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে এলো।

—আমার কর্তব্য পথে বাধা হ'য়ো না, প্রিয়ে! এইটুকু আমার অনুরোধ। তোমার কাছে যা পেয়েছি, তার তুলনা নেই। আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও, প্রিয়তম!

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উলুপী পার্থের বুকে মুখ রেখে বললে,—'আমার এই সুখ-নীড় ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাবে, নিষ্ঠুর?'

—অমন করে বোলো না, প্রিয়তম!—এই বলে পার্থ দু'হাতে উলুপীর মুখখানা তুলে ধরে তার অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'তোমার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব-অন্তঃপুর সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। যখন ইচ্ছে তুমি যাবে, সেখানে তুমি সসম্মানে প্রবেশাধিকার পাবে।'

উলুপী আবার পার্থের বুকে মুখ লুকাল।

* * * * *

নাগপুরী ছেড়ে রক্ষীদের নিয়ে পার্থ পূর্বাভিমুখে চললেন। অপূর্ব সুন্দর নদী-উপত্যকা। দু'দিকে পাহাড়, তাতে নানা শ্রেণীর বৃক্ষ, বনফুল, মাঝে মাঝে ঝরনা —প্রকৃতির অফুরন্ত দান। পার্থ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। তাঁর অতীত তিনি ভুলে গেলেন; আবার এক নবজীবনের সন্ধান পেলেন তিনি। সখা কেশবের কথা মনে হতেই কৃতজ্ঞতায় তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণতি জানান। পথে যেতে যেতে মাঝে মাঝেই শিবির ফেলে সেই বন-প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে ঘুরে তার অনুপম শোভায় মুগ্ধ হয়ে ভারত-ভূমির বিচিত্রতায় বিস্মিত হতেন। ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থে বিশ্রাম করে আবার চলেছেন। অযোধ্যা, কোশল, বিদেহ মিথিলা প্রভৃতি

রাজ্য অতিক্রম করে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। কখনও সমতল, কখনও নদী-উপত্যকা, কখনও শ্যামল বনভূমি অতিক্রম করছেন। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে কয়েকটি বৎসর কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা, প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেছেন। ভারতের পাহাড়, নদী ও তার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছেন পার্থ। এখন পার্থ কলিঙ্গ অতিক্রম করে মহেন্দ্র পর্বতাঞ্চলে এলেন। কিছুদিন পর মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করে এক ঝরনার ধারে শিবির স্থাপন করলেন। স্থানটি তাঁর কাছে খুব ভাল লাগছিল।

একদিন শিকারের উদ্দেশ্যে বন-পথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখলেন, এক অশ্বারূঢ়া নারী অশ্বের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে দুলকি চালে চলেছে। বন-পথে বিদেশী শিকারীকে দেখে সে অশ্বের বল্গা টেনে ধরে অশ্বের গতি রুদ্ধ করল। পার্থ দেখলেন— অশ্বারোহিণীর কাঁধে ধনুক, পিঠে তূণ, ক্ষীণ কটিদেশে কোষ-বদ্ধ তরবারি, গিরিচূড়া শোভিত প্রশস্ত বক্ষ, গজকুম্ভ নিতম্ব ; আঁটসাঁট পোশাক, দেহের অপূর্ব গঠন। পার্থ বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে তাকাতেই দৃষ্টি বিনিময় হোল। উভয়েই কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ এক সময় অশ্বারূঢ়া অশ্বকে ধাবিত ক'রে কয়েক পা অগ্রসর হতেই আবার অশ্বের রাস টেনে ধরলে। অশ্বটি সম্মুখের দু'পা উঁচু করে থামতেই আরোহিণী ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকা তলোয়ারের মত তির্যক দেহে পেছন ফিরে তাকাল ; দেখল—বিদেশী শিকারীটি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আবার দৃষ্টি-বিনিময়। লজ্জা পেল নারী। পা-দানীর সংকেতে অশ্বটি ধীরগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। দু'এক পা যেতেই আরোহিণী আবার পেছন ফিরে তাকাল। তখনও পার্থ তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার আরোহিণী অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

পার্থ অশ্বারোহিণীর এরূপ ব্যবহারের মর্মোদ্ধার করতে চেষ্টা করলেন। শিবিরে গিয়েও তিনি অশ্বারোহিণীর কথা ভুলতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে উলূপীকে মনে প'ড়ে গেল। কে সুন্দর? দু'জন, মনে হয়, দুই মেরুবাসিনী। উলূপী শুধু সেবা পরায়ণা নয়, আদর্শ শয্যা-সঙ্গিনী—; আর একে দেখে মনে হয়—রণ-রঙ্গিণী রণ-সঙ্গিনী। যোদ্ধার আদর্শ জীবন-সঙ্গিনী। কে 'ও'? কী-ই বা পরিচয়? একবার ওকে জানতে ইচ্ছে করে পার্থের। কি উপায়ে তা সম্ভব? আগামীকালও পার্থ ওইখানে শিকারে যাবেন, যদি ওর দেখা পাওয়া যায়। অশ্বারোহিণী চলে যেতে যেতে বারবার ফিরে ফিরে পার্থকে তাকিয়ে দেখছিল। পার্থের মত সেও হয়তো কৌতূহলী তাঁর পরিচয় জানার জন্য। উলূপী বলেছিল —বীরেরাই নারীর হৃদয় সহজে জয় করতে পারে। তা যদি হয়, —তবে........

পরের দিন সেই একই সময়ে পার্থ সেই আগের দিনের স্থানটিতে চলে গেলেন। সেদিন পার্থ রীতিমত যোদ্ধৃবেশে সেজেছিলেন। কটিবন্ধে কোষবদ্ধ তরবারি এবং এক হাতে ধনুক ও আর একহাতে বাণ নিয়ে শিকারের অনুসন্ধানে চারদিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করলে মনে হবে —শিকারের অনুসন্ধান যেন একটা ভানমাত্র। হঠাৎ অশ্বের পদশব্দ তাঁর কর্ণগোচর হতেই তিনি সেই বনস্থিত পথের দিকে তাকালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহিণীকে দেখতে পেলেন। তিনি ধনুকটি কাঁধে এবং বাণটি তূণে তুলে রাখলেন। ততক্ষণে অশ্বারোহিণী পার্থের সন্নিকটে এসে পড়েছে। পার্থকে ধনুকবাণ সংবরণ করতে দেখে সেই নারী অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে নেমে বল্গা ধরে দাঁড়িয়ে অশ্বটিকে সংযত করে বললে,—'শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল?'

কিন্নর-কণ্ঠী যুবতীর কণ্ঠস্বরে পার্থ একটু বিস্মিত হলেন

বটে ; পরক্ষণেই তার কথার জবাবে বললেন,—'না, শিকার হাতছাড়া হয় নি ; শরবিদ্ধ হবার আগেই সে ধরা দিয়েছে।'

পার্থের এই বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে সুনিতম্বিনী তেজোস্বিনী নারী মুগ্ধ চিত্তে উত্তর দিলে,—'যাকে তুমি শিকার ভাবছ, আসলে সে শিকার নয়, সেও শিকারী। কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখতে পার।'

পার্থ এই অপরিচিতার নির্ভীক উত্তরে চমৎকৃত হয়ে তৎক্ষণাৎ বললেন—

—তা'হলে তীর-ধনুকেই আগে পরীক্ষা হোক্। ঐ যে বৃক্ষ চূড়ায় দুটি কচি-পল্লবিত শাখা দেখা যাচ্ছে, তার একটি কাটবে তুমি, আর অপরটি কাটবো আমি।

—বেশ!

বলেই নারী ধনুকে শর যোজনা করে নির্দিষ্ট শাখাটি কেটে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে মধ্যে অপর শাখাটিও পার্থ শরাঘাতে কেটে ফেললেন।

তারপর পার্থ বললেন,—'তরবারি চালনার পরীক্ষাটিও হয়ে যাক্।'

সঙ্গে সঙ্গে তেজোস্বিনী অসি কোষ-মুক্ত করে পার্থকে আক্রমনোদ্যত হতেই সে-আক্রমণ প্রতিহত করতে তড়িৎ-গতিতে পার্থ যেই নিজ-অসিদ্বারা প্রত্যাঘাত করলেন, বিপক্ষের তরবারি তখন অকল্পনীয় ভাবে ভূলুণ্ঠিত। বিস্মিত হয়ে নারী মাথা নত করলে।

পার্থ তখন হেসে বললেন,—'হেরে গেলে তো?' নারী ইঙ্গিতে সম্মতি জানাল।

পার্থ বললেন,—'আর একবার না হয় চেষ্টা কর।'

নারী এইবার লজ্জারঞ্জিত মুখখানি তুলে পার্থের দিকে তাকিয়ে বললে,—'তুমি কে?'

—আমি কুরুবংশোদ্ভব তৃতীয় পাণ্ডব।—তুমি?

নারী বিস্মিত স্বরে বললে,—'দ্রুপদ-রাজ-কন্যার স্বয়ম্বরে লক্ষ্যভেদ ক'রে যিনি পাঞ্চালীকে লাভ করেছেন?

পার্থ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—আমার ধৃষ্টতা মাপ করুন, হে বীর শ্রেষ্ঠ! আগে আপনাকে চিনতে পারলে আমি কিছুতেই আপনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অগ্রসর হতেম না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

—তুমি কে—তা তো বললে না?

—আমি মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা।

—তোমার বীর্যবত্তায় আমি মুগ্ধ হয়েছি, রাজকন্যা! তুমি আমার জীবন-সঙ্গিনী হলে আমি কৃতার্থ হবো।

—তা কি করে সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয়?

—আপনি বিবাহিত।

—ক্ষত্রিয়ের একাধিক স্ত্রীগ্রহণে বাধা নেই।

—আমি তো স্বাধীনা নই!

—আমি তোমার পিতার নিকট আমার ইচ্ছা জানাবো।

—আমি এখন যাই।'—এই বলেই পার্থকে আর কিছু বল্যার সুযোগ না দিয়ে চিত্রাঙ্গদা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হয়ে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করলে।

পার্থ অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর শিবিরে চললেন।

পার্থ সেদিন সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটালেন। পরদিন যথা নিয়মে স্নানাদি সেরে আহার শেষ করে গতরজনীর অনিদ্রা-জনিত ক্লান্তি দূর করতে বিশ্রামের জন্য শিবিরে অসময়ে শয্যায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার কথা তিনি ভুলতে পারছেন না। ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিদ্রান্তে দেহের ক্লান্তি অনেকটা দূরীভূত হয়েছে। তারপর আনমনে এক সময়

শিবির থেকে বের হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই পরিচিত স্থানটিতে এসে উপস্থিত হলেন। এই সময়েই গত দু'দিনে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর দেখা। আজও তিনি চিত্রাঙ্গদাকে দেখার আশায় আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বেলা পড়ে এলো। চিত্রাঙ্গদা এলো না। বিষণ্ণমনে পার্থ শিবিরে ফিরে এলেন। তিনি ভেবে অবাক্ হয়ে যান—দ্রৌপদীর বিবাহের কথা এই সুদূর পাহাড়-অঞ্চলেও জানাজানি হয়েছে কি ভাবে! এখানেও কি কেশবের কোন গোপন হাত কাজ করছে? চিত্রাঙ্গদাই এখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। এমন জীবন-সঙ্গিনী পেলে তাঁর যোদ্ধৃজীবন সার্থক। চিত্রাঙ্গদা-লাভের অন্তরায় কি তাহলে দ্রৌপদী? কিন্তু নাগকন্যা উলূপীতো জেনে-শুনেই তাঁকে বিবাহ করেছে। তবে? পার্থ একবার রাজদ্বারে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে চান। কিন্তু আবার ভাবেন, যদি তিনি বিমুখ হয়ে ফিরে আসেন? তাই সেখানে যাওয়া তার হোল না। এখন রোজই একবার করে সেই সাক্ষাতের জায়গাটিতে যান, যদি চিত্রঙ্গদার দেখা পান, তা হ'লে আর একবার তাকে অনুরোধ করবেন।

সেদিনও পার্থ সেই পরিচিত স্থানটিতে চিত্রাঙ্গদার দেখা না পেয়ে বিমর্ষ হৃদয়ে মণিপুর-রাজ-প্রাসাদের দিকে আনমনে যাচ্ছিলেন। কিয়দ্দূর গিয়ে গতি পরিবর্তন করে প্রাসাদ-সংলগ্ন উপবনের দিকে পা বাড়ালেন। দূর থেকে দেখলেন—চিত্রাঙ্গদা একটি ঝরনার ধারে একটি উপলখণ্ডের ওপর বসে কণ্ঠস্থিত পুষ্পহার থেকে দু' একটি পুষ্প নিয়ে ঝরনার স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। একজন সহচরী তার বেণী-বদ্ধ কেশে ফুলের মালা জড়িয়ে দিচ্ছে, আর একজন চিত্রাঙ্গদার দু'হাতে ফুলের অলঙ্কার পরিয়ে দিচ্ছে। চারদিকের পরিবেশটিও মনকে সত্যই আকৃষ্ট করে। উপবনে যেখানে সেখানে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে আছে। সহচরীরা সেই সব ফুল তুলে মালা গেঁথে চিত্রাঙ্গদাকে সাজাচ্ছে।

পার্থ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঐ দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ একজন সহচরী বিদেশী পথিককে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে,—এখানে দাঁড়িয়ে কেন সে? এখানে রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা সান্ধ্য-ভ্রমণে এসেছেন; এখন এখানে অপরের আসা নিষেধ।

সহচরীর কথা শুনে চিত্রাঙ্গদা মুখ ফেরাতেই পার্থকে দেখতে পেল। সে তখন পাশের সহচরীকে কানে কানে কি যেন বললে। সহচরীটি উঠে এসে অপরটিকে বললে,—'চল, সখি, আমরা এখন যাই,—এ পথিক আমাদের রাজ-কন্যার মন-চোর।'

তারা উভয়ে রাজ-অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল।

পার্থ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চিত্রাঙ্গদার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে তার দু' কাঁধে হাত রাখলেন। চিত্রাঙ্গদা না ফিরেই তার হাত দুটিও দু'কাঁধে পার্থের হাতের ওপর রাখল। সে স্পর্শে পার্থ পুলকিত হয়ে চিত্রাঙ্গদার মাথার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে চিত্রাঙ্গদার মুখখানি নিজের মুখের কাছে তুলে ধরলেন। উভয়ের অধর উভয়কে স্পর্শ করল। চিত্রাঙ্গদা চোখ মুদিত করলো। তারপর হঠাৎ সে পার্থের কবল-মুক্ত হয়ে সরে গেল। পার্থ এগিয়ে গিয়ে চিত্রাঙ্গদার ডান হাতখানা চেপে ধরে বললেন,—'আমাকে বিমুখ কোরো না, চিত্রাঙ্গদা!'

চিত্রাঙ্গদা ধীরে ধীরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে,—'কাল আমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে আমাদের বাড়ী এসো।'—বলেই চিত্রাঙ্গদা ছুটে পালিয়ে গেল।

পার্থ ভাবতে লাগলেন—নারী-প্রকৃতি কী বিচিত্র! তিন নারী তিন ধারা, কিন্তু সবাই ছুটেছে এক-ই অমৃত-কুম্ভের সন্ধানে।

পরদিন পার্থ যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে মণিপুর রাজবাড়ীতে গিয়ে সংবাদ-পরিবাহককে বললেন,—তিনি রাজার দর্শন-প্রার্থী।

কিছুক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা তাঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে

একটি সজ্জিত কক্ষে বসাল। অল্পক্ষণ পরেই মণিপুর-রাজ চিত্ররথ (চিত্রভানু) কক্ষে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। পার্থ তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

চিত্ররথ জিজ্ঞেস করলেন—কি উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন এবং তাঁর পরিচয়ই বা কি?

তখন পার্থ বললেন,—'আমি কুরুবংশোদ্ভব পাণ্ডুপুত্র, তৃতীয় পাণ্ডব। ভারত পরিক্রমায় বের হয়ে বহু দেশ অতিক্রম করে বর্তমানে ক'দিন যাবৎ আপনার রাজ্যে এসেছি।'

রাজা চিত্ররথ তখন বললেন,—'আপনি তা'হলে বিখ্যাত ধনুর্ধর মহাবীর অর্জুন? আপনি আমার সম্মানিত অতিথি।'—বলেই তিনি আসন থেকে উঠে এসে পার্থকে আলিঙ্গন করে বললেন,—'আপনি এখন রাজ-অতিথি; যে ক'দিন খুশি, রাজ ভবনেই আপনি থাকুন।'

—আমার সঙ্গে কয়েকজন রক্ষী রয়েছে, তাদের নিয়ে আমি শিবিরে থাকি।

—না, এখন থেকে রক্ষীরাও এখানেই থাকবে।

—আপনার কাছে আমার একটি ইচ্ছা ব্যক্ত করতে চাই।

—বলুন!

—আপনার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে আমি বিবাহ করতে চাই।

—তা কি ক'রে সম্ভব?

—কেন?

—শোন, আমাদের বংশে দেবতার আশীর্বাদে বংশ পরম্পরায় একজন করে পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং সে-ই এ রাজ্যের রাজা হয়। কিন্তু ভাগ্যের এমনই খেলা,—আমার কোন পুত্র-সন্তান হোল না, হোল একমাত্র কন্যা এই চিত্রাঙ্গদা। কাজেই আমি মনে করেছি—কোন যোগ্য পাত্রে কন্যা দান করে তাকেই এ রাজ্যের রাজা করে দেব। সেইজন্য কন্যাকে পুত্রবৎ পালন করেছি, যাতে এই রাজ্যের

শাসন ও প্রতিরক্ষার কার্যে সে তার স্বামীকে সাহায্য করতে পারে। তুমি কুরুবংশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান, তোমার পক্ষে কি এখানে থাকা সম্ভব ?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে পার্থ বললেন,—'তা অবশ্য সম্ভব নয়। তবে আমি যতদূর জানতে পেরেছি,—আপনার কন্যা আমার প্রতি আকৃষ্টা এবং আমিও তার প্রতি আকৃষ্ট। সেই জন্যই আমি বিবাহের প্রস্তাব করেছি।'

রাজা চিত্ররথ বললেন,—'তুমি একটু বোস ; আমি এক্ষুনি অন্তঃপুর থেকে আসছি।' বলেই তিনি অন্তঃপুরে চলে গেলেন এবং কিছু সময় পরে সেই কক্ষে আবার প্রবেশ করে আসনে বসলেন।

তারপর চিত্ররথ বললেন,—'আমার কন্যা তোমার প্রতি আকৃষ্টা, সে কথা মিথ্যে নয়, এবং তাতে দোষেরও কিছু নেই ; কারণ তোমার মত বীর্যবান্ স্বামী সকল নারীরই কাম্য। সমস্যাতো একটাই। তবে একশর্তে তোমাদের বিবাহ সম্ভব। যদি রাজি থাকো—

—বলুন—কি সে শর্ত।

—এই চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র এই মণিপুর রাজ্যের রাজা হবে এবং যতদিন সে সাবালক না হবে, ততদিন চিত্রাঙ্গদা পুত্রের সঙ্গেই বাস করবে ; কারণ আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কাজেই পুত্র রাজ্য চালনার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদাকেই রাজ্য পরিচালনা করতে হবে।

—হ্যাঁ, তাতেই আমি রাজি।

চিত্রাঙ্গদা-অর্জুনের বিবাহ হয়ে গেল। পার্থ চিত্রাঙ্গদাকে জীবন-সঙ্গিনী পেয়ে নিজেকে পরম সুখী মনে করতে লাগলেন। চিত্রাঙ্গদাও অর্জুনকে স্বামীরূপে পেয়ে ভাবল—তার নারী-জন্ম সার্থক। চিত্রাঙ্গদার সাহচর্যে অর্জুন নিজেকে নতুন করে চিনতে

লাগলেন। নারী যে পুরুষের শুধু ভোগ-বিলাসের সামগ্রী নয়, সে পুরুষকে মহত্তর জীবনের সন্ধান দিতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের সহায় হতে পারে। সংসারের সকল কর্তব্য-সাধনে উভয়ে উভয়ের পরিপূরক—গৃহে বা গৃহের বাইরে। শিকারে, বন-ভ্রমণে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের পাশে-পাশে থেকে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রেম-পূজার এক স্বর্গীয় আনন্দে তাঁরা জীবনের একটি বৎসর কাটিয়ে দিলেন।

এবার চিত্রাঙ্গদা পুত্রবতী হলো। পার্থের মোহ ভাঙ্গল। যে মহান্ কর্তব্য করতে কেশব তাঁকে পাঠিয়েছেন, এখনও তা সম্পূর্ণ হয় নি। তাই তিনি চিত্রাঙ্গদার কাছে বিদায় চাইলেন।

চিত্রাঙ্গদা বললে,—কোন্ প্রাণে তোমায় বিদায় দেব, সখা? এখনও তো আমার যৌবনের তৃষ্ণা মেটে নি! তোমার সোহাগে আমি যে আত্ম-হারা; তোমার ভালোবাসায় আমি যে সুখ-স্বপ্নে বিভোর। আমার সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবে, প্রিয়তম? তোমায় সেবা করে এখনও যে আশা মেটে নি! আমার প্রেমের সুধাভাণ্ড এখনও যে পরিপূর্ণ! আমার কামনার আগুন যে এখনও শীতল হয় নি, সখা! এই অগ্নিদাহ নিয়ে কি আমাকে বাকী জীবন কাটাতে হবে?'

চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

চিত্রাঙ্গদার ব্যাকুলতায় পার্থও বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন,—'তুমি যদি হাসিমুখে বিদায় না দাও, প্রিয়তম! তবে তো আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না। আমারই কি তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে? তোমার দেহের সুখস্পর্শ, তোমার সঙ্গীত, তোমার নৃত্য, তোমার প্রেম আমাকে জগতের সব কিছু ভুলিয়ে রেখেছে, সখি!' পার্থ চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে তার কপোলে কপোল রেখে সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলেন,—'তুমি বীরাঙ্গনা, এ ব্যাকুলতা তোমার সাজে না, প্রিয়তম! তুমি বীর-

পত্নী, বীর-পুত্রের জননী হওয়ার গৌরব তোমাকে অর্জন করতে হবে। তারপর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তুমি চলে আসবে পাণ্ডব-অন্তঃপুরে। সেখানেও তুমি গৌরবের আসনেই অধিষ্ঠিত হবে নিঃসন্দেহে।'

মণিপুর ছেড়ে রক্ষিগণসহ পার্থ দক্ষিণা-বর্ত্ম হলেন। কিছুদিন পর তামিল দেশে প্রবেশ করলেন। দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলে এসে সেখান থেকে সমুদ্রশোভা দেখলেন, তাতে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেলেন; ধূ ধূ করা অনন্ত জলরাশি; কি অসীম শক্তির আধার। নিজেকে তখন অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হতে লাগল পার্থের। বৃথাই মানুষ তার শক্তির দম্ভ করে; এই অনন্ত বারিরাশির এক কণা জল-বুদ্বুদ অপেক্ষাও যে সে ক্ষুদ্র। পার্থের মন থেকে তখন তাঁর শক্তির গর্ব কোথায় মিলিয়ে গেল।

তারপর তিনি সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকে পশ্চিম সাগরের উপকূল বেয়ে উত্তরদিকে রওনা হয়ে তাপ্তী ও নর্মদার মোহনা অতিক্রম করে সৌরাষ্ট্রে প্রবেশ করলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি প্রভাস ক্ষেত্রে এলেন এবং সেখানে প্রভাস তীর্থে অবগাহন করে দীর্ঘপথ অতিক্রমের ক্লান্তি উপশমের জন্য বিশ্রামাশায় সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। সে সংবাদ দ্বারাবতীতে পেঁৗছিতেই কেশব রথারোহণে প্রভাসে এসে ধনঞ্জয়কে স্বাগত-সম্ভাষণ জানালেন এবং আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। দীর্ঘদিন অর্থাৎ প্রায় একাদশ বৎসর পর কেশবের দেখা পেয়ে পার্থ পথশ্রমের কষ্ট মুহূর্তে ভুলে গেলেন। পরদিন কেশব বললেন,—'সখা, আমরা আজই রৈবতকে রওনা হবো। সেখানে তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে বসে তোমার এই দীর্ঘদিনের পরিক্রমার কথা সব শুনব। সে সব শোনার জন্য আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি।'

প্রভাস থেকে রওনা হয়ে কৃষ্ণার্জুন রৈবতকে চললেন। প্রথমে

তাঁরা রৈবতকের পূর্বাংশে যেখানে যোগশৃঙ্গ অর্থাৎ ব্যাসাশ্রম, সেখানে গেলেন। পাহাড়ের সানুদেশে (অধিত্যকা) নানা আকারের পল্লব-কুটির। পর্বত-গাত্রে নানা ধরণের বৃক্ষশ্রেণী, পুষ্প-শোভিত লতা বল্লরী, নিম্নে শৈলসুতা সরস্বতী ; তার তীরে নানা রঙের ও নানা ধরণের পশু ও পাখী—নির্ভয়ে বিচরণ করছে। আশ্রমের পথে আশ্রম শিশুগণ ক্রীড়ারত। একস্থানে এক ভীষণ শার্দুল পথ রোধ ক'রে নিদ্রামগ্ন। তাকে দেখামাত্র অর্জুন কার্মুক ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেশব বলে উঠলেন,—'কর কি ? ও যে মহর্ষির পালিত,—নাম সুবোধ ; আরও একটি আছে, তার নাম সুশীলা। মাংসাশী হিংস্র প্রাণী, আশ্রমের পরিবেশে এবং ব্যাসদেবের শিক্ষায় ওরা হিংসা ভুলে, শোণিতের লালসা ভুলে এখন নিরামিষাশী, ফলমূলাহারী। হিংসা ভুলে গিয়ে ওরা অন্যান্য আশ্রম-বাসীর মত পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।

একজন আশ্রম-বালক বললে,—'সুবোধ, পথ ছাড়।'

তখন 'সুবোধ' মুখ তুলে আগন্তুকদের শান্ত চোখে তাকিয়ে দেখে জৃম্ভণ তুলে তার পা দু'টি সরিয়ে নিয়ে আবার চোখ নিমীলিত করল। আর একটি বালক সুবোধের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করতে লাগল। শার্দুলও আনন্দে তার গা চাটতে লাগল। কৃষ্ণার্জুন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।*

একটু এগিয়ে কেশব অর্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, —'দেখ, ধনঞ্জয় গাছের ছায়ায় মৃগ-শিশুটি একটি যুবতীর সঙ্গে খেলা করছে। একবার ছুটে দূরে চলে যাচ্ছে, আবার ছুটে এসে উপবিষ্টা যুবতীর কোলে মুখ লুকুচ্ছে। আবার তার ক্ষুদ্র পা দু'টি যুবতীর কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে তার গণ্ড লেহন করছে ! যুবতীও তাকে আদরে চুম্বন করছে।'

---

* রৈবতক—(নবীন সেন)

এই ভাবে আশ্রমের নানা আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখতে দেখতে পর্যটকদ্বয় যোগশৃঙ্গে আরোহণ করতে লাগলেন। কটিদেশে তারা দেখতে পেলেন সুন্দর এক অষ্টকোণ বেদী।

কেশব বললেন,—"এই অপূর্ব শোভায় সজ্জিত বেদীটিতে বসে মহামুনি দ্বৈপায়ণ 'বেদ' সঙ্কলন করেছেন। এই জন্য এর নাম 'বেদ-মণ্ড'।" তারপর আরও ঊর্ধ্বে উঠে যোগশৃঙ্গে এলেন তাঁরা। দেখলেন,—বেদীমূলে এক পার্শ্বে 'সুশীলা' নীরবে শাবক-অঙ্গ লেহন করছে। অন্যদিকে 'সুলোচন' ও 'সুলোচনা' আশ্রমপালিত দুটি মৃগ, অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। পার্থ ও বাসুদেব বেদী-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ধ্যান-মগ্ন ব্যাসদেবের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পর ব্যাসদেব চক্ষু উন্মীলন করলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় প্রণাম করে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন।

ব্যাসদেব আশীর্বাদ করে তাঁদের অজিন* আসন বসতে দিলেন।

বাসুদেব তখন বললেন,—'ভারত-পরিক্রমায় নানা তীর্থ-পর্যটন-শেষে ধনঞ্জয় প্রভাসে এসেছেন। এই সংবাদ পেয়ে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছি রৈবতকে। যাবার পথে মহর্ষির চরণ বন্দনা করতে এসেছি।'

ব্যাসদেব বললেন,—'এই তরুণ বয়সে তীর্থ-পর্যটন কেন, ধনঞ্জয় ? এখন তো বাণপ্রস্থ গ্রহণের সময় নয় !'

ধনঞ্জয় বললেন,—'বাণপ্রস্থ নয়, প্রভু ! অশান্ত হৃদয়ের দুর্বিসহ বেদনা প্রশমনের জন্যই এই তীর্থ পর্যটন। আপনার নিকট কিছু গোপন করব না।'—এই বলে ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণের গোধন-হরণের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে অষ্টম বর্ষীয়া চন্দ্রচূড়-কন্যার জন্য তাঁর যে মনস্তাপ, তা-ও সবিশেষ বর্ণনা করলেন। 'কেশবের নির্দেশেই এই পরিক্রমা। এই পর্যটন উপলক্ষে সেই

---

* মৃগচর্ম।

অনাথা বালিকার অন্বেষণও করেছি; কিন্তু আজও তার সন্ধান মেলে নি।'

ব্যাসদেব বললেন,—'তাকে খুঁজে কি লাভ, বৎস? তুমি যে তার দুঃখ দূর করতে পারবে—তাকে সুখী করতে পারবে,—এমন তো কিছু নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ মানুষের সুখ-দুঃখ তার ইচ্ছাধীন নয়। সমুদ্র-তরঙ্গে যে বালুকণা ভেসে বেড়ায়, সে যেমন ইচ্ছাধীন নয়, তরঙ্গ-স্রোতে সে কোথায় ভেসে যাবে, তার কোন ঠিক নেই, সে নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র, মানুষের ভাগ্যও তেমনি;—নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র।'

এ কথা বাসুদেব এর আগেও শুনেছিলেন পালক-পিতা নন্দ ঘোষের নিকট। আজ মহর্ষির কাছেও সেই কথা শুনলেন। নন্দের প্রাজ্ঞতায় তাঁর প্রতি আরও গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর মন ভরে উঠল। কৌতূহলী হয়ে তখন বাসুদেব বললেন,—'দেব, জড় ও চেতন-সবই কি অবস্থার দাস? তবে কি মানুষের কোন স্বাধীন চিন্তা নেই—ইচ্ছাশক্তি নেই?'

ব্যাসদেব বললেন,—'সবাই অবস্থার দাস, বৎস, মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হয় বটে, কিন্তু ইচ্ছামত ফললাভ সবসময় হয় না। দেখেছ তো, ঝ'রে পড়ার সময় না হতেই ঝটিকার সময় অকালে কত অপক্ক ফল মাটিতে ঝ'রে পড়ে! তাই বলি, কর্ম মানবের ইচ্ছাধীন হলেও তার সফলতা তার ইচ্ছাধীন নয়। অর্জুন কি জানতে পেরেছিল যে ব্রাহ্মণের গাভী-উদ্ধারের ফল হবে—তার এই উদাসীনতা-ব্রত? অষ্টম বর্ষীয়া সেই অনাথা বালিকার সন্ধান পেলে, তার ফল শুভ হবে,—কি অশুভ হবে,—তা ধনঞ্জয় কি ক'রে জানবে? বালিকার দর্শনে ফল বিষম অশুভও হতে পারে! ভানুর উদয়ে যেমন রজনী-গন্ধা বৃন্তে শুকিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ে, তেমনি পার্থও রবির ন্যায় তার জীবনকে শুষ্ক করে অকালে ঝরিয়ে দিতে পারে!'

ব্যাসদেবের কথা শুনে পার্থ শিউরে উঠলেন। বোবা দৃষ্টিতে তিনি মহর্ষির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মহর্ষি আবার বললেন,—'না-না, ধনঞ্জয়, তোমার এ কাজ নয়; তুমি রাজপুত্র—ক্ষত্রিয়-সন্তান। তোমার ধর্ম রাজ্যশাসন। নিজ-ধর্ম পালন করাই প্রত্যেকের কর্তব্য।'

বাসুদেব তখন বললেন,—'তবে কি অদৃষ্টকেই মেনে নিতে হবে?'

—নিশ্চয়! যা দৃষ্ট, তা ক্ষুদ্র। যা অদৃষ্ট, তা অনন্ত; তার গর্ভে লুকানো রয়েছে কত বিচিত্র রত্নরূপ কত মূল্যবান্ তত্ত্ব। মুহূর্ত পরে কি ঘটবে কে বলতে পারে? তবে অদৃষ্টবাদ মানবে না কেন?

—তবে কর্তব্য কি ক'রে ঠিক করবো? পাপ-পুণ্যই বা কিরূপে জানতে পারব?

—জ্ঞানের আলোকে জানতে পারবে কর্তব্যাকর্তব্য। জ্ঞানের আলোকে যা কর্তব্য বলে জানতে পারবে, তাই ধর্ম—তাই পুণ্য। একটি হাসির কথা এই,—জগদ্‌গুরু হয়ে, আদর্শ মানুষ হয়ে পৃথিবীতে যে জন্ম গ্রহণ করেছে, সে কিনা আজ আমার মত একজন সামান্য নরের কাছে কর্তব্যাকর্তব্য জানতে চাইছে। এ-ও তোমারই খেলা। যাও, বৎস, রৈবতকে; আপন কার্যে সফলকাম হও—এই আশীর্বাদ করি। আর, সব্যসাচি! যখন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাবে, তখন সকলকে আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাবে!

বাসুদেব অপেক্ষমান্ দারুককে রথ প্রস্তুত করতে বললেন। দারুক আদেশ পালন করতে চলে গেল। এরপর বাসুদেব ও সব্যসাচী ব্যাসদেবের পদধূলি গ্রহণ করে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

* * * * *

কেশবের ব্যবস্থাপনায় রৈবতকে যাদবদের ছোট বড় সকলেই, এমন কি যাদব-রমণীগণও, ধনঞ্জয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে-সব দেখে ধনঞ্জয় অভিভূত হয়ে পড়লেন। এ যে দিগ্বিজয়ী বীরের সম্মানে বিপুল সম্বর্ধনা-আয়োজন। যাদব-রমণীগণ মঙ্গল-ঘট ও বরণ ডালাসহ আগে এসে পার্থকে বরণ করলেন। তারপর অন্যদল পুষ্প-ডালা ও পুষ্প-মাল্য সহ এগিয়ে এসে ধনঞ্জয়কে মাল্য-ভূষিত করলেন।

এরপর মহারাজ উগ্রসেন, বসুদেব, নন্দ, অক্রূর প্রভৃতি যাদব-প্রধানগণ তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর তাঁকে নিয়ে রৈরতকের প্রমোদ-ভবনে কৃষ্ণ-বলরাম প্রবেশ করলেন। বৈরতকে আজ উৎসবের বিরাট আয়োজন। ধনঞ্জয় সব দেখে-শুনে হতবাক্ হয়ে কেশবের কার্য-কলাপের কথা ভাবতে লাগলেন।

কেশব সখা-অর্জুনের শয়নের ব্যবস্থা নিজের শয়ন-কক্ষেই করলেন। রাত্রিতে আহারের পর তাঁরা দুই সখা প্রায় সারা রাত্রি নানা আলোচনার মাধ্যমে বিশেষ করে অর্জুনের ভারত-পরিক্রমার বিষয় নিয়েই কাটিয়ে দিলেন। এই ভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হলে অর্জুনের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে থাকার সুব্যবস্থা করা হোল। রৈবতকে নানা আনন্দানুষ্ঠান ও মৃগয়ায় কেশব অর্জুনকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

রৈবতকে সেদিন যাদব রমনীগণ মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিল। নানা চটকদারী রঙের বেশ-ভুষায় সজ্জিত হয়ে সকলে সার বেঁধে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। পথিপার্শ্বে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণার্জুন সে দৃশ্য দেখছিলেন। কেশব লক্ষ্য করলেন—পার্থ সেই রমণীদের মধ্যে একজন তরুণীর দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন। সেই তরুণীটিও, পায়ে কিছু ফুটেছে—এই-রূপ ভাব দেখিয়ে, সার থেকে একটু সরে এসে এক হাঁটু ভেঙ্গে আর এক হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে পায়ের তলা লক্ষ্য করছিল, আর

মাঝে মাঝে অর্জুনের দিকে তাকাচ্ছিল। কেশব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন; তাই তিনি পার্থের কাঁধে হাত রেখে বললেন,—বনচারী হয়ে সখার নারী-আসক্তি প্রবল হয়েছে, মনে হচ্ছে!'

কেশবের স্পর্শে পার্থ চমকে উঠে লজ্জিত হয়ে নিজের দৃষ্টি একবার নত করলেন। ক্ষণপরেই কেশবকে জিজ্ঞেস করলেন,—'তরুণীটি কে?'

কেশব তখন পার্থের হাত ধরে বিপরীত দিকে চলতে চলতে বলতে লাগলেন। তরুণীটিও কেশবের হাবভাব দেখে মনে মনে শঙ্কিত বোধ করলেন—'দাদা বোধ হয় টের পেয়েছেন,—তিনি কি ভাববেন!' সে আবার দলে মিশে মন্দিরের দিকে চললো।

কেশব বললেন,—'তুমি কি তরুণীটিকে বিবাহ করতে চাও?'

পার্থ চুপ করে রইলেন।

কেশব বলতে লাগলেন,—'বালিকাটি আমার ভাগিনী, দাদা বলরামের সহোদরা। একে বিবাহ করা তো সহজ হবে না। দাদার সম্মতি থাকা দরকার। তাছাড়া পিতামাতাও উপস্থিত আছেন, তাদেরও সম্মতি থাকা দরকার। আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি খোঁজ খবর নিয়ে জানতে চেষ্টা করি।'

সেদিন কেশব একাই নিজ কক্ষে বসে একাগ্র-চিত্ত হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় একজন গুপ্তচর এসে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষণপরে কেশব তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—'কি সংবাদ দূত?'

দূত বললে,—'প্রভু, আপনার নির্দেশ মত মগধ-রাজ্য পরিভ্রমণ শেষে আজ পুনরার শ্রীচরণ দর্শনে উপস্থিত হয়েছি।'

—তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা কর, দূত!

দূত বলতে আরম্ভ করলে,—'রৈবতক থেকে যাত্রা করে কিছুদিনের মধ্যে বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করে অবন্তীপুর হয়ে ত্রিবেণী

সঙ্গমে—প্রয়াগের পবিত্র তীর্থে, অবগাহন করে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের ক্লান্তি দূর করি। তারপর অযোধ্যা ভ্রমণান্তে মগধ-সীমায় প্রবেশ করি। অজস্র পার্বত্য নদী প্রবাহিত হয়ে মগধের ভূমিকে করেছে স্বর্ণ-প্রসবিনী; মনোহর আম্রবন ও শস্য-পূর্ণ হরিৎ-ক্ষেত্র দেখে চোখ জুড়ায়। তারপর কৃষ্ণকায় শৈল শ্রেণী, উপত্যকায় যার চ'রে বেড়াচ্ছে গাভী, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত জীবগণ। বরাহ, বৈভার, বৃষভ, চৈত্যক ও ঋষিগিরি— এই পঞ্চ-গিরির মাঝখানে, দেখুন, প্রভু, (একটি হস্তাঙ্কিত মানচিত্র প্রদর্শন ক'রে) গিরিব্রজপুর মগধের রাজধানী, যার নূতন নাম রাজগৃহ, যা পর্বত প্রাচীরে সুরক্ষিত। তার ওপর দুর্গের প্রাচীর অজগরের মত চারদিক্ ঘিরে রয়েছে। তার ওপর প্রহরারত রক্ষিগণ। উত্তর দিকে একটি মাত্র তোরণদ্বার, সেখানেও রক্ষী-সৈন্যদল। শত্রুর কি সাধ্য সেখানে প্রবেশ করে!

'আরো জেনেছি,—ছিয়াশিজন নৃপতি বন্দী হয়ে আছেন জরাসন্ধের শৈল-কারাগারে। একশতজন পূর্ণ হলে রুদ্রদেবের নিকট বলি দেওয়া হবে তাঁদের।'

বাসুদেব শিউরে উঠলেন,—'ওঃ, কী নৃশংস!'

দূত আবার বলতে লাগল,—'আরও যা শুনেছি, তা শ্রীচরণে নিবেদন করছি;—চেদীরাজ শিশুপাল, অঙ্গ ও বঙ্গের ভূপতিগণ অর্থাৎ সমগ্র উত্তর ভারতের নৃপতিবৃন্দ মগধে উপস্থিত হয়েছেন, মগধের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে। এই সম্মিলিত বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগঠন করে একশত বন্দী নৃপতির রক্তদ্বারা রুদ্রদেবের পূজা সম্পাদন করে প্রথমেই জরাসন্ধ দ্বারাবতী আক্রমণ করবেন। তারপর সমগ্র ভারতে হবে তাঁর একাধিপত্য, সর্বত্র উড়বে মগধের বিজয়-কেতন; জরাসন্ধ তখন হবে ভারত-সম্রাট।—এই নিন, প্রভু, মানচিত্র।'

মানচিত্র গ্রহণ করে বাসুদেব দূতকে বহু উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন।

তারপর অন্য এক দূত সেই কক্ষে প্রবেশ করে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে করজোড়ে কেশবের সম্মুখে দাঁড়াল।

তখন কেশব তাকে বললেন,—'তুমি, চেদীরাজ্যের কি সংবাদ এনেছ, দূত ?'

দূত বলতে লাগল,—'প্রভু, বণিকের বেশে সে রাজ্যে সর্বত্র ভ্রমণ করেছি। কী অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা সে রাজ্যের! দক্ষিণ সীমায় দণ্ডায়মান বিন্ধ্যগিরি—প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বেত্রবতী ও শক্তিবতী দুই বিন্ধ্যসুতা উত্তর-পূর্ব বাহিনী হয়ে জাহ্নবীর পবিত্র ধারায় নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে। চারদিকে সবুজের মেলা, বিধাতার আশীর্বাদ বহু ধারায় সেখানে বর্ষিত। জাহ্নবী-যমুনা বিধৌত উত্তর সীমাঞ্চল। পবিত্র প্রয়াগ তীর্থ সেখানে বিরাজ করছে।

'ভাবতে অবাক্ লাগে,—এমন লক্ষ্মীমন্ত সৌন্দর্যের খনি উপভোগ করছে এক হিংস্র মানবশত্রু, বাসুদেব দ্বেষী, যে সর্বদা প্রভুর নিন্দায় পঞ্চমুখ। দ্বারাবতী আক্রমণের সুযোগের আশায় মগধের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে চেদীরাজ।'

এই বলে দূত চেদীরাজ্যের মানচিত্রখানি বাসুদেবের হাতে দিলেন। বাসুদেব তাকে পুরস্কৃত করে বিদায় দিলেন।

এই রূপে অন্যান্য দূতগণ কেশবের নিকট তাদের বিভিন্ন রাজ্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে পুরস্কৃত হয়ে বিদায় নিল।

বাসুদেব মানচিত্রগুলি দেওয়ালে স্থাপন করে চিন্তিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

পশ্চাতে কক্ষদ্বারে অর্জুনসহ ব্যাসদেব এসে দাঁড়ালেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ব্যাসদেব বললেন,—'আজ বাসুদেবকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে!'

—'কি সৌভাগ্য। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম, দেব!'

এই বলে বাসুদেব ব্যাসদেবের পদধূলি গ্রহণ করলেন ; তারপর আসন গ্রহণের জন্য আহ্বান করলেন। ব্যাসদেব ও অর্জুন যথাস্থানে বসলেন এবং তিনি নিজেও আসন গ্রহণ করলেন।

—আমাকে স্মরণ করছিলে কেন, বৎস ?

—ভারতে আবার নূতনভাবে বিপ্লবের ঝড় বইবে মনে হচ্ছে। জরাসন্ধের নায়কত্বে উত্তর ভারতের নৃপতি-নিচয় সঙ্ঘবদ্ধভাবে দ্বারাবতী আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে। হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবে মাতৃভূমি ভারতের ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হবে। হবে সাধুদের দুর্দশা, অসাধুর আধিপত্য, অধর্মের প্রাবল্য ; এইসব ভেবে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি, দেব ! তাই আপনার উপদেশের জন্য আপনাকে স্মরণ করছিলাম।

ব্যাসদেব তখন, হেসে বললেন,—'পৃথিবীর তৃষ্ণা নিবারণ করতে বারিধি ক্ষুদ্র সরসীর সাহায্য প্রার্থনা করে ! এ মহানুভবতা তোমাতেই সম্ভব, বাসুদেব ! তবে শোন, তুমি যে দুর্দিনের কথা বললে, তার আর একদিক আমি বলছি,—বনবাসী ঋষি, গৃহবাসী ব্রাহ্মণ,—সবাই ভীত ও শঙ্কিত বাসুদেবের সৃষ্ট ধর্মনীতি, সমাজ-নীতি ও রাষ্ট্র-নীতিতে। তারা তোমাকেই দায়ী করছে—এই ধর্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের জন্য।'

বাসুদেব ক্ষোভের হাসি হেসে বললেন,—'সরল বৈদিক ধর্ম—প্রকৃতির পূজা ; সেই সরল ধর্ম আজ পৈশাচিক যাগ-যজ্ঞে পর্যবসিত হয়েছে,—নাই তাতে মানব-প্রেম,—মানবকল্যাণ। যখন আমাদের পিতৃপুরুষগণ উত্তর কুরুবর্ষ-ইলাবৃত-বর্ষ থেকে ঋক্ মন্ত্র ও সামগান গেয়ে এই ভারতবর্ষে এলেন, তখন কি ছিল চারিজাতি—হিংসা ও ঘৃণার উৎস ? কেও শাস্ত্র, কেও শস্ত্র, কেউবা বাণিজ্য-কর্ম গ্রহণ করে সমাজের কল্যাণে ব্রতী ছিলেন, আজ সেখানে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে যারা, তারা এজন্য দায়ী,—না আমি ? সুন্দর প্রীতিপূর্ণ সমাজ-দেহকে খণ্ড খণ্ড করে জাতিভেদের নিষ্ঠুর

বিধান তৈরী করেছে যারা, তারা এজন্য দায়ী,—না আমি? যারা ব্যাসের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করে না, মহাবীর কর্ণের ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করে, ভারতের আদি অধিবাসীদের দাসত্বজীবী ক'রে রাখছে যারা,—দায়ী তারা,—না আমি?'

ব্যাসদেব বললেন,—'বৎস, অনন্ত কালবক্ষে অংকিত যে দু'টি যুগ-রেখা, পারবে কি তাদের মুছে ফেলতে? পারবে কি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আর্যজাতিকে আবার তাদের আদিবাস-ভূমি উত্তর কুরুবর্ষে? নির্ঝর কি ফিরে যেতে পারে তার আদি উৎস-মূলে?'

—না, প্রভু! প্রকৃতির স্রোত কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে না, আমারও সে উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি-রাজ্য নীতির অধীন। সে নীতি—জীব-কল্যাণ ও সৃষ্টির উন্নতি সাধন। সেই নীতি-ভঙ্গকারী যারা, তারা সমাজের শত্রু—সৃষ্টির শত্রু। তাদের বিনাশই মানব-কর্তব্য—মানব-ধর্ম।

—কাল বড় নিষ্ঠুর, বৎস! সে কাকেও ক্ষমা করে না। গত দুই যুগের সঞ্চিত দূষিত-বায়ু বিষাক্ত করেছে যা, তাকে পরিশুদ্ধ করতে—হবে আবার নবযুগের সূচনা, হবে যুগান্তর: তুমি হবে তার কাণ্ডারী।

—আমি একা কি করতে পারি, প্রভু? আমি, আপনি, সব্যসাচী—আমরা সবাই নারায়ণের হস্তধৃত যন্ত্র—কেউ শঙ্খ, কেউ চক্র, কেউ মুষল (গদা); তারই বলে স্থাপিত হবে বিশ্বধর্মের মন্দির। তার মূল ভিত্তি সর্বভূত-হিত, নীতি সুদর্শন, সাধনা নিষ্কাম-কর্ম এবং লক্ষ্য হবে নারায়ণ। শপথ করুন—এই আমাদের ব্রত।

ব্যাসার্জুন দেখলেন—শ্রীকৃষ্ণের মুখে অত্যাশ্চর্য এক জ্যোতি। শ্রীকৃষ্ণ যেমন জোড়-করে ঊর্ধ্বে তাকিয়েছিলেন, তাঁরাও তেমনি তাঁকে অনুসরণ করলেন।

বাসুদেব তাঁদের দিকে তাকাতেই উভয়ে বললেন,—'আজ থেকে তোমার এই মহাব্রত গ্রহণ করলাম, বাসুদেব!'

*   *   *   *   *

উৎসব-মুখর রৈবতক। যাদব-নর-নারী উৎসবানন্দে মেতে আছে। রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত, তবুও উৎসবানন্দে ভাঁটা পড়ে নি। পার্থের পার্বত্য-ভৃত্য শৈল শুধু গবাক্ষ পথে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে প্রভুর আগমন-প্রতীক্ষায়।

সেইসঙ্গে সে ভাবছে,—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব বলে পুরুষের ছদ্মবেশে পিতৃহন্তার ভৃত্যের কাজ নিয়েছি ; কিন্তু এ কি হোল আমার! পার্থের বীর হৃদয়ের এত দয়া, এত ভালবাসা আমাকে আমার কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছে। জেনেছি—আমার পিতার মৃত্যুতে তিনি অনুতপ্ত ; শুধু তাই নয়, আমার সেই শোক ও দুঃখ দূর করার জন্য দীর্ঘদিন আমার অনুসন্ধান করেছেন। আর আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য দীর্ঘদিন শর-চালনা অনুশীলন করেছি। তাই তাঁর এখানে আসার সংবাদ জেনে প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। পিতৃব্য-তনয় বাসুকির পরামর্শে এই কাজ নিয়েছি।

দাদা বাসুকি দেবী সুভদ্রার রূপে মুগ্ধ এবং তাঁকে হরণ করার জন্য সচেষ্ট। সেই কাজে সহায়তা করার জন্য তাই সুভদ্রার গতিবিধি গোপনে তাঁকে জানাতে আমাকে শপথ করিয়েছেন। কিন্তু দেবী সুভদ্রার যে পরিচয় পেয়েছি, কিছুতেই আমাদ্বারা সে কাজ সম্ভব হবে না। তিনি পার্থের অনুরাগিণী, পার্থও তাঁর প্রণয়াসক্ত। দেবী সুভদ্রা মানবী নন—দেবী। মানুষের কি এত রূপ থাকে? এত দয়া থাকে? সমস্ত জীবের প্রতি তাঁর দয়া ও সেবা দেখে আমি মুগ্ধ ; শুধু তাই নয়, মনে মনে তাঁকে পুজো করি। তাঁর দাসী হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু দাদা বাসুকির পরামর্শে আজ আমি কোথায় নেমেছি!

ক্রমে দ্বিতীয় প্রহর আগত-প্রায়। কক্ষান্তরে পদশব্দ শুনে শৈল বুঝতে পারলে—উৎসবান্তে প্রভু তার ফিরেছেন।

পার্থ কক্ষে প্রবেশ করে শিরস্ত্রাণ খুলে রেখে গৃহমধ্যে পদচারণ করতে করতে অঙ্গের ভূষণ খুলছিলেন আর সুভদ্রার কথা ভাবছিলেন। সেই সময় শৈল ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করে উৎসবের বেশ-ভূষা পার্থের অঙ্গ থেকে খুলতে লাগলে। পার্থ তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—'এতক্ষণ উৎসব দেখছিলে ঘুরে ঘুরে ?'

—না, প্রভু, উৎসব দেখতে যাই নি।

পার্থ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'তবে এতক্ষণ কি করছিলে ?' শৈল মুখ নীচু ক'রে বললে,—'আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় ছিলাম, প্রভু!'

—তোমার কোন শখ-আহ্লাদ নেই ? উৎসব দেখতে সবাই গিয়েছিল! গেলে শুনতে পেতে সুভদ্রার কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত আর দেখতে পেতে তার অপরূপ রূপ।

পার্থের এই উচ্ছ্বাস-বাক্যে শৈলর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। সে মুখ নীচু করে রইলো। পার্থ কিছু বুঝতে পারলেন না।

তিনি তার প্রভু-প্রীতি দেখে তীব্র আনন্দানুভূতিতে শৈলর আনত মুখখানি তুলে ধরে তার স্নেহমাখা চোখে চোখ রেখে বললেন,—'তোমার এ স্নেহ ও ভক্তির প্রতিদান কি ক'রে দেব—জানি না। তোমার অকৃত্রিম সেবার কোন তুলনা নেই, শৈল!'

শৈল তাড়াতাড়ি পার্থের পায়ের কাছে বসে পড়ে ঊর্ধ্ব মুখে ঢল ঢল চোখে প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,—'দিবানিশি প্রভুর পবিত্র চরণ স্পর্শের যে সৌভাগ্য লাভ করছি, তাতেই এ অনার্য-বালক কৃতার্থ,—আর কোন প্রতিদান সে চায় না, প্রভু!'

পার্থ বালকের এইরূপ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বাক্যে অভিভূত হয়ে তাকে হাত ধরে তুলে আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করলে ছদ্মবেশ ধরা পড়ার ভয়ে বালক বিদ্যুতের গতিতে সরে গিয়ে বললে,—'প্রভু কি আজ সুস্থ নেই ? আমি যে আপনার অনার্য-ভৃত্য, তা কি ভুলে

গেলেন ?'—বলে সুকোমল করে প্রভুর উৎসব-সজ্জা খুলতে লাগল।

তারপর উৎসব-সজ্জা মোচনান্তে পার্থ স্বর্ণ-পালঙ্কে শয্যা গ্রহণ করলেন। শৈল পদমূলে বসে পার্থের পদ-সেবা করতে লাগল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর; তখনও শৈল তার কোমল করে প্রভুর পদসেবা করছে। পার্থ তখন বললেন,—'রাত্রি তৃতীয় প্রহর, এইবার যাও, শৈল, বিশ্রাম কর গে।'

শৈল তেমনই সেবা করতে লাগল। পার্থ শৈলের মুখে এক অতীত স্মৃতির ছায়া দেখতে দেখতে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় ঘুমিয়ে পড়লেন। শৈলও কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে প্রভুর চরণে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কী তৃপ্তির ছায়া তার মুখে! সে যেন বহু তপস্যার শেষে উপাস্যের চরণে স্থান পেয়েছে।

হঠাৎ স্বপ্ন-ভঙ্গে শৈল ধীরে ধীরে পার্থের কক্ষ ত্যাগ করে নিকটবর্তী এক অরণ্যে প্রবেশ করে দেখল—তার অপেক্ষায় বসে আছে এক আগন্তুক। উষ্ণ বাক্যালাপে আগন্তুকের সঙ্গে কিছু সময় কাটল তার। তারপর দ্রুতপদে আগন্তুক সেস্থান ত্যাগ করল।

শৈল সেই অন্ধকারে বসে নীরবে অশ্রু মোচন করতে লাগল। যে প্রতিহিংসার জ্বালা বুকে নিয়ে সে রৈবতকে এসেছিল, পার্থের পবিত্র মুখ দর্শনে তার সে হৃদয়-জ্বালা দূর হয়ে, সেখানে সে অনুভব করেছে প্রেম-সুধার শান্তির প্রলেপ। সে অশ্রু নিবারণ করে নিজে নিজেই বলে উঠল,—'না, নাগরাজ,—আমার জীবন থাকতে এ পাপ পঙ্কে তোমাকে ডুবতে দেব না,—আমিও এ পাপে ডুবতে পারব না।" এই বলে সে ধীরে ধীরে পার্থের কক্ষে প্রবেশ করে ভূমিতে জানু পেতে বসে এক দৃষ্টে নিদ্রিত পার্থের শান্ত সমুজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। পূব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ পর পার্থ নিদ্রা-ভঙ্গে শয্যায় উঠে বসে বিস্ময়ে দেখলেন,—শৈল তেমনি বসে আছে।

শৈল তখন বললে,—'আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন, প্রভু! আমি এখন আপনাকে এক গোপন সংবাদ জানাব। এই সামান্য ভৃত্যের কাছে শপথ করুন,—এ সংবাদ—কি ভাবে, কার কাছে জানলেন, তা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না।'

শৈলর মুখে এরূপ কথা শুনে পার্থ অবাক্ হলেন। তারপর বললেন,—'হ্যাঁ, শপথ করছি।'

তখন শৈল নিম্নস্বরে যে কথাগুলি বললে, তা শুনে পার্থ স্তম্ভিত। তবে কি এ বালক কোন গুপ্তচর? কিন্তু শৈলর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে তার নিষ্পাপ চোখ-মুখ দেখে পার্থের সে সন্দেহ দূর হোল। তিনি তাড়াতাড়ি মৃগয়ার পোশাক পরে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

শৈল কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে নিজ কক্ষে গিয়ে পৃষ্ঠে তূণ, হাতে ধনুক নিয়ে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হোল।

* * * * *

সেদিন ছিল কুমারী-ব্রতের দিন। যাদব-কুমারীগণ যাচ্ছে নারায়ণ-মন্দিরে। বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে তারা যাচ্ছে শৃঙ্গান্তরে, যেখানে স্থাপিত নারায়ণ মন্দির। সেই দীর্ঘ শোভা-যাত্রার সঙ্গে নানা বাদ্য-ভাণ্ডার। যাদব-রমণীগণ নানা পুষ্পে ডালা সাজিয়ে মুখে সুমধুর গান গেয়ে পরমানন্দে বনপথে চলেছে। অনেকটা পথ অতিক্রম করে তারা মন্দির সন্নিকটস্থ উপবনে এক সরোবর-তীরে পৌঁছুতেই তাদের পশ্চাতে অনুসরণকারী রক্ষী-দলের মধ্যে কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল। রক্ষীদলের অগ্রভাগে ছিল সহচরী সুলোচনা ও সুভদ্রা। কুমারীগণ শঙ্কিত হয়ে মন্দিরের দিকে ছুটল। সুভদ্রা ও সুলোচনা দেখলেন—দস্যুদল ও রক্ষিগণের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। হঠাৎ তাঁরা সভয়ে লক্ষ্য করলেন,

একজন দস্যু তাদের দিকে ছুটে এসে সুভদ্রাকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছে। সুভদ্রা প্রশান্তমুখে দস্যুর দিকে তাকালেন। দস্যু আর অগ্রসর হোল না। সুলোচনা সুভদ্রাকে জোর করে মন্দিরের দিকে টেনে নিয়ে গেল। দস্যু পশ্চাতে তাকাতেই পার্থকে দেখতে পেয়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন। যোগ্য প্রতিযোগী উভয়েই।

দস্যুদল রক্ষীদলকে প্রতিহত করে এগিয়ে আসছে। তখন কুমারী কিশোরীগণ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। কে একজন বললে,—'তোমরা মন্দিরে প্রবেশ কর।'

তখন যাদব-কুমারীগণ মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলে এক কিশোর মন্দির-দুয়ারে দাঁড়িয়ে তূণ থেকে শর তুলে ধনুকে যোজনা করে মুহুর্মুহু দস্যুগণের প্রতি নিক্ষেপ করছে। সুলোচনা ও অন্যান্য কুমারীগণ এই কিশোরের শর চালনা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত। শুধু সুভদ্রা যুদ্ধরত অর্জুনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুলোচনা বললে,—'দেখ, সুভদ্রা, কিশোর বালকের শর-চালনার কি অদ্ভুত কৌশল ; দস্যুদল পালাতে শুরু করেছে।'

সুভদ্রা কিশোরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন,—ঘর্মাক্ত কলেবর থেকে রক্ত ঝরছে। তখন তিনি বালকের নিকট গিয়ে বললেন,—'তোমার, দেহের ক্ষতস্থানে রক্ত ঝরছে, তোমার শরাসন আমাকে দাও, যাদব-কুমারীও যুদ্ধ করতে জানে। তুমি বিশ্রাম কর।'

তখন শৈল বললে,—'পার্থ প্রণয়িনী যে যুদ্ধ করতে জানে, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি সোহাগে লালিতা গোলাপ কুসুম, আর আমি কাননের অযত্ন-রক্ষিত বনফুল, কণ্টক-আঘাতে অভ্যস্ত।'

এই বলেই অজস্র ধারায় শর নিক্ষেপ করতে লাগল। সেই শরাঘাতে আহত দস্যুদল পালিয়ে গেল। সুভদ্রা ও বালক শৈল মুগ্ধ দৃষ্টিতে যুদ্ধরত অর্জুনের যুদ্ধ-কৌশল দেখছিলেন। একসময় সুভদ্রা নিজের কন্ঠহার বীর কিশোর বালকের গলায়

পরিয়ে দিয়ে বললেন,—'বোনের সামান্য উপহার গ্রহণ কর, বালক! তোমার পরিচয় জানতে বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে।'

তখন ঐ বালক বললে,—'আমার আর পরিচয় কি? আমি বনচারী। এ মহামূল্য কণ্ঠহার দিয়ে আমি কি কোরব? বরং তোমার কণ্ঠহার তোমাকে দিয়ে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

হঠাৎ দেখা গেল শরাসন-ভ্রষ্ট অর্জুন স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, সুভদ্রা ভীতি-বিহ্বল স্বরে চিৎকার করে উঠলেন। উন্মুক্ত অসিহস্তে দস্যু ছুটে আসছে অর্জুনের দিকে। মুহূর্তে সর্বনাশ ঘটবে। পলকে একটি শর দস্যুর দক্ষিণ বাহুতে বিদ্ধ হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুষ্টিবদ্ধ তরবারি ভূলুণ্ঠিত হোল। পার্থ তাড়াতাড়ি নিজ শরাসন তুলে নিলেন। আহত দস্যু দ্রুত পলায়ন করল।

দূরে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। সকলে বুঝতে পারল,—এ শঙ্খ-ধ্বনি বাসুদেবের। পরমুহূর্তে পার্থ দেখলেন,—সম্মুখে যাদবগণসহ বাসুদেব। মন্দির থেকে কুমারীর দল ছুটে বাইরে এলো। সুভদ্রা বাসুদেবের কণ্ঠলগ্ন হয়ে নির্জীবের মত তাঁর বুকে মাথা রাখলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য!—সেই বালককে কেউ আর দেখতে পেল না।

কুমারীরা সকলে সেই বালকের জয় গান করতে লাগল। পার্থ বুঝতে পারলেন—এ বালক শৈলছাড়া আর কেউ নয়। গুপ্ত-শরে দস্যুকে আহত করে সে তাঁর প্রাণ বাঁচাল।

কুমারীগণ সরসীনীরে অবগাহন করে কুমারী-ব্রত পালন করতে নারায়ণ মন্দিরে প্রবেশ করল।

কেশব বললেন,—'রক্ষীদের মুখে সব ঘটনা শুনেছি। এই দস্যুদলের নায়ক কে,—তাও বুঝতে পেরেছি। তবে তার সব অপরাধ ক্ষমা করব।' অর্জুনকে বললেন,—'সেই কিশোর

কি তোমার বালক-ভৃত্য শৈল? তার মনোভাব কি বুঝতে পেরেছ?'

—বুঝেছি,—সেই অনার্য বালকের হৃদয় সুধার সাগর।

বাসুদেব তবুও সন্দিগ্ধ রইলেন। বললেন,—'এখানে আর থাকা ঠিক নয়। চল,—শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করি।'

* * * * *

রৈবতকে উৎসব শেষ হতে চলেছে। উৎসব-শেষে পার্থ ইন্দ্রপ্রস্থের পথে যাত্রা করবেন। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে পার্থের প্রেরিত দূত এসে জানিয়েছে—'যদি কেশবের সম্মতি থাকে, তবে সুভদ্রাকে অর্জুনের বিবাহে মাতা কুন্তী ও ভ্রাতাদের কোন অমত নেই।'

আজও এ ব্যাপারে কেশবের সম্মতি জানতে পারেন নি অর্জুন। জ্যোৎস্না-বিধৌত নিশিতে রৈবতকের শোভা দর্শন করতে করতে সুভদ্রার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি তাঁর মনে পড়ছিল। সুভদ্রাকে তাঁর জীবন-সঙ্গিনী না পেলে তাঁর পাশে থেকে কর্মে উদ্দীপনা যোগাবে কে? উলুপী, চিত্রাঙ্গদা ও দ্রৌপদীর কথা একে একে তাঁর মনে হ'তে লাগল। উলুপী ও চিত্রাঙ্গদা নিজ নিজ রাজ্যের দায়িত্ব ছেড়ে অর্জুনের পাশে থেকে তাঁর মনের শূন্যতা পূর্ণ করতে আসতে পারবে না। আর দ্রৌপদী? যদিও সে তাঁরই বীর্য-শুল্কে লব্ধা, কিন্তু বিধির এমনই বিধান—তাঁকে একান্ত ভাবে পাওয়া আর সম্ভব নয়। তাই সুভদ্রাকে তাঁর একান্ত প্রয়োজন। যে চারজন নারীর সাহচর্য তিনি লাভ করেছেন, তাঁরা সাধারণ নারী নন, তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি নব দিগন্তের দিশারী। সুভদ্রা তাঁর জীবনে একান্ত অপরিহার্য।

এইরূপ ভাবতে ভাবতে পার্থ আনমনেই কেশবের কক্ষে এসে

উপস্থিত হলেন। পার্থ দেখলেন,—বাসুদেব মুদ্রিত নেত্রে যোগাসনে বসে আছেন। তিনি সংকোচ বোধ করতে লাগলেন। এ সময় এ কক্ষে আসা ঠিক হয় নি! দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভাবছেন,—তিনি কি চলে যাবেন? না—অপেক্ষা করবেন? ক্ষণপরে তিনি দেখতে পেলেন—বাসুদেব চক্ষু উন্মীলিত করলেন। তখন পার্থ বললেন,—'এই সময় তোমার কক্ষে প্রবেশ করে অপরাধ করেছি, সখা! ক্ষমা করো।'

—আমার কাছে তুমি আসবে,—তার আবার সময়-অসময় কি? কিন্তু এত রাত্রি পর্যন্ত তুমি জেগে রয়েছ কেন, সখা?

—উদ্যানে বসে জ্যোৎস্নাস্নাত রৈবতক-শোভা দেখছিলাম। তারপর গৃহে যাবো ভেবে চলেছিলাম আনমনে। সহসা বুঝতে পারলাম, এ তো আমার কক্ষ নয়, সখা কেশবের পবিত্র গৃহ ;—যোগাসনে বসে আছ তুমি। তোমার ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে মনে মনে সংকোচ বোধ করছিলাম।

—প্রাচীরে স্থাপিত চিত্রগুলি একবার দেখ, সখা।

—কী ভয়ংকর চিত্র। শকুনি-গৃধিনী এক নারী-দেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে!

—জানো,—এ নারী কে?

পার্থ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেম।

তখন বাসুদেব বললেন,—'ঐ নারী—আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। তাকে খণ্ড খণ্ড করে আর্য-নৃপতিগণ ভক্ষণ করছে ; আর মায়ের দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। অন্য দিকে দেখ—অন্য চিত্রপট,—ভারত জননীর রাজ-রাজেশ্বরী মূর্তি। মায়ের এই রূপই আমাদের ধ্যানের মূর্তি।

—কি ভাবে মায়ের এই রূপ আমরা দেখতে পাবো?

'দুষ্কৃতের বিনাশ, আর সাধুদের পরিত্রাণ',—এই করতে

পারলেই ধর্ম-সংরক্ষণ সম্ভব হবে ; তবেই জগতে শান্তি স্থাপিত হবে। তখন মায়ের এইরূপ দেখতে পাবো।

—তা'হলে তো রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দেখা দেবে। সেটা কি ধর্ম ?

—একের বিনাশে যদি দশের মঙ্গল হয়, তবে সে সংগ্রাম ধর্মযুদ্ধ ; এতে পাপ নেই।

—তুমি আমি ব্যাসদেব—আমরা সকলে যে শপথ নিয়েছি,—পরহিত ব্রত, নিঃস্বার্থ কর্ম আর নারায়ণে আত্মসমর্পণ ; এই শপথ পালন করলে দেখবে—অশান্ত জগতে শান্তি ফিরে আসবে,—মায়ের মুখে হাসি ফুটবে।

একটু থেমে বাসুদেব আবার বললেন,—'তোমার ইন্দ্রপ্রস্থে যাবার সময় হয়েছে। সেখান থেকে তোমার দূত ফিরে এসেছে, সখা ?'

—হঁ্যা ; সেখানকার খবর হচ্ছে,—যদি কেশবের সম্মতি থাকে, তবে মাতা ও ভ্রাতাদের অমত নেই।

—শোন, সখা, প্রভাতে অরুণোদয়ে দারুক রথ নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। সেই রথে শিকারে যাবে তুমি,—প্রস্তুত থেকো।—বলে মৃদু হাসলেন কেশব !

ইঙ্গিতপূর্ণ এই কথার মর্মোদ্ধার করলেন পার্থ ;—নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

—এখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর ; যাও, ধনঞ্জয়, বিশ্রাম কর গে।

প্রভাতে বৈতালিকগণ মঙ্গলগীতি গাইছেন, মঙ্গল-বাদ্য বাজছে। পুরনারীগণ দ্বারাবতী চলেছে, থেকে থেকে হুলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পার্থের ঘুম ভাঙ্গল। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন,—তাঁর শয্যার নিকট তাঁর রণসজ্জা সজ্জিত। অদূরে অন্তরালে শৈল অনিমেষ নেত্রে পার্থের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রসন্নমুখে পার্থ বললেন,—'শৈল, আমার যে এখন রণসজ্জার প্রয়োজন, তা তুমি জানলে কি ক'রে ?'

বালক শৈল নীরবে নিকটে এসে পার্থের রণসজ্জার কাজে

সাহায্য করতে লাগল। শৈলের স্পর্শ পার্থের নিকট আজ বড়ই সুকোমল বোধ হতে লাগল।

তিনি বললেন,—'আমার রৈবতক বাস শেষ হোল, শৈল! তুমি এখন তোমার গৃহে চলে যাবে?'

শৈলের চোখে অশ্রু। বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে কাতরে সে বললে, —'এ দাসীর কোন গৃহ নেই।'

'দাসীর!' পার্থ ভাবলেন, বোধ হয়, তিনি ভুল শুনেছেন। তিনি সহানুভূতির সুরে বললেন,—'তবে আমার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে চল, শৈল! তোমাকে আমার পুত্রের মত পালন কোরব আমি। তোমার অকৃত্রিম ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা—জগতে অতুলনীয়। তোমার স্বার্থহীন ভালবাসা হবে আমার জীবনে সুখ-সম্পদ।'

শৈল পার্থের কথার কোন উত্তর দিতে পারলে না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তার স্খলিত বেশ-বাস। পার্থের বিস্ময়ের সীমা নেই। "শৈল, শৈল" বলে—দু'হাতে তার অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে আবার বললেন,—'কেন তুমি এতদিন ছলনায় আমায় ভুলিয়ে রাখলে? কে তুমি? তবে কি……'

শৈলর অশ্রু বাঁধ মানে না। ধীরে ধীরে সে পার্থের পদতলে বসে কাতরস্বরে বলতে লাগল,—'দাসীর এ ছলনা ক্ষমা করুন, প্রভু! ভেবেছিলাম—আপনার অজ্ঞাতেই চলে যাবো, তাতে এ ছলনা আপনি বুঝতে পারতেন না। কিন্তু তাতে মনে হোল— এ পাপ। তাই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার সত্য-পরিচয় আপনাকে দিয়ে যাবো ভেবেই এখনও আপনার আশ্রয় ছেড়ে চলে যাই নি। জানি, আমার আত্মপরিচয়ের সে করুণ কাহিনী আপনাকে ব্যথা দেবে, তবু পরিচয় না দিয়ে আমার স্বস্তি নেই। আমাকে ক্ষমা করবেন, প্রভু!'

নির্বাক্ দৃষ্টিতে পার্থ শৈলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শৈল বলতে লাগল,—'আমি নাগবালা শৈলজা, নাগকুলে জন্ম।

খাণ্ডব-প্রস্থ এককালে ছিল নাগরাজ্য। এই নাগ-বংশই ছিল ভারতের ক্ষমতাশালী জাতি। তারপর আর্যজাতি যখন ভারতে বসতিস্থাপনে ভারত-ভূমি গ্রাস করতে লাগল, তখন নাগরাজ্য ধ্বংস হোল; সেই সুখের রাজ্য আজ খাণ্ডব-অরণ্য। নাগগণ আশ্রয় নিল পশ্চিম-অরণ্যে—পাতালে। সেখানে পিতার সঙ্গে তাঁর পিতৃব্যপুত্র বাসুকির মতভেদ হওয়ায় পিতা সেই নাগপুরী ত্যাগ করে কিশোর বয়সেই অসিমাত্র সম্বল করে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর তাঁর মধ্যে এলো বৈরাগ্য। তাই তিনি অসি ত্যাগ করে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ছদ্মবেশে আর্য-ঋষিদের সাহচর্যে আর্যাচারে জীবন কাটাতে লাগলেন। শেষে বিন্ধ্যাচলে 'সুনীরা' সরোবর তীরে কুটীর নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। সেখানে সে শৈল-কুটীরে আমার জন্ম হয়, তাই পিতা আমার নাম রাখলেন শৈলজা। এইখানেই আমার শৈশব কেটেছে জনক জননীর কোলে কত আদরে, প্রকৃতির কোলে কত সুখে। আমার জনক-জননী ছিলেন দেবতার প্রতিমূর্তি। অভাগিনী এ জন্মে আর দেখতে পাবে না সে দেব-মূর্তি।'

বলতে বলতে শৈলজা কাঁদতে লাগল। পার্থ নির্বাক্ হয়ে সেই কাহিনী শুনছিলেন। শৈলজা আবার বলতে লাগল,—'সাত-আট বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে ক্ষুদ্র কৃষি-ক্ষেত্রে কাজ করেছি, মায়ের সঙ্গে গৃহ-কর্মও করেছি। অবসর সময়ে কত আদরে পিতা আমায় আর্য-ভাষা শেখাতেন। আবার তীর-ধনুক চালনা শেখাতেন—গাছের ফল বা ফুল বা পাতা লক্ষ্য রেখে। উপদেশ দিতেন,—অকারণে জীব-হত্যা বা তাদের কষ্ট দেওয়া পাপ। তারপরই অষ্টম বৎসরে অভাগীর কপাল ভাঙল। পিতা মাঝে মাঝে খাণ্ডব-প্রস্থে যেতেন অনার্যের সেই গৌরব-স্থানে। সেখানে অবস্থানকালে পিতা কখনও কখনও সেই গৌরব-

কাহিনী মাকে শোনাতেন, আর চোখের জলে ভাসতেন : জননীও সে কাহিনী শুনে বিষাদ-মগ্ন হতেন। আমি মায়ের কোলে বসে সে কাহিনী শুনতাম, আর জনক-জননীর দুঃখের অংশীদার হতাম। এক সময় সেখানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। দুধের অন্বেষণে পিতা গেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে ; আর ফিরলেন না, আপনার শরে তিনি প্রাণ দিলেন।' বলতে বলতে শৈলর চোখের জল স্রোতের মত প্রবলবেগে দু' গণ্ড বেয়ে গড়াতে লাগল।

পার্থ আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। 'শৈল, তুমি সেই চন্দ্রচূড়-কন্যা অনাথা শৈলজা!' বলেই উন্মত্তের মত উঠে শৈলজাকে বুকে নিয়ে তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বার বার চুম্বন করতে লাগলেন।

—'আমি তোমার পিতৃহন্তা জেনেও তুমি কি ক'রে দেবতার মত সেবা করলে আমাকে? একাদশ বর্ষ তোমার অন্বেষণ করেছি। শৈল, আমি সেই পাপী : হান, অস্ত্র বক্ষে আমার! পিতৃহত্যার প্রতিশোধ—'

শৈল পার্থের মুখে হাত চাপা দিয়ে সরে দাঁড়াল। তারপর পার্থের পদতলে বসে তাঁর পা দু'টি জড়িয়ে ধরল। পার্থ জিজ্ঞেস করলেন,—'তোমার জননী কোথায়?'

শৈল কাঁদতে কাঁদতে বললে,—'বৈকুণ্ঠে, পিতার কাছে। পিতার মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র ভাগ্যবতী ছিন্ন লতার মত ধরার কোলে আশ্রয় নিলেন। মুখে মুখ দিয়ে, বুকে বুক রেখে কত ডাকলাম, কত কাঁদলাম। তারপর সেই বুকে ঘুমিয়ে পড়লাম।'

পার্থ অস্থির পদক্ষেপে কক্ষে পদচারণ করতে করতে বলে উঠলেন,—'নারায়ণ! বলে দাও, প্রভু! আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত! কী পবিত্র সুখনীড় আমি ভেঙ্গে দিয়েছি! এই পাপ-মর্ত্যে কপোত-কপোতী যে স্বর্গ রচনা করেছিল, আমারই নিষ্ঠুর শরাঘাতে যে সুখ-নীড় নষ্ট করেছি ; তারই ফলে আজ

তাদের শাবক আমার পদতলে পড়ে হাহাকার করছে। হে কৃষ্ণ! হে সখা, এ নারকী তোমার সখা হওয়ার অযোগ্য। ধনুর্বাণ ধরার অযোগ্য আমি। অনুমতি দাও, বাসুদেব! বীরবেশ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থ-পর্যটনে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।'

শৈলজা তখন বললে,—'এ দাসীকে ক্ষমা করুন, দেব! বৃথা অনুতাপ ত্যাগ করুন, প্রভু! পিতার মুখে শুনেছি,—সুখ-দুঃখ পূর্বকর্মফল। আপনি যদি পাপী, তবে আর পুণ্যবান্ কে?'

পার্থ পালঙ্কে বসে শৈলজাকে পাশে বসিয়ে তার মাথাটি নিজের বুকে রেখে বললেন,—'এ একাদশ বর্ষ কি করে কাটালে শৈল?'

—মায়ের মৃত্যুর পর, পিতৃব্য-পুত্র বাসুকির গৃহে আশ্রয় পেলাম। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তীর চালনা অনুশীলন করতে লাগলাম। তারপর দাদা বাসুকির মুখে আপনার রৈবতক-আগমন-সংবাদ পেলাম। দাদা দেবী সুভদ্রার রূপে মুগ্ধ। হরণ করে নিয়ে তাঁকে বিবাহ করবেন—এই পরিকল্পনায় আমাকে দিয়ে দেবী সুভদ্রার গতিবিধি জানতে এবং আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে আপনার ভৃত্যের কাজ গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। আর সেই জন্য পুরুষের ছদ্মবেশে এলাম রৈবতকে। তার পরের ঘটনা তো জানেন, প্রভু!

—সেদিনের সে দস্যুপতি কি তবে বাসুকি?

—হ্যাঁ, বাসুকি।

—আর তুমিই সেদিন পিতৃহন্তাকে বাঁচালে সেই দস্যুর হাত থেকে! কি বিচিত্র ঘটনা! কি বিচিত্র নিয়তির খেলা!

—হ্যাঁ বিচিত্র তো বটেই, প্রভু! আর সেই দস্যুর তরবারি আমাকে রেহাই দেবে না, জানি।—যেদিন রৈবতকে আপনার দেবরূপ দেখলাম, সেইদিনই প্রতিহিংসা ভুলে ঐ পদে নিজেকে সমর্পণ করেছি।

আবেগ-ভরে পার্থ শৈলজার হাত দু'টি ধরে বললেন,—'শৈলজা! চল ইন্দ্রপ্রস্থে। তোমার পিতার শ্মশানে মন্দির গড়ে সেখানে পুত্রের ন্যায় তোমাকে পালন করব, তোমার মুখে হাসি ফোটাব। তাহলেই আমি তোমার পিতৃহত্যা-পাপ থেকে মুক্তি পাবো। তোমার ঐ মুখখানি বক্ষে ধারণ করে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াব।'

—আমিও মনে মনে ভেবেছি, নাথ! আমার শোকতপ্ত হৃদয়ে যে শান্তির রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, সে রাজ্যের রাজা তুমি, প্রভু! তোমার মধ্যেই আমি মিশে থাকব। তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, তুমি প্রাণেশ্বর; তুমিই শৈলজার ঈশ্বর। যে রক্তবাস পরিধান করে আমায় খুঁজেছিলে, নাথ! সেই বস্ত্র পরিধান করে তোমার শৈলজা তার অর্জুনকে খুঁজতে চলল।—'

এই বলে শৈলজা পাশের কক্ষে গেল। পার্থ অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন,—'ব্যাসদেব, আপনার ভবিষ্যদ্বাণী এমনি-ভাবে ফলে গেল! আমিই অভাগীর পিতৃহন্তা, আবার আমিই সেই অভাগীর মৃত্যুর কারণ।'

তারপর আবেগ ভরে শৈলকে ডাকলেন,—'শৈলজা—শৈলজা।' এলো না সে।

পার্থ শৈলর কক্ষে গিয়ে দেখলেন, সেখানেও সে নেই। বাইরে এসে ডাকলেন—'শৈল!' 'শৈল!' কোন উত্তর নেই।

কক্ষের বাইরে আশে-পাশে খুঁজলেন পার্থ। আবার ডাকলেন—'শৈল,—শৈল!'

কোন উত্তর নেই। পার্থ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এমন সময় দারুক রথ নিয়ে এসে উপস্থিত। কিছুক্ষণ চিন্তাকরে কর্তব্য স্থির করলেন পার্থ; তারপর সশস্ত্র হয়ে তাড়াতাড়ি রথে উঠে পড়লেন তিনি।

রৈবতকে উৎসব শেষ। যাদব-পুরনারীগণ সকালে নারায়ণ মন্দিরে পুজো সেরে দলবেঁধে সারে সারে দ্বারাবতী চলেছে। পর্বতের ওপরে সভাগৃহে ব্যাসদেব, কৃষ্ণ-বলরাম ও কোন কোন যাদব-প্রধান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুভদ্রার বিবাহ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। অনেকেই সুভদ্রার স্বয়ম্বরের পক্ষে মত দিলেন। কারণ তাঁরা জেনেছেন,—অর্জুন ও দুর্যোধন উভয়ে সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী।

এই সময় বলরাম বললেন,—'বর্তমান ভারতে দুর্যোধন নৃপতিদের মধ্যে রাজ-চক্রবর্তী তুল্য। শৌর্যে, বীর্যে, ঐশ্বর্যে, কুলমানে শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া সে আমার প্রিয়তম শিষ্য; গদাযুদ্ধে তার সমতুল্য কেউ নেই। তার তুলনায় অর্জুন কোন বিষয়ে তার যোগ্য নয়।

তখন ব্যাসদেব বললেন,—'তোমার কথা যদি মেনেই নি, বৎস! এরপরেও কথা আছে। প্রেম-ভালবাসা-অনুরাগ বলে যে বৃত্তিগুলি মানব-মনে বিরাজ করে, তাকে তো অস্বীকার করা যায় না!'

বলরাম বললেন,—'কে বলেছে—অর্জুনের প্রতি সুভদ্রা অনুরক্তা? ভগিনী আমার উদাসিনী। আমার কথা লঙ্ঘন করার জন্য পরিজনদের মধ্যে কেউ এ কথা প্রচার করেছে।'

—পরিজনদের মনে কষ্ট দিয়ে কি শুভ ফললাভ হবে তোমার? সুভদ্রার মন তো তুমি জান না! সেই জন্যই মনে হয়—সুভদ্রার স্বয়ম্বর হওয়াই উচিত।

বলরাম বললেন,—'আপনার শ্রীচরণে ক্ষমা চায় দাস। আমার যে কথা, সেই কাজ; তার অন্যথা হবে না।'

এই সময় রৈবতক-পাদদেশে ভীষণ কোলাহল; যুদ্ধের ভেরী ও দামামা বেজে উঠেছে। সভাস্থ সকলে চমকে উঠলেন। এই সময় একজন সৈনিক ছুটে এসে সভায় বলতে লাগল,—'প্রভু!

বিষম বিপদ উপস্থিত। পুরনারীগণ সসৈন্যে সজ্জিত রথে মৃদুমন্দ গতিতে দ্বারাবতী যাচ্ছিলেন ; হঠাৎ কেশবের রথ সৈন্যদল ভেদকরে যে রথে দেবী সত্যভামা, দেবী সুভদ্রা ও সুলোচনা বসে ছিলেন, তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। সেই রথ থেকে নেমে ফালগুনি দেবী সত্যভামার চরণ বন্দনা করে দেবী সুভদ্রার কক্ষে হাত দিয়ে তাঁকে কেশবের রথে তুললেন, তখন দেবী ভদ্রা ফাল্গুনির বক্ষে আশ্রয় নিলেন। সুলোচনা 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার করে দেবী সুভদ্রার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল, ফাল্গুনি তখন অন্য হাতে তাকেও জোর করে তাঁর রথে তুললেন। সৈন্য-সামন্ত ফাল্গুনির রথের দিকে ছুটল। তখন ফাল্গুনি দেবী-সুভদ্রাকে রথে বসিয়ে শরাসন হাতে নিলেন এবং সারথি দারুককে রথ চালাতে আদেশ দিলেন। দারুক করজোড়ে বললে,—'বীরশ্রেষ্ঠ, আমাকে ক্ষমা করুন ; আপনি আমার প্রভুর ভগিনীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি সেই কাজে আপনার সহায় হবো ?'

—'দারুক, তোমাকে কোন দোষ দেব না, তুমি তোমার ধর্ম পালন করেছ। আমারও বীরধর্ম আমি পালন করব, আমাকে কোন দোষ দিও না।' এই বলে ধনঞ্জয় দারুকের উত্তরীয় দ্বারা তাকে রথদণ্ডের সঙ্গে বাঁধলেন।

এই সময় সুলোচনা বললে,—'আমি বুঝি যাদবের কেউ নই ? আমি কি চুপ করে থেকে চোরের সহায়তা কোরব ?'

তখন ধনঞ্জয় হেসে সুলেচেনার উত্তরীয় দিয়ে তার দু'হাত বেঁধে অন্য প্রান্ত সুভদ্রার হাতে দিলেন।

সুলোচনা বললে,—'তোকে ভালবেসে এই ফল লাভ হোল, ভদ্রা ?'

ফাল্গুনি তখন অশ্বের রশ্মিগুলি পা দিয়ে ধরে হাতে শর-শরাসন নিয়ে দ্রুত সৈন্যদলের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

সৈন্যদলের শর অর্জুনের শরে অর্ধপথেই খণ্ডিত হতে লাগল। তুমুল সংগ্রাম শুরু হোল। তখন সুভদ্রা অশ্বের বল্গা হাতে নিলেন।

এই সময় অন্য এক সৈন্য রৈবতক-সভায় এসে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করলে।

তখন বলরাম বললেন,—'এখনও চুপ ক'রে রয়েছ, কৃষ্ণ? কাপুরুষের মত এই অপমান সহ্য করবে? কুলাঙ্গার পার্থ বিশ্বাস-ঘাতকের মত অতিথির ধর্ম পালন করেছে! যাদবের মর্যাদায় এমনি ভাবে কলঙ্ক লেপন করলে? অন্ধক-বৃষ্ণি-ভোজ-বংশীয় বীরগণ! তোমরা এখনও সেই বিশ্বাস-ঘাতককে শাস্তি দিতে অগ্রসর হচ্ছ না? যাও, সভারক্ষক! নিয়ে এসো রথ। আমি একা যাবো কুলাঙ্গার অর্জুনকে শাস্তি দিতে।'

সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধ কোলাহল প্রবল হয়ে উঠেছে।

এতক্ষণ কেশব নীরবে বসেছিলেন। এইবার তিনি বিনীত কণ্ঠে বলরামকে বললেন,—'ধর্ম-শাস্ত্রের কথা তোমাকে আর কি বোঝাব? তুমি নিজে সর্বশাস্ত্র-বিশারদ। হরণ করে কন্যাবিবাহ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। অর্জুন জেনেছেন, সুভদ্রার স্বয়ম্বরে তোমার মত নেই। শুল্কের বিনিময়ে কন্যাদান যদুবংশে কখনও হবে না; ভিক্ষাদ্বারা কন্যালাভ সম্ভব নয়; কারণ ভিক্ষুকের হাতে কেউ কন্যা সম্প্রদান করে না। কাজেই ক্ষত্রিয়ের ধর্মানুসারেই সুভদ্রাকে বিবাহ করা তাঁর অভিপ্রেত।'

এই সময় অন্য এক সৈনিক সভাস্থলে এসে বলতে লাগল,—'প্রভু, কি অদ্ভুত রণ-কৌশল পার্থের। বিপক্ষ সৈন্যের শর ছিন্ন করে হাসিমুখে পার্থ যেন যুদ্ধের খেলা খেলছেন; কারও দেহে অস্ত্রাঘাত না করে অবিরাম শর বর্ষণ করছেন; সৈন্যদল নিরস্ত্র হয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ছে। দেবী সুভদ্রার অশ্বচালনার কৌশলে

বিপক্ষের অস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ভূমিতে পড়ছে। কি অপূর্ব শিক্ষা! এমন রক্তপাতহীন যুদ্ধ কোনদিন দেখি নি, প্রভু!'

এই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে আবার প্রবল কোলাহল উঠল। শৃঙ্গস্থ সভাস্থল কেঁপে উঠল। সভাস্থ সকলে ব্যাকুলভাবে অগ্রসর হয়ে ওপর থেকেই যুদ্ধ ক্ষেত্র অবলোকন করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁরা স্তব্ধ হয়ে নিরুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন—সাত্যকির শরে অজ্জুর্ন মূর্ছিত হয়ে রথে শুয়ে আছেন, সুভদ্রা চরণে অশ্বের রশ্মি ধরে হাতে ধনুক-বাণ নিয়ে তাঁর পৃষ্ঠদেশের কৃষ্ণ-মেঘ-সদৃশ উন্মুক্ত কেশরাশিদ্বারা মূর্ছিত অর্জুনের দেহ সংরক্ষিত করে বিপুল উত্তেজনায় যুদ্ধ করছেন; সেই আলুলায়িত কুন্তলা সুভদ্রার আক্রমণে বিপক্ষ সৈন্য ছত্র-ভঙ্গ। তখন তারা—'জয়, সুভদ্রার জয়' বলে জয়ধ্বনি করে উঠল। যাদব-রমণীগণ বিস্ময়-বিমোহিত। সুভদ্রার সেই তেজস্বিনী রণ-রঙ্গিণী মূর্তি দেখে বলরাম আনন্দোচ্ছ্বাসে ওপর থেকেই দুহাত তুলে বলে উঠলেন,—"জয়, সুভদ্রার জয়।" 'ধন্য সুভদ্রা, ধন্য তোর অস্ত্রশিক্ষা, ধন্য যদুকুল।'

জয়ধ্বনির উচ্চরবে অর্জুনের মূর্ছা ভঙ্গ হোল। সুভদ্রার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে শর-শরাসন হাতে নিয়ে মুহূর্ত মধ্যে সাত্যকির ধনুক ও বর্ম-চর্ম কেটে ফেললেন। যতবার সাত্যকি ধনু-শর যোজনা করছেন, ততবার অর্জুন তা কেটে ফেলছেন। কি অদ্ভুত শিক্ষা-কৌশল! তখন ব্যাসদেব বললেন,—'দেখ বলরাম, ফাল্গুনির কি মহত্ত্ব। নিজের দেহে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে রক্ত ঝরছে, তবু সে বিপক্ষ যোদ্ধার দেহে অস্ত্রাঘাত না করে শুধু তার অস্ত্র-বর্ম ছিন্ন করছে। কি অদ্ভুত অস্ত্রশিক্ষা!'

কেশব তখন উদ্বেগে বলে উঠলেন,—'এ তো প্রভু, যুদ্ধ নয়, আত্ম-নিপীড়ন; যাদবদের শুধু কলঙ্ক।'

এই সময় সাত্যকি অস্ত্রহীন হয়ে লজ্জায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ

করলেন। তারপর যত যাদববীর যুদ্ধে অগ্রসর হলেন, সকলেই অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে অস্ত্রহীন হয়ে পলায়নপর হলেন। বলরাম পার্থের পরাক্রমে বিস্মিত। তিনি তখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন। তখন নারী-পুরুষ সকলেই 'জয়, ভদ্রার্জুনের জয়' বলে বারবার জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। অর্জুন তখন জয়ধ্বনি করলেন— 'জয়, কৃষ্ণ-বলরামের জয়।'

সুভদ্রার কুন্তলে যে ফুলের মালা ছিল, পার্থ তা থেকে ফুল নিয়ে শরের মুখে সেইফুল স্থাপন করে সেই শর নিক্ষেপে ব্যাস-কৃষ্ণ-বলরামকে পুজো করলেন। শরস্থিত ফুল তিনজনের চরণে গিয়ে পড়ল। তিনজনে সেই ফুল হাতে নিয়ে বাহু উত্তোলন করে ওপর থেকে ভদ্রার্জুনকে আশীর্বাদ করলেন।

রৈবতকে সুভদ্রা-অর্জুনের বিবাহ সুসম্পন্ন হোল। তারপর কৃষ্ণ-বলরাম বহু উপঢৌকন—অগনিত গজ, অশ্ব, গাভী, দাস-দাসী ও ধনসম্পদসহ ভদ্রার্জুনকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রপ্রস্থ / কালিন্দী / খাণ্ডবদাহ / ময়দানব

একযুগ পরে অর্জুন গৃহে ফিরলেন। কৃষ্ণ-বলরামও এই দীর্ঘকাল ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন নি। এঁদের আগমনে ইন্দ্রপ্রস্থ যেন নূতন ভাবে সজ্জিত হতে লাগল।

কেশব লক্ষ্য করলেন—এই দ্বাদশ বৎসরে ইন্দ্রপ্রস্থের বিশেষ উন্নতি হয় নি। তিনি নূতন করে ভাবতে লাগলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের উন্নতির কথা ভাবার মধ্যে বাসুদেবের প্রথম মনে

হয়েছে যুধিষ্ঠিরের রাজসভার কথা। দ্বারাবতীতে সুদক্ষ শিল্পী বিশ্বকর্মার সাহায্যে সেখানকার সব কিছু সুন্দরভাবে নির্মাণ করাতে পেরেছেন। তিনি শুনেছেন ঐ রকম আর একজন বড় শিল্পী নিকটেই আছেন, তার নাম ময়দানব।* দেবরাজ ইন্দ্রের ভয়ে খাণ্ডব বনের কোথাও লুকিয়ে আছেন। তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে।

বলরাম ইন্দ্রপ্রস্থে এসে পিতৃস্বসার বাড়ীতে নূতন আর এক আত্মীয়তার বন্ধনে অর্থাৎ নিজের প্রিয় ভগিনীর শ্বশুরালয়ে নূতন ভাবে যেন আদর-যত্নের আধিক্য অনুভব করতে লাগলেন। তিনি সোমরস পানের নেশায় সেই আনন্দ পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে লাগলেন।

কৃষ্ণার্জুন প্রায় দিনই মৃগয়ায় যেতেন এবং মৃগয়ালব্ধ মেধ্য মাংস** যুধিষ্ঠিরের রন্ধন-শালায় প্রেরণ করতেন। একদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে বাসুদেব জলপানার্থে যমুনার তীরে উপস্থিত। দেখলেন— গৈরিক বস্ত্র-পরিহিতা একজন কুমারী তাপসী বারিপাত্র কক্ষে নিয়ে গৃহে ফিরছেন। বাসুদেব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, —এই কুমারী জীবনে তার তাপসীর বেশ কেন? তখন তিনি জানিয়েছিলেন—শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পতিত্বে বরণ করেছেন, কিন্তু তাঁকে তিনি দেখেন নি, জীবনে তাঁকে পাবেন কিনা, তাও তিনি জানেন না। তাই তিনি সেই কৃষ্ণের আরাধনায় তাপসীর জীবন যাপন করছেন। বাসুদেব তার কথা শুনে শুধু অবাক্ই হলেন না, তার এই একনিষ্ঠ প্রেমের জন্য মুগ্ধ হলেন। তখন তিনি নিজ পরিচয় দিয়ে তার সাধনায় সিদ্ধি লাভ হবে বলে আশ্বাস দিলেন। এই

---

* ময়দানব নমুচিদৈত্যের সহোদর। ময়ের প্রণয়িনীকে ইন্দ্র তাঁর প্রমোদ উদ্যানে জোরকরে আটকিয়ে রেখেছিলেন ; এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিবাদ।

** সুস্বাদু পবিত্র মাংস

কুমারীর নাম কালিন্দী। পিতার নাম সূর্য। এ-সূর্য আকাশের সূর্য নয়, মর্তেরই মানুষ।

তাপসী কালিন্দী বাসুদেবকে তার গৃহে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। বাসুদেব বললেন,—সময় হলে তিনি নিজেই তাকে দ্বারাবতীতে নিয়ে যাবেন। তখন তিনি পথেই কালিন্দীর নিকট পানার্থে জল প্রার্থনা করলেন এবং কালিন্দীর জলপাত্র থেকে জল গ্রহণ করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। কালিন্দী সিদ্ধা তাপসীর ন্যায় হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করে গৃহে চলে গেলেন।

সেই সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। একদিন শিকার করতে করতে কৃষ্ণার্জুন খাণ্ডবপ্রস্থের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। হঠাৎ দেখলেন স্থানটি শিলাময়; অদূরেই একটি গহ্বরের মত দেখলেন; তার মুখ একটি শিলাখণ্ডদ্বারা বন্ধ। সেই শিলাখণ্ডের গায়ে খোদাই করা কয়েকটি চিত্র; মনে হচ্ছে অস্ত্রের নক্সা। অর্জুন খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। গুহা-মুখের শিলাখণ্ড সরিয়ে গুহাটি উন্মুক্ত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বাসুদেব বুঝতে পারলেন অর্জুনের মত যোদ্ধার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে শিলা-খণ্ডটি গুহামুখে ছিল, তা স্বাভাবিক কোন মানুষের পক্ষে ঠেলে সরানো দুঃসাধ্য। কিন্তু পার্থ বলপ্রয়োগে শিলাখণ্ডটি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই বাসুদেব অর্জুনকে বললেন—'সখা, এখন থাক। দেখতে পাচ্ছো না—গ্রীষ্মের দাবদাহে দাবানল সৃষ্টি হয়েছে,—আমরা এখন বনের বাইরে নিরাপদ স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। পরে আবার এই স্থানে এসে যথা কর্তব্য করব।' বলেই পার্থের হাত ধরে কেশব তাঁকে টানতে টানতে বনের বাইরে নিয়ে এলেন। ততক্ষণে দাবানল-শিখা দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

হঠাৎ দেখা গেল—সেই জ্বলন্ত বনের দিক্ থেকে কে একজন ছুটে বেরিয়ে আসছেন এবং বনথেকে বেরিয়েই কৃষ্ণার্জুনের সম্মুখে এসে পড়েছেন। বাসুদেব আগন্তুককে ভয় দেখানোর ভান করে

ধনুকে শর যোজনা করলেন। আগন্তুক বললেন,—'আমায় মারবেন না, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ভয়ে প্রাণ রক্ষার্থে বনের আশ্রয় থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছি, আমি আপনাদের শত্রু নই ; আমায় রক্ষা করুন। বিনিময়ে আপনাদের প্রয়োজন মত কাজ করে দেব।'

আগন্তুক কৃষ্ণার্জুনকে জানতেন না, মনে হয়। আরও মনে হয়. তিনি ভেবেছিলেন—এরা ইন্দ্রের প্রেরীত লোক হতে পারে।

বাসুদেব বললেন,—'তুমি কে?'

—আমি কাশ্যপেয় ময়, নমুচির সহোদর?

—তুমি তা হলে সেই বিখ্যাত শিল্পী—ময়দানব?

—হ্যাঁ।

—তোমার সম্মুখে ঐ দাঁড়িয়ে আছে রাজ-ভ্রাতা অর্জুন। তুমি যদি তোমার প্রাণরক্ষার বিনিময়ে কিছু করতে চাও, তবে এর কাছে কোন কাজ চাও।

বলেই বাসুদেব অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন।

ময় তখন অর্জুনের নিকট গিয়ে নতজানু হয়ে বললেন,—'আপনার জন্য কি করতে পারি আমি?'

অর্জুন তখন বললেন,—'আমার জন্য কিছু করতে হবে না। তুমি আমাদের আশ্রিত। আশ্রিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যুপকার আমি গ্রহণ করি না। আর তোমার প্রাণ রক্ষা করেছেন ইনি—বাসুদেব ; যদি কিছু উপকার করতে চাও, তবে ওঁকে জিজ্ঞেস কর।'

তখন ময় আবার বাসুদেবের নিকট গেলেন। বাসুদেবও ময়কে বললেন,—'আমার নিজের জন্য কিছু করতে হবে না। যদি কিছু করতে চাও, তবে রাজার জন্য এবং রাজ্যের জন্য কিছু কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির এ রাজ্যের অধিপতি। তাঁর জন্য এবং এই রাজ্যের জন্য একটি মনোরম রাজ-সভা তৈরী করে দাও। এ কাজের জন্য তুমিই যোগ্য ব্যক্তি। রাজসভাটি এমন হওয়া চাই,

যা ভারতের অন্যান্য রাজসভা অপেক্ষা যেমন বৃহৎ, তেমনি সুন্দর হয়।'

এই সকল কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ দেখা গেল প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। কৃষ্ণার্জুন পুলকিত হলেন।

বাসুদেব তখন ময়কে বললেন,—'তুমি আমাদের সঙ্গে চল, এই বনের মধ্যে একটি কাজ সেরে তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাব। সেখানে তোমার একটি স্বচ্ছন্দ স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেব। সেখানে থেকে সেই সভা-নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করবে। সভা নির্মাণের প্রয়োজনীয় সবকিছু জোগাড় করতে রাজকীয় সাহায্য সব রকম পাবে।

বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় তাঁরা তিন জনই আবার অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং সেই পূর্বের গুহা মুখের শিলাখণ্ডের সম্মুখে দাঁড়ালেন।

বাসুদেব তখন ময়কে জিজ্ঞেস করলেন,—এই সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে সে কিছু জানে কিনা।

ময় বললেন,—'শুনেছি—পূর্বে এখানে যে সভ্য জাতি বাস করতেন, তাঁদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্র কিছু এখানে আছে।'

শোনার সঙ্গে সঙ্গে পার্থ প্রস্তর-খণ্ডটি সরিয়ে ফেলার জন্য উদ্যোগী হলেন। ময় তাঁকে সাহায্য করলেন। তাঁদের তিনজনের চেষ্টায় শিলা খণ্ডটিকে সুড়ঙ্গ মুখথেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হোল। তিনজনেই ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারপর তাঁদের অবাক্ হবার পালা। যে সব অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র রয়েছে, তাতে কয়েকটি বিস্ময়কর অস্ত্রও রয়েছে। একটি ধনুক, যা সাধারণ ধনুক অপেক্ষা সম্পূর্ণ অন্যরকম। যেমন তার বৃহৎ আকার, তেমনি ভারী ; গণ্ডারের শিরদাঁড়া দিয়ে তৈরী ; আর একটি লৌহ-মুদগর ; সেটিও যেমন বৃহৎ তেমন ভারী। এই দু'টি অস্ত্র যাঁরা

ব্যবহার করতেন, তাঁরা যে সাধারণ যোদ্ধা অপেক্ষা অনেক বেশী বলবান্ ছিলেন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। অর্জুনের পেশী-সমূহ চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি ধনুকটি তুলে দাঁড় করলেন। অর্জুনের মত ধনুর্ধরও অবাক্ হয়ে ধনুকটিকে দেখতে লাগলেন। গণ্ডারের শিরদাঁড়াদিয়ে তৈরী বলে এর নাম দিলেন গাণ্ডীব। আর সেই মুদগরটি (গদা) এত ভারী যে, ভীমের মত বীর ছাড়া তা ব্যবহার করা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। আর একটি গদা ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু তা ছিল স্বর্ণ-তারকা, হীরক ও অন্যান্য মনি-মুক্তা খচিত। ময় বললেন এর নাম কৌমদকী গদা। তখন অর্জুন গাণ্ডীব ধনু ও তার সঙ্গে তূণীর, আর বাসুদেব কৌমদকী গদা গ্রহণ করলেন। সেই ভারী লৌহ-মুদগর ও অন্যান্য জিনিস সেখানে রেখে আবার তিনজনে মিলে সুড়ঙ্গ মুখে পূর্বের শিলা-খণ্ডটি যথা স্হানে স্হাপন করে ইন্দ্রপ্রস্হ অভিমুখে চললেন।

সেখানে পৌঁছিয়ে ব.সুদেব ময়কে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পরিচয় করালেন এবং ময়কে রাজসভা নির্মাণের ভার দিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারে ময় খুবই মুগ্ধ হলেন এবং আশ্বাস দিলেন —এই নির্মাণ-কার্যে তাঁর সারা জীবনের শিল্পকর্মের যে অভিজ্ঞতা, তার নিদর্শন এই রাজসভায় তা প্রতিফলিত হবে। তিনি পূর্বে একবার দানব-রাজ বৃষ-পর্বার রাজ-সভা নির্মাণের ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সভা সম্পূর্ণ হবার পূবেই বিশেষ কারণে তা শেষ করা সম্ভব হয় নি। তাই তিনি বললেন—

'আমি সেখানে গিয়ে যদি সেই সভা-নির্মাণের মাল-মশলা এবং মূল্যবান্ প্রস্তরাদির সংগ্রহ করতে পারি, তবে আমি আমার মনের মতন করে এই সভা নির্মাণ করার আশা রাখি।'

'কৈলাসের উত্তরবর্তী মৈনাক পর্বতে যেতে হবে। পুরাকালে দানবগণ সেখানে যজ্ঞ করতে ইচ্ছে করেছিলেন, তারজন্য আমি বিন্দু সরোবরের নিকট কতকগুলি বিচিত্র মণিময় দ্রব্য সংগ্রহ

করেছিলাম, যা দানবরাজ বৃষপর্বার সভায় দেওয়া হয়। যদি পাওয়া যায়, তবে সেগুলি আমি আপনাদের সভার জন্য নিয়ে আসব।'

বাসুদেবের পরামর্শানুসারে সেই রাজসভার আয়তন পরিসীমা স্থির করা হলো ১০,০০০ হাত। সর্ব ঋতুতে সুখপ্রদ আবহাওয়া বিশিষ্ট খাণ্ডব প্রস্থের পূর্বাংশে যে অঞ্চল বনমুক্ত করা হয়েছিল, শুভদিন দেখে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছানুসারে স্বস্তয়নাদি সম্পন্ন করে নারায়ণের ঘটস্থাপন করে বাসুদেব সেই সভার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব বাসুদেবের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। কাজেই দীর্ঘদিন বাসুদেবকে সেখানে থাকতে হয়েছিল। আর সেইজন্য বলরামকে অল্পদিন পরে দ্বারাবতীতে ফিরে যেতে হয়েছিল।

দ্বারাবতীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দূত দ্বারাবতীতে প্রায়ই যাতায়াত করত। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের গুরুদায়িত্ব যুধিষ্ঠির তার ওপর ন্যস্ত করায় তিনি ইন্দ্রপ্রস্থের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করতে পারছেন না। তাছাড়া ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের এই বিরাট রাজসভা নির্মাণের পশ্চাতে বাসুদেবের স্বপ্ন সার্থক করার এক বিরাট পরিকল্পনা তিনি করে রেখেছেন। মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে দুর্নীতি-মুক্ত করে সাধারণ মানুষকে শোষণ-মুক্ত করতে এক রাজছত্র-তলে এক ধর্ম, একজাতি গঠন করে এই খণ্ডিত ভারতকে এক অখণ্ড ভারত-ভূমিতে পরিণত করতে হবে। আর্য অনার্যের বিভেদ ঘুচিয়ে 'সবাই এক ভারত মায়ের সন্তান'—এই মনোভাব যাতে সকল ভারত-বাসীর মনে জাগরিত থাকে, তারজন্য তিনি যে ব্রত গ্রহণ করেছেন, তা ফলপ্রসূ করতে হলে যুধিষ্ঠিরের মত ন্যায়নিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তির নেতৃত্ব এবং ভীমার্জুনাদি পাণ্ডবদের ন্যায় নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একান্ত প্রয়োজন।

তাঁর দ্বারাবতী আজ দারিদ্র্যমুক্ত। সেখানে ধন-বৈষম্য নেই, সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে বিরাজ করছে, জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুন্ন হচ্ছে না। মথুরার ন্যায় গণ-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সেখানে কাজ করছে। কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় দ্বারাবতী অতি ক্ষুদ্র। তা'হলেও দ্বারাবতীর মত জন সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সারা ভারতেও তিনি চান। সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা যাতে পূরণ হতে পারে, তার জন্য তার ভাবনা।

সময় চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়েছে। বাসুদেবই সুভদ্রাতনয়ের নামকরণ করেছিলেন। নবজাতক ভাগিনেয়ের কল্যাণার্থে স্বয়ং জাত-কর্মাদি সমস্ত মঙ্গলানুষ্ঠান করেছিলেন।

চার বৎসরের মধ্যে সভার নির্মাণকার্য শেষ হয়ে এলো। অনেকদিন বাসুদেব দ্বারাবতী-ছাড়া। একবার পিতা বাসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রয়োজন! ইন্দ্রপ্রস্থে তিনি পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় চাইলেন। কুন্তীদেবী বাসুদেবকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন,—'যুধিষ্ঠির তোমার পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজই করে না। তাই বলি—ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে বেশীদিন থেকো না। আমরা সকলেই তোমার উপস্থিতিতে খুব আনন্দলাভ করি।'

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে দ্রৌপদীর মহলে গেলেন বাসুদেব। ইতিমধ্যে দ্রৌপদীও পঞ্চপুত্রের জননী হয়েছেন। পঞ্চপুত্রের নাম —প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন। শুভদ্রাকে সেখানে ডাকিয়ে এনে তাকে দ্রৌপদীর হাতে দিয়ে বললেন,—'ছোট বোনের মত একে নিজের কাছে রেখে উপদেশ দিয়ে সংসারের সকল কাজে সাহায্য কোরো, সখি! ছোট বোনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও নিজগুণে ক্ষমা কোরো।'

দ্রৌপদী শুভদ্রাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর দাস-দাসীদের সকলকে পারিতোষিক দিয়ে বহির্বাটিতে এসে যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম জানিয়ে ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করলেন বাসুদেব। তারপর নকুল-সহদেব এসে বাসুদেবকে প্রণাম করলেন। এদিকে দারুক চতুরশ্ব যুক্ত বাসুদেবের স্বর্ণমণ্ডিত রথ নিয়ে এসে উপস্থিত। সকলেই রথে উঠলেন। দারুককে সরিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠির নিজে সারথির আসনে বসলেন। রথ দ্বারাবতীর পথে চললো। অনেকদূর—প্রায় ক্রোশাধিক পথ রথ চলে এলে বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করলেন,—ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যেতে ;—অকেনটা পথ। যুধিষ্ঠিরাদি সকলে রথ থেকে অবতরণ করলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে যারা পদব্রজে তাঁদের অনুসরণ করেছিল, তারাও এসে সেখানে একত্রিত হোল। হাততুলে সকলকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বাসুদেব দারুককে রথ চালাতে নির্দেশ দিলেন। পাণ্ডবগণ লোকজন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে চললেন।

বিরহের বেদনামিশ্রিত একটা পরিবেশ বিরাজ করতে লাগল ইন্দ্রপ্রস্থে। বাসুদেব যেন ইন্দ্রপ্রস্থের কর্মকেন্দ্রের মধ্য-বিন্দু।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিত্রবিন্দা প্রভৃতির বিবাহ / পিণ্ডারকে উগ্রসেনের রাজসূয়-যজ্ঞ

বাসুদেব ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে ফিরে এসে দ্বারাবতীর অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখতে লাগলেন। উগ্রসেন বয়সের ভারে স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হচ্ছেন ; কিন্তু রাজকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর পাশে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা এক একজন এক একটি দিক্‌পাল। পরামর্শ-দাতা হিসেবে সর্বোচ্চ পদে বাসুদেবের পরম পূজ্য গুরুদেব সান্দীপনি মুনি রয়েছেন, রয়েছেন মহামতি বিকদ্রু ;

তাছাড়া বসুদেব, নন্দ ঘোষ, দেবক, সত্যক প্রভৃতি প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ও বলরামের ন্যায় মহাবীর, অনাধৃষ্টির ন্যায় যুদ্ধ-বিশারদ ও সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতির ন্যায় বীরবৃন্দ রয়েছেন। এঁদের পরিচালনায় দ্বারাবতীর সৈন্যগণ দুর্ধর্ষ অজেয় বীররূপে খ্যাতিলাভ করেছে। তাঁরাই বাসুদেবের নারায়ণী সেনা।

মথুরাতে কংসবধের পর বাসুদেব নিজে মথুরার সিংহাসনে না বসে বৃদ্ধ উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজভক্ত প্রজারূপে রাজার সেবা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন এবং শপথ করেন বিশ্বজুড়ে যাতে যদুবংশের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, তারজন্য বাসুদেব এই যদুরাজ উগ্রসেনকে রাজ-চক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত করবেন। দ্বারকার বর্তমান অবস্থাকে বাসুদেব সেই কার্যের যোগ্য সময় বলে ভাবছিলেন। তবে যে সব অন্তরায় তাতে বাধার সৃষ্টি করবে, তাও তিনি মনে মনে ভাবছিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

বাসুদেব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গুপ্তচর পাঠিয়ে তাদের মনোভাব জানতে চেষ্টা করতে লাগলেন। উত্তর ভারতে মদ্র, কেকয়, অবন্তী, কোশল, হস্তিনাপুর ; আর পূর্ব-ভারতে মগধ— এই রাজ্যগুলি বাসুদেবের ইচ্ছা পূরণে বাধার সৃষ্টি করবে।

উত্তর-ভারতে প্রতিপত্তিশালী রাজ্যগুলির মধ্যে অবন্তীর অধিপতি জয়সেনের সহিত তাঁর পিতৃস্বসা রাজাধিবেদীর (বসুদেবের ভগিনী) বিবাহ হয়েছে। সেখান থেকে গুপ্তচর ফিরে এসে যে সংবাদ জানালে, তাতে বাসুদেব বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জয়সেনের সঙ্গে হস্তিনার বন্ধুত্ব। জয়সেনের পুত্রদ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দ দুর্যোধনের প্রিয়পাত্র। তারা তাদের ভগিনী মিত্রবিন্দাকে দুর্যোধনের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর

করতে ইচ্ছুক। সেইজন্য স্বয়ম্বর সভায় যাতে মিত্রবিন্দা দুর্যোধনকে বরণ করে, তারজন্য সচেষ্ট ছিল। বাসুদেব চিন্তা করলেন—হস্তিনার সঙ্গে অবন্তীর এই আত্মীয়তা-সম্পর্ক যাদবদের পক্ষে ক্ষতিকারক—স্বার্থহানিকর। তিনি জানতে পারলেন মিত্রবিন্দা বাসুদেবের প্রতি আকৃষ্টা।

মিত্রবিন্দার স্বয়ম্বর সভা। দুর্যোধন ও তাঁর অনুগৃহীত অনেক নৃপতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেবও সে সভায় উপস্হিল ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন,—মিত্রবিন্দার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ভ্রাতৃদ্বয় দুর্যোধনকে বরণ করার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করছে। তখন বাসুদেব বাধা দেন। কারণ অকামা* কন্যাকে এভাবে সম্প্রদান করা খুবই গর্হিত কাজ। সভায় তখন একটা গোলমাল সৃষ্টি হয়। তখন বাসুদেব অস্ত্র ধারণ করে উপস্থিত নৃপতিমণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করে মিত্রবিন্দাকে (তৎকালীন নিয়মানুসারে) হরণ করে নিয়ে যান এবং তাকে বিবাহ করেন।

উত্তর ভারতের আর একজন প্রতিপত্তিশালী নৃপতি ছিলেন কেশলের সূর্যবংশীয় রাজা নগ্নজিৎ। উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে কোশল রাজ্যের দিক্ থেকে কোন রূপ বাধা না আসে, সেটা লক্ষ্য রেখেই বাসুদেব তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক হলেন। তাই তিনি নিজে অরাজা হয়েও কোশল রাজ-কন্যার পাণিপ্রার্থী হলেন। নগ্নজিৎ কৌশলে বাসুদেবের সহিত সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে কন্যা শুল্ক স্বরূপ সাতটি মহাবলবান্ গো-বৃষকে একসঙ্গে দমন-রূপ বীর্যশুল্ক দেওয়ার শর্ত আরোপ করলেন।

বাসুদেব সপ্তবৃষকে যুগপত দমন করে রাজকন্যা নাগ্নজিতীকে (সত্যাকে) পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং কেশলরাজ নগ্নজিতের কাছ থেকে বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ বহু ধন-রত্ন লাভ করেছিলেন।

---

* অনিচ্ছুক

বাসুদেবের আর এক পিতৃস্বসা শ্রুতকীর্তির (মতান্তরে শ্রুতদেবার) বিবাহ হয়েছিল কেকয়রাজ ধৃষ্টকেতুর সহিত। ধৃষ্টকেতু যথেষ্ট প্রভাবশালী নৃপতি ছিলেন। তাঁর এক কন্যা—নাম ভদ্রা এবং সন্তর্দন প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র। ভদ্রা বাসুদেবের অনুরাগিণী। তার একান্ত অনুরোধে তার ভ্রাতাগণ বাসুদেবের সহিত তার বিবাহ দেন।

উত্তর-ভারতে আর একটি প্রতিপত্তিশালী রাজ্য ছিল মদ্র। সেই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন পরাক্রান্তশালী বৃহৎসেন। এই রাজ্যটিকে আত্মীয়তা সূত্রে বাঁধতে পারলে যাদবদের সঙ্গে ঐ রাজ্যের কোন সংঘর্ষ বাঁধার সম্ভাবনা থাকবে না। তাই কেশব গুপ্তচর পাঠিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি জানতে চেষ্টা করলেন। তিনি জানলেন—মদ্ররাজকন্যা লক্ষ্মণা অপরূপ সুন্দরী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ ও বীরত্বের কথা জেনে তাঁকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য মনে মনে আশা পোষণ করতেন। রাজা বৃহৎসেন পরমা সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মণাকে যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করার অভিপ্রায়ে স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করলেন। শর্ত ছিল ঊর্ধ্বে ঘূর্ণ্যমান্ চক্রের অন্তরালে রক্ষিত অদৃশ্য মৎস্যকে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। (মনে হয়, অর্জুনেরও এই লক্ষ্যভেদ অসাধ্য ছিল।) বাসুদেব সেই লক্ষ্যভেদ করে লক্ষ্মণাকে লাভ করেন। মদ্র-রাজ্যের সহিত যাদবদের মিত্রতা স্থাপিত হোল।*

* * * * *

রাজসূয় যজ্ঞের স্থান নির্বাচন ব্যাপারে বাসুদেবকে চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছিল। কারণ যে যজ্ঞের তিনি আয়োজন করতে চলেছেন—তার বিপুলতার কথা কল্পনা করে যাদব প্রধানদের সহিত পরামর্শ করে দ্বারাবতী থেকে দুই যোজন (ষোল মাইল) দূরে

---

* মদ্রাধিপতি শল্যের রাজ্য এবং মদ্রাধিপতি বৃহৎ সেনের রাজ্য একই মদ্রদেশ নয় বলেই মনে হয়।

পশ্চিম সাগর তীরে অবস্থিত পিণ্ডারক নামক স্থানে এক সুবৃহৎ প্রান্তর মনোনীত করে সেখানে সভা মণ্ডপ নির্মাণের আদেশ দিলেন।

তিনি বিশ্ব জয়ের পরিকল্পনা নিয়ে দুর্ধর্ষ আভীর গোপ-জনতাকে মৃত্যুপণকারী সুশৃঙ্খল যোদ্ধারূপে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তারাই নারায়ণী সেনা।

সমগ্র যাদব সেনাকে চারটি ব্যূহে ভাগ করা হয়েছিল। তাদের নাম—বাসুদেব, বলদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহের অধিনায়কত্বে যাদবসেনা বিশ্বজয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোল। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে সকল সেনানায়কদের উপদেশ দিলেন বাসুদেব,—তাঁর এই বিশ্বজয়ের উদ্দেশ্য হবে সকল দেশের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া, 'পররাজ্য গ্রাসকরা'—এর উদ্দেশ্য নয়। মহারাজ উগ্রসেনকে একটা সম্মান-কর (যজ্ঞ-কর) শুধু তাদের দিতে হবে।

বিশ্বজিৎ সেনা-নায়কদের উপদেষ্টারূপে বুদ্ধি-সত্তম সখা উদ্ধবকে প্রেরণ করে বাসুদেব নিশ্চিন্ত হলেন। যাত্রাকালে অষ্টাদশ রথী বাসুদেবকে স্তুতি করেছিল।

প্রথমে নারায়ণী-সেনা পশ্চিম ভারতে নর্মদা-তীরস্থ মাহিষ্মতী ও মহারাষ্ট জয় করে। তার পর পশ্চিম উপকূলস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় ক'রে পরে পূর্ব-উপকূলস্থিত রাজ্যগুলি জয় করে। ক্রমে উত্তর অভিমুখে নারায়ণী সেনা যাত্রা করল। কোন রাজ্যের সার্ব-ভৌমত্ব বিঘ্নিত হয় নি বলেই, মনে হয়, উগ্রসেনকে সম্মান-কর দিতে কারও কাছ থেকে কোন আপত্তি আসে নি। শেষ পর্যন্ত হস্তিনাপুর গিয়ে প্রদ্যুম্ন প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। উদ্ধব এই সংবাদ দ্রুত রৈবতকে প্রেরণ করে বাসুদেবকে জানালেন। বলরাম-সহ বাসুদেব ত্বরিত-গামী রথে হস্তিনায় এলেন। এই সময় যুধিষ্ঠিরও হস্তিনায় এসে দুর্যোধনকে যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না

হওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত বাসুদেব ও বলরামের ইচ্ছাক্রমে যুদ্ধ বন্ধ হোল।

এই সময় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ-বলরামকে সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থে আমন্ত্রণ জানালেন। উত্তর ভারতের আরও কতকগুলি রাজ্য থেকে সম্মান-কর গ্রহণ করে নারায়ণী-সেনা-সহ কৃষ্ণ-বলরাম ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে বিশ্রাম-কালে যুধিষ্ঠির নারায়ণী-সেনার দিগ্বিজয়ে অর্জুনকে সঙ্গে নিতে বাসুদেবকে অনুরোধ করলেন। বাসুদেব ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে অর্জুনসহ প্রদ্যুম্ন ও অন্যান্য রথীদের নারায়ণী-সেনা সমভিব্যাহারে জগৎ-জয়ে (জম্বুদ্বীপ) প্রেরণ করলেন। উদ্ধব দূত হিসেবে তাদের সঙ্গে রইলেন। রৈবতকে তাঁর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় নিয়ে বাসুদেব বলদেবসহ দ্বারাবতীর দিকে যাত্রা করলেন।

নারায়নী-সেনা অর্জুনসহ প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ ও অনিরুদ্ধ-ব্যূহের অধিনায়কত্বে উত্তরদিকে যাত্রা করে মদ্র, কেকয়, কাশ্মীর, গান্ধার প্রভৃতি দেশ থেকে যজ্ঞ-কর লাভ ক'রে ক্রমাগত উত্তরদিকে চলতে লাগল। তারপর ম্লেচ্ছ-রাজ কালযবন-পুত্র চণ্ডের রাজ্যে গিয়ে নারায়ণী-সেনা প্রবল বাধার সম্মুখীন হোল। চণ্ডের নিকট দূত পাঠালে দূত যৎপরোনাস্তি অপমানিত হয়। চণ্ড বাসুদেব-কর্তৃক তার পিতা কালযবনের নিহত হওয়ার কথা ভোলে নি। সে বাসুদেবের প্রতি বহু অপমান-সূচক কটুবাক্য প্রয়োগ করায় অর্জুন সহ্য করতে পারেন নি। তিনি চণ্ডকে কৃষ্ণ-নিন্দায় বিরত থাকতে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও চণ্ড সেকথা গ্রাহ্য করে নি। কৃষ্ণনিন্দায় অর্জুন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অর্জুনের হস্তে চণ্ড ছিন্ন-শির হয়ে নিহত হয়। চণ্ডের ছিন্নশির রৈবতকে বাসুদেবের নিকট প্রেরীত হয়।

উত্তর ভারতের সকল রাজ্য থেকে যজ্ঞ-কর গ্রহণ করে নারায়ণী

সেনা হিমালয় অতিক্রম করে জম্বুদ্বীপের অবশিষ্ট অষ্ট বর্ষ বিজয়ে ক্রমশঃ পূর্বোত্তর দিকে অগ্রসর হোল। অলকাপুরীর যক্ষরাজ উগ্রসেনকে যজ্ঞ-কর প্রদান-পূর্বক যদুপতি বাসুদেবকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল।

এরপর কিম্পুরুষবর্ষে (দক্ষিণ তিব্বত) অবস্থিত বসন্ত-তিলকপুরের রাজা শৃঙ্গার তিলককে পরাজিত করে নারায়ণী সেনা উত্তরদিকে যাত্রা ক'রে হরিবর্ষে উপস্থিত হয়। সেখানে কর গ্রহণ করে অর্জুনসহ অন্যান্য রথীবৃন্দ সেনাদল নিয়ে ক্রমে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলেন। এইবার সেনাদল উত্তর-কুরুবর্ষের রাজধানী বারাহীপুর জয় করে। সেখান থেকে উত্তরদিকে মেরুপ্রদেশের নিকট লীলাবতীপুর (লীলাবতীনদী বা লেনানদীর তীরবর্তী বর্তমান ইয়াকুর্টস্ক) তারা জয় করে।

উত্তর কুরুবর্ষ থেকে সেনাদল পূর্বদক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করে হিরন্ময় বর্ষে উপস্থিত হোল। সেখানকার চিত্রবনে বিরাটকায় হিংস্র বানরদল-কর্তৃক নারায়ণী সেনা আক্রান্ত হয়েছিল। প্রদ্যুম্ন ও অর্জুনের সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধে সেই মহাকায় বানরদল বশীভূত হয়। তারপর সেখানে দেবতাদের ধনরক্ষক রাজা দেবসখা উগ্রসেন ও যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সম্মানে বহু ধনরত্ন উপহার প্রদান করেন।

তারপর সেখান থেকে রম্যকবর্ষে (মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া) সেনাদল উপস্থিত হয়। এই বর্ষে স্বর্ণময় মানব-নগর নামক একটি বিখ্যাত নগর ছিল। সেই স্বর্ণনগরাধিপতি শ্রাদ্ধদেব বৃদ্ধ মনুকর্তৃক যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ও উগ্রসেন সম্মানিত হয়েছিলেন।

রম্যকবর্ষ বিজয়ের পর নারায়ণী-সেনা জম্বু-দ্বীপের পূর্বাঞ্চলে উপস্থিত হয়। এই অঞ্চলের নামই হচ্ছে ভদ্রাশ্ববর্ষ (চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ব্রহ্মদেশ—এর অন্তর্গত) এখানকার একাংশের অধিপতি ভদ্রশ্রবা যদুপতির সম্মান-প্রদর্শনে কোনরূপ

গ্রুটি করেন নি। কিন্তু নারায়ণী-সেনা চন্দ্রাবতীপুর (বর্তমান পিকিং) উপস্থিত হলে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। সেখানে এরূপ বিপত্তি ঘটতে পারে, এ সন্দেহ বাসুদেব বহু পূর্বেই করেছিলেন।

প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অধিনায়কত্বে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে অষ্টাদশ রথী নারায়ণী-সেনা পরিচালনা করছিলেন। কাজেই বাসুদেব বিশ্বজয়ে প্রায় নিশ্চিত হয়েছিলেন। তবু তিনি দু'একটি ক্ষেত্র-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তার মধ্যে এই ভদ্রাশ্ববর্ষ একটি। কারণ তিনি জানতেন সেখানকার রাজা শকুনি* মায়াজাল বিস্তার করে শত্রুপক্ষকে শক্তিহীন করে দিতে পারত। কাজেই বাসুদেব পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। যেখানে প্রবল বাধার সম্ভাবনা ভেবেছেন, সেখানে নিজেই উপস্থিত থেকে বাধা জয় করে নারায়ণী সেনার জয়-যাত্রায় সাফল্য এনে দিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রেও তাই।

ভদ্রাশ্ববর্ষে যখন নারায়ণী সেনা ও তাদের নায়কগণ যুদ্ধ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, তখন অকস্মাৎ বাসুদেব কয়েকজন রক্ষীসহ সেখানে গিয়ে উপস্থিত। তিনি শকুনিকে (চন্দ্রাবতীর রাজা) যুদ্ধ না করার জন্য এবং উগ্রসেনকে যজ্ঞ-কর দেওয়ার জন্য বার্তা পাঠালেন। শকুনি তাতে সম্মত না হওয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হোল। বাসুদেবের উপস্থিতিতে নারায়ণী-সেনা ও রথীবৃন্দের উদ্দীপনা নূতন ভাবে জাগ্রত হলো। চন্দ্রাবতীর যুদ্ধে শকুনি নিহত হোল। তখন তৎপত্নী মদালসা শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁর পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ রানীর অনুরোধ রক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, মদালসার পুত্রকে চন্দ্রাবতীপুরের সিংহাসন প্রদান করেন।

চন্দ্রাবতীপুর জয়ের পর বাসুদেব স্বয়ং সসৈন্যে ইলাবৃত বর্ষে (মধ্য এশিয়ার আলটাই পর্বতাঞ্চল) উপস্থিত হন।

---

* এ শকুনি গান্ধার-রাজ সুবলের পুত্র নয়।

সেখানে বেদনগরে যদুবংশধর মুচুকুন্দের জামাতা কর্তৃক বাসুদেব পূজিত হয়েছিলেন। এই বেদনগরে বাসুদেবের সম্মানার্থে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বাসুদেবের আবাল্য চরিত কথা তাঁকে শোনানো হয়। সঙ্গীতের নানা রাগরাগিণী যেন সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। বাসুদেব অত্যন্ত প্রীত হন।

এই বেদনগর থেকে বাসুদেব দ্বারাবতী ফিরে যান। কিন্তু তখনও জম্বুদ্বীপের পশ্চিমাংশ বিজয় বাকী আছে। নারায়ণী-সেনা অর্জুন ও প্রদ্যুম্নাদি রথীসহ পশ্চিমদিকে যাত্রা করল। যাত্রাপথে বসন্ত মালতীপুরের গন্ধর্বরাজ পতঙ্গ উগ্রসেনের যজ্ঞ-কর প্রদান-পূর্বক বাধ্যতা স্বীকার করেন। তারপর সেনাদল শক্রসখা দেবনিধি-রক্ষকের নগরে উপস্থিত হলে সেখানে তারা বহু ধনরত্ন-দ্বারা সম্মানিত হয়। তারপর অরুণোদা নদী তীরে (বর্তমান 'ওবি' নদী—সম্ভবতঃ টোমস্কে) দেবরাজ পুরন্দর কর্তৃক দিগ্বিজয়ী নারায়ণী-সেনা অভ্যর্থিত হয়। তারপর নারায়ণী-সেনা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে কেতুমালবর্ষে উপস্থিত হয়। কেতুমালবর্ষের রাজধানী মন্মথ-শালিনীপুর*। এতদঞ্চলে নারী-স্বাধীনতা এত উগ্র ছিল যে, সেখানকার নারীগণ প্রায় সকলেই স্বৈরিণী ছিল। সেখানে নারায়ণী-সেনা স্বৈরিণীদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা ভুলে বসেছিল। বাসুদেব পূর্বথেকেই এরূপ একটা সন্দেহ করেছিলেন। তিনি মন্মথশালিনীপুর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এমন সময় উদ্ধবের বার্তা পেয়ে দ্রুতগামী অশ্বে সেখানে গিয়ে সেনাদলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। নিজ ব্যক্তিত্বের অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি বলে সৈন্যদের মতিগতি পরিবর্তন করাতে সক্ষম

---

* বর্তমান মক্কা। উইরাল পর্বতের দক্ষিণস্থ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষের অন্তর্গত ছিল।

হলেন। মন্মথশালিনীপুরপাত-কর্তৃক বাসুদেব নানা উপহারে অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

এবার বাসুদেব এই বিশ্বজিৎ সেনাদলকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়ে নিজে পূর্বাহ্নেই দ্বারাবতীতে এসে পৌঁছিলেন। কিছুদিন পর নারায়ণী সেনা পশ্চিমোত্তর ভারতে এসে উপস্থিত হোল এবং প্রত্যাবর্তন পথে পশ্চিম ভারতের কচ্ছ, গুর্জর*[১] ও আনর্ত*[২] রাজ্য জয় করেছিল।

বাসুদেব পুত্র প্রদ্যুম্ন ও পৌত্র অনিরুদ্ধের এই বিশ্বজয়কে সকলের স্মরণীয় রাখার জন্য দ্বারাবতীতে তাদের সম্বর্ধনার জন্য বিপুল আয়োজন করলেন। সর্বোচ্চ গজারোহণে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে শোভা যাত্রার সম্মুখভাগে রেখে পশ্চাতে সকল রথীবৃন্দের সহিত অর্জুন ও অন্যান্য সেনানীগণ নগরে প্রবেশ করলেন।

উগ্রসেন, বসুদেব, গুরুদেব সান্দীপনি মুনি, বিকদ্রু, অক্রূর, নন্দঘোষ এবং অন্যান্য যাদব-প্রধানগণকে নিয়ে বাসুদেব ও বলদেব নগরদ্বারে এসে জয়মাল্যে তাদের বরণ করলেন।

এরপর নির্দিষ্টদিনে যাদবগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পিণ্ডারকে উপস্থিত হয়ে উগ্রসেনের রাজসূয়-যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করলে।

ভারতের অনেক রাজ্য থেকেই প্রতিনিধি পিণ্ডারকের যজ্ঞসভায় যোগদান করেছিলেন। বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশ থেকেও অনেক প্রতিনিধি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেবের সুব্যবস্থায় সকল উপস্থিত প্রতিনিধিগণ যথাযোগ্য সম্মান ও উপঢৌকন লাভে আনন্দ লাভ করেছিলেন।

বাসুদেবের ইচ্ছাক্রমে উগ্রসেন এই রাজসূয়-যজ্ঞে অকাতরে অর্থদান করেছিলেন।

---

* ১। গুর্জর = গুজরাট ; গর্গঃ বিঃ ৪৮/২২
* ২। আনর্ত = কাথিয়াবারের উত্তর-পশ্চিমাংশ ;

ইতিহাসের আলোকে

শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বজয়লীলা যতদূর অনুসন্ধান করে জেনেছি তাতে বুঝতে পেরেছি—খৃীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকে ঘটেছিল। পূর্বেই বলেছি,—বিশ্ব বলতে তখন জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ নববর্ষ-সমন্বিত প্রাচীন এশিয়া। এখন কথা হচ্ছে—এই বিশ্বজয় সম্ভব হোল কি ভাবে? এর ঐতিহাসিক দিক্ চিন্তাকরা দরকার।—

সিন্ধু-সভ্যতার বয়স জানা যায় আজথেকে ৫০০০ হাজার বৎসর অর্থাৎ খৃীষ্টের জন্মেরও ৩০০০ হাজার বৎসর আগের সভ্যতা। তখন লৌহযুগ আরম্ভ হয় নি, সেটা ছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ। আর তার হাজার বৎসর পরে লৌহযুগ আরম্ভ হয়। আর্যগণ তখন ভারতে এসে আর্য সভ্যতা বিস্তার করতে থাকেন। লক্ষ্য করলে এটা ভালভাবেই বোঝাযায়—ভারতীয় আর্যগণ জম্বুদ্বীপের অন্যান্য বর্ষের (দেশের) লোকদের অপেক্ষা লৌহের ব্যবহার (লৌহের যুদ্ধাস্ত্র) ভাল ভাবেই জানতেন। শ্রীকৃষ্ণের যুগ অর্থাৎ খৃীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকে ভারতীয় সভ্যতা অতি উচ্চ পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। যদিও ভারতীয় সভ্যতার উঁচুমানের কথা জানা যায় তাম্রযুগ থেকেই অর্থাৎ ৫০০০ বছর আগে থেকেই, তবু বলব মহাকাব্যের-যুগে (খৃঃ পূঃ ২০০০—১৫০০ বৎসর) ভারতীয় সভ্যতায় লৌহের ব্যবহার (তারমধ্যে উন্নতমানের লৌহাস্ত্র) যথেষ্টই ব্যবহৃত হোত। এই সঙ্গে এটাও বলতে চাই—শ্রীকৃষ্ণ-যুগের ৫০০ বৎসর পূর্বথেকেই ভারতীয়গণ লৌহের ব্যবহার জানত। ভারতীয় অনার্যদের মধ্যে তখন লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু জম্বুদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চল তখন এতটা উন্নত হয় নি। কাজেই সেদিক থেকে চিন্তা করলে নারায়ণী-সেনার বিশ্বজয় ব্যাপারে খুব একটা অসুবিধা হয় নি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পরিকল্পনা ও জরাসন্ধ-বধ

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসভার নির্মাণকার্য প্রায় শেষ ক'রে দিয়ে বাসুদেব দ্বারাবতী চলে গিয়েছেন। যথাসময়ে রাজসভার নির্মাণকার্য শেষও হয়েছে। মাঝখানে অবশ্য যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে অল্পদিনের জন্য বাসুদেব এসেছিলেন। তখন তিনি বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

উগ্রসেনের রাজসূয়-যজ্ঞ শেষে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসেছেন। তাঁর নিকট যুধিষ্ঠির পিণ্ডারকের রাজসূয়-সংবাদ জেনেছেন। যুধিষ্ঠিরেরও রাজসূয়-যজ্ঞ করার ইচ্ছা।

এদিকে যুধিষ্ঠিরের রাজসভার সৌন্দর্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরদূরান্তর থেকে দর্শনার্থীর দল ইন্দ্রপ্রস্থে এসে ভিড় করতে আরম্ভ করেছে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ করার ইচ্ছে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রথমে ভ্রাতাদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করলেন। ভ্রাতারা সকলেই যজ্ঞ করার সপক্ষেই মত দিলেন! পুরোহিত ধৌম্য-ঋষি এবং জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবও যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছার সপক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। তা-সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির এই রাজসূয়-যজ্ঞায়োজন করতে রাজি নন। যতক্ষণ পর্যন্ত বাসুদেব তাঁর এই কার্য অনুমোদন না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই কার্যে অগ্রসর হবেন না। তাই তিনি দ্বারাবতীতে দূত পাঠালেন বাসুদেবকে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে আসার জন্য।

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ পেয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে এসে বাসুদেব প্রথমে পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর পাদ বন্দনা করে অন্তঃপুরের অন্যান্যদের কুশলবার্তা জানলেন। তারপর আর সকলের সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করে যথাসময়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন এবং তাকে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে পাশে বসিয়ে দ্বারাবতীর কুশলাদি জিজ্ঞেস করে উগ্রসেনের রাজসূয়-যজ্ঞ সম্বন্ধেও দু'একটি প্রশ্ন করলেন। বাসুদেব তার যথাযথ উত্তর দিলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির বললেন,—'আমিও রাজসূয়-যজ্ঞ করতে অভিলাষী। সে ব্যাপারে অনেককেই আমার ইচ্ছার কথা জানিয়েছি। পুরোহিত ধৌম্য-ঋষি, পরম শ্রদ্ধেয় ব্যাসদেব এবং ভ্রাতৃগণ এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন; কিন্তু তোমার পরামর্শ না নিয়ে আমি সে কার্যে ব্রতী হ'তে ইচ্ছুক নই। কারণ আমি জানি,—তুমিই একমাত্র যোগ্যব্যক্তি, যে সঠিক বলতে পারবে —আমি রাজ্যসূয়-যজ্ঞের অধিকারী কিনা। এও জানি সর্বগুণ-সম্পন্ন যে ব্যক্তি সর্বত্র পূজ্য, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। আমি কি সেইরূপ পাত্র?'

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়,—কিছুলোক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন,—তিনি কুচক্রী, লম্পট, মিথ্যেবাদী, রিপুবশীভূত, নারী-আসক্ত ইত্যাদি। অথচ মহাভারতে যিনি ধর্মরাজ বলে সকলের শ্রদ্ধাভাজন (বাস্তবিক পক্ষেই তিনি ঐ নামের যোগ্য) তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবতেন? তিনি ভাবতেন—কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ বিবর্জিত, সত্যবাদী, সর্বদোষ-রহিত, সর্বজ্ঞ, সর্বকৃৎ এবং সর্বলোকোত্তম। তাই অন্যেরা তাঁকে রাজসূয়-যজ্ঞে উৎসাহিত করলেও, বাসুদেবের পরামর্শ ছাড়া তিনি সে কার্যে ব্রতী হবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু সময় নিচ্ছেন। তখন যুধিষ্ঠির বললেন,—'দেখ, কৃষ্ণ, সংসারে পরামর্শ দেবার

লোক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের সৎপরামর্শ দেবার লোক খুব কম। কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুত্ব রক্ষার্থে আমার দোষ উদ্‌ঘাটন করেন না, কেউ কেউ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাকে সন্তুষ্ট রাখতে প্রিয় বাক্য বলেন ;—সংসারে এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। এ জাতীয় লোকের পরামর্শে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তুমি উক্ত দোষ রহিত : আমার পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে তোমাকেই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করি। কাজেই তোমার পরামর্শব্যতীত একার্যে ব্রতী হব না।'

যেদিন অর্জুনকে বাসুদেবের বিশ্ববিজয়াভিলাষী নারায়ণী-সেনার সহযাত্রী করার জন্য যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে অনুরোধ করেছিলেন, সেইদিনই বাসুদেব মনে মনে জেনেছিলেন,—একদিন উচ্চাভিলাষী যুধিষ্ঠিরও রাজসূয়-যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। বাসুদেবের অন্তর্দৃষ্টি বাসুদেবকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছিল।

বাসুদেব বললেন,—'আপনি রাজসূয় যজ্ঞের অধিকারী নন। সম্রাটছাড়া এ যজ্ঞের অধিকারী কেউ হতে পারে না ; আপনি এখনও সম্রাট হতে পারেন নি।'

যে অপ্রিয় সত্যকথা যুধিষ্ঠিরকে আর কেউ বলতে পারে না, বাসুদেব তা পারে। যুধিষ্ঠির ভেবেছিলেন—অন্যান্য সুহৃদ্‌গণের ন্যায় বাসুদেবও হয়তো তাঁর রাজসূয়-যজ্ঞ অনুমোদন করবেন। তা হোল না। এতে তিনি কিছু বিস্মিত হলেও একথা তিনি ঠিকই জানতেন যে, বাসুদেবই তাঁকে সঠিক পথ দেখাবেন।

যুধিষ্ঠির কোন কথা না বলে বাসুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাসুদেব তখন আবার বলতে লাগলেন,—'রাজসূয়-যজ্ঞ করতে হলে, প্রথমে আপনাকে সম্রাট হ'তে হবে। আর্য-ভারতে এখন সম্রাট বলতে—জরাসন্ধ ; কারণ আর্য-ভারতের সকল নৃপতিই তাঁর বাধ্য। যারা বাধ্য নন, তাঁরা তাঁর-শৈল কারাগারে বন্দী। এরূপ ছিয়াশি জন রাজা তাঁর পশুপতি পূজায় বলি

হবে। আরও চৌদ্দজনকে বন্দী করতে পারলেই এই নিষ্ঠুর কার্য তাঁরদ্বারা সম্পাদিত হবে! এখন আপনাকে সম্রাট হতে হলে প্রথমেই আপনার কাজ হবে—এই ছিয়াশি জন নৃপতিকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা। এতে আপনার দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথম হচ্ছে—আপনি ধার্মিক, ধার্মিক কখনও এরূপ ধর্ম-বিরুদ্ধ কার্য সংঘটিত হতে দেন না ; এটা ধার্মিকের কর্তব্য। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—আপনার সম্রাট হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। এই ছিয়াশি জন নৃপতি আপনার বশীভূত তো হবেই, তা ছাড়া অন্যান্য নৃপতিগণও আপনার এই কার্যের জন্য জরাসন্ধের গোষ্ঠী-ভুক্ত না থেকে আপনার অনুগত হবে।'

যুধিষ্ঠির সাবধানী ব্যক্তি। জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে তিনি রাজি নন। তাই তিনি বললেন,—'তা'হলে তো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা দেবে।'

—সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধ যাত্রার-প্রয়োজন নেই ; কারণ এই অন্যায় কার্যের জন্য জরাসন্ধই অপরাধী। একার অপরাধে অন্যের শাস্তি কেন হবে ? কাজেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। মধ্যম পাণ্ডব, অর্জুন এবং আমি—তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রথমে বন্দী নৃপতিদের মুক্তি দিতে তাঁকে অনুরোধ করব। তাতে যদি তিনি রাজি না হন, তখন আমরা প্রত্যেকে তাঁকে দ্বৈরথ সমরে আহ্বান করব।

—তাতেও তো বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তোমাদের কাউকে যদি হারাতে হয়, সেটা হবে আমার চরম দুঃখের কারণ। না,—কাজ নেই আমার সম্রাট হওয়ার।

বাসুদেব আশা ত্যাগ করলেন না। তিনি পাণ্ডবদের চরিত্র বিচারে ভুল করেন নি। যুধিষ্ঠির অতি সাবধানী, ভীম অসীম শক্তিধর ও গোঁয়ার, আর অর্জুন অস্ত্রবলে তেজোদ্দীপ্ত।

যুধিষ্ঠিরের কথার প্রতিবাদ ক'রে ভীম বললেন,—'কেশবের পরামর্শ যুক্তি-সঙ্গত।'

অর্জুন বললেন,—'এ ভীরুতা কোন বীরই বরদাস্ত করবেন না। কেশবের প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।'

শেষ পর্যন্ত কেশবের পরামর্শ মত যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনকে কেশবের সঙ্গে মগধের রাজধানী গিরিব্রজে পাঠালেন। দারুক সারথি। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে গিরিব্রজ (রাজগৃহ) দীর্ঘপথ। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তাঁরা গিরিব্রজে পৌঁছিলেন অনেক সময়ের ব্যবধানে। বাসুদেব ইতিপূর্বে এক সময় গুপ্তচর মুখে গিরিব্রজ সম্বন্ধে মোটামুটি জেনেছিলেন। পঞ্চ-পর্বত-বেষ্টিত এই মগধ-রাজধানী গিরিব্রজ শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য প্রকৃতির অকৃপণ সাহায্য লাভ করেছে।

ভীমার্জুন সহ বাসুদেব পুরীর বাইরে রথ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। দারুককে রথ নিয়ে একটি নির্বিঘ্ন স্থানে অপেক্ষা করতে বলে তাঁরা তিন জন পুরী প্রবেশের উপায় ভাবছেন।

পুরী প্রবেশের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জুনকে বললেন,—"ঐ দেখ, বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক—এই পঞ্চ মহাশৈল সম্মিলিতভাবে গিরিব্রজ নগরকে রক্ষা করছে। পুষ্পিত সাখাগ্র-বিশিষ্ট সুগন্ধপূর্ণ-মনোহর লোধ্রা-বনরাজি ঐ শৈলসমূহকে যেন লুকিয়ে রেখেছে।"

তাঁরা কিছু দূরে পর্বত-গাত্রে আরোহণ করে প্রবেশ-পথ লক্ষ্য করলেন।

পূর্বেই ঠিক ছিল—তাঁরা তিন জনেই সাধারণ স্নাতকের বেশে পুরী প্রবেশ করবেন। তবু যদি কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয়—এই ভেবে তাঁরা প্রবেশ-পথে রক্ষিত ভেরী-সকল চূর্ণ করে দ্বার উল্লঙ্ঘন-পূর্বক সন্ধ্যাকালে জরাসন্ধের রাজ সভায় প্রবেশ করলেন।

সেদিন জরাসন্ধ উপবাসী ছিলেন। আগন্তুকদের স্নাতক

ব্রাহ্মণ ভেবে তিনি তাঁদের অর্ঘ্যদানে পুজো করলেন; কিন্তু স্নাতকগণ সে পুজো গ্রহণ করলেন না। জরাসন্ধের মনে তাঁদের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

জরাসন্ধ আগন্তুকদের জিজ্ঞেস করলেন,—'আপনাদের স্নাতক-ব্রাহ্মণ' ভেবেই অর্ঘ্য দান করেছি। কিন্তু অর্ঘ্য গ্রহণ না করায় আপনারা আমার সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিরূপেই গণ্য হয়েছেন। আপনারা কে? আপনারা ব্রাহ্মণের বেশধারণ করলেও আপনাদের বাহুতে 'জ্যা চিহ্ন' দেখা যাচ্ছে এবং আকার দেখেও ক্ষত্রিয় বলে মনে হচ্ছে। রাজসমীপে সত্য বলাই প্রশংসনীয়। অতএব আপনাদের সত্য পরিচয় প্রদান করুন।'

বাসুদেব উত্তর দিলেন,—'আপনি আমাদের স্নাতক ব্রাহ্মণ ভেবে অর্ঘ্য দান করেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন জাতিই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ করতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণ নই। তাছাড়া আপনার গৃহ আমাদের নিকট এখন শত্রুগৃহ। শত্রুগৃহে অর্ঘ্য গ্রহণ বিধিসম্মত নয়। কাজেই এইসব কারণেই আমরা অর্ঘ্য গ্রহণ করি নি।

জরাসন্ধ বললেন,—'তোমাদের সঙ্গে আমি কখনও শত্রুতা করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে কেন তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞানকরছ?'

—রাজা যুধিষ্ঠির যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি। আপনি ছিয়াশি জন নির্দোষ নৃপতিকে পশুপতির নিকট বলি দেওয়ার জন্য বন্দী করে রেখেছেন। এ কাজ অত্যন্ত ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ। ধার্মিক ব্যক্তি কখনও এইরূপ ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ ঘটতে দিতে পারেন না। তিনি এই কাজথেকে আপনাকে বিরত করার জন্য আমাদের নিয়োগ করেছেন। আমাদের জ্ঞাতসারে যদি আপনার দ্বারা এই পাপ-কার্য সাধিত হয়, তবে আমাদেরও সেই পাপে পাপী হতে হবে। কারণ আমরা ধর্মচারী এবং ধর্ম সংরক্ষণে সমর্থ। আপনি যদি এ কার্যে

বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করছি ; আমাদের বধ না করা পর্যন্ত আপনি এ পাপ-কার্য করতে পারবেন না।

তারপর বাসুদেব তাদের তিন জনের পরিচয় দিলেন ।—

'ইনি মধ্যম পাণ্ডব ভীম, ইনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, আমি বাসুদেব। এই তিন জনের যে কোন ব্যক্তিকে আপনার ইচ্ছানুরূপ আহ্বান করুন।'

জরাসন্ধ তখন বললেন,—'তোমরা ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের মতই কথা বলেছ। আমার পশুপতি পুজার বিঘ্নকারী ব্যক্তিকে আমিও সহ্য করব না। আমিও ক্ষত্রিয় ; ক্ষত্রিয়-রীতি অনুসারেই তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব। আগামী কল্যই প্রতিদ্বন্দ্বীতার দিন ধার্য করা হোল ; মধ্যম পাণ্ডব ভীমকেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বেছে নিলাম।'

পর্বত বেষ্টিত মল্লক্ষেত্র। এই মল্ল-যুদ্ধ দেখার জন্য যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—নরনারী নির্বিশেষে সকলেই সমবেত হয়েছে। সে দিনটি ছিল কার্তিক মাসের প্রথম দিন। যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বস্ত্যয়নাদি সম্পন্ন হোল। ক্ষাত্র ধর্মানুসারে বর্ম-কিরীট পরিত্যাগ করে জরাসন্ধ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধ-জাত অঙ্গের বেদনা উপশমের উপযোগী ঔষধাদি নিয়ে নিকটেই অবস্থান করতে লাগলেন।

প্রতিদিন দিবা ভাগেই যুদ্ধ হয়েছিল। চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ চলেছিল। চতুর্দশ দিবসে জরাসন্ধ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই অবস্থায় ভীম জরাসন্ধকে নিপীড়ন করছিলেন। কৃষ্ণার্জুন মল্লভূমির প্রান্ত-ভাগেই ছিলেন। জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক নিপীড়িত হতে থাকলে বাসুদেব ভীমসেনকে সম্বোধন করে বললেন,—'হে কৌন্তেয়। ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নয়। অধিক পীড়ন করলে পীড়িত ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করে। অতএব এর সঙ্গে বাহু যুদ্ধ কর।'

এ কথা ভীমের শ্রুতিগোচর হয়েছিল কিনা বোঝা যায় নি। তবে ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করেই বধ করেছেন।

তারপর কৃষ্ণার্জুন ও ভীম কারাগারে আবদ্ধ নৃপতিদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মুক্ত করে দিলেন। তাঁরা সকলেই আনন্দের আতিশয্যে কিছু সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় নির্বাক্ হয়ে ছিলেন।

ইতিমধ্যে জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে ডেকে বাসুদেব বললেন,—'তোমার ভয় নেই। তোমার পিতার সিংহাসনের ওপর আমাদের কোন লোভ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ; আমরা এসেছিলাম বন্দী রাজন্যবর্গকে মুক্ত করতে ; সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তোমার পিতার সিংহাসনের অধিকারী তুমি। কাজেই আমরা তোমাকে সেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করছি। এখন থেকে তুমিই মগধের অধিপতি।'

সহদেব বাসুদেবের উদারতায় মুগ্ধ এবং বিস্মিত। কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তাঁদের সম্মানার্থে সে উপঢৌকন রূপে প্রচুর অর্থ প্রদান করলে।

এই সময় মুক্ত রাজন্যবর্গ বাসুদেবের নিকট এসে তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

সেই সময় বাসুদেব তাঁদের বললেন,—'রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করতে অভিলাষী হয়েছেন। আপনারা সেই ধার্মিক-প্রবর রাজাকে সেই কার্যে সাহায্য করুন।

বিনা রক্তপাতে জরাসন্ধের ন্যায় প্রবল প্রতিপক্ষকে নাশ করতে পেরে বাসুদেব মনে মনে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করলেন।

তারপর ভীমার্জুনকে নিয়ে রথে উঠে দারুককে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন।

পথে চলতে চলতে বাসুদেব ভাবছিলেন—যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করে তাঁর ধর্মরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন কি সার্থক হবে ?

কৌরব-পাণ্ডবদের বংশপঞ্জী

সারকথা

১। "সুখ-দুঃখ পূর্ব-কর্ম-ফল।"
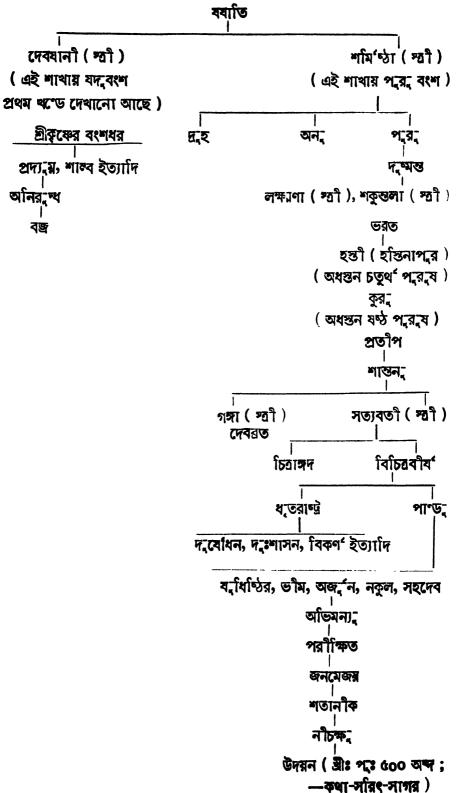
২। "মানুষের হিত সাধনই মানব-জন্মের সার্থকতা।"

৩। "ঈশ্বরের সৃষ্ট সব কিছুই একে অন্যের পরিপূরক।"

৪। "ভোগে ভোগেচ্ছা বৃদ্ধিই পায়, নিবৃত্তি হয় না; ত্যাগেই নিবৃত্তি।"

৫। "উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গে বালুকণা যেমন স্বেচ্ছাধীন নয়, তার পরিণতি সে জানে না, মানুষও তেমনি কালস্রোতে ভেসে বেড়ায়, তার পরিণতি সে জানে না।"

সহায়ক পুস্তকের তালিকা

১. ঋগ্বেদ সংহিতা
২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৩. শ্রীমদ্ভাগবত
৪. মহাভারত
৫. রামায়ণ
৬. হরিবংশ
৭. বিষ্ণু পুরাণ
৮. ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ
৯. জ্যোতির্বিজ্ঞান রহস্য
১০. বিশ্বকোষ
১১. ভারতকোষ
১২. শ্রীনামভাগবতম্ (১ম খণ্ড)—৺পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর
১৩. মহাভারতম্—মহামহোপাধ্যায় ৺হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
১৪. যুধিষ্ঠিরের সময় (২য় সংস্করণ)—মহামহোপাধ্যায় ৺হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
১৫ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৬. গীতগোবিন্দ—কবি জয়দেব
১৭. রৈবতক—নবীনচন্দ্র সেন
১৮. শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম—৺জগদীশচন্দ্র ঘোষ
১৯. কৃষ্ণ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু
২০. রাজগীর সম্বন্ধে ভূমিকা—জৈনকো প্রকাশন—দিল্লী-৬
২১. Political History of Ancient India—by H. C. Roy Chaudhury, M. A., Ph. D.
২২. The Age of Imperial Unity—by R. C. Mazumdar, A. D. Pusalkar, A. K. Mazumdar.
২৩. An Advanced History of India—by R. C. Mazumdar M. A. Ph. D., H. C. Ray Chaudhury, M. A. Ph. D., Kalikinkar Dutta M. A. Ph. D.
২৪. Inidian History and Culture—by J. Fuste, M. A., L Lttt, Ph. D. and I. R. Metha M. A., B. T.
২৫. Swagat—the inflight magazine of Indian Airlines